স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০২১)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা শাখার ইতিহাস বিভাগের অধীনে পিএইচ. ডি উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

অলোক কোরা

নিবন্ধন সংখ্যা- A00HI1201219

বর্ষ- ২০১৯

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

<u>তত্ত্বাবধায়ক</u>

অধ্যাপক মহুয়া সরকার

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৩

Certificate

Certified that the thesis entitled **স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০২১)** submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Mahua Sarkar, Department of History, Jadavpur University, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere/elsewhere.

………………………………… ……………………………..

Countersigned by the Supervisor **Signature of the Candidate**

Date:- **Date:-**

উৎসর্গ

স্বর্গীয় পিতা শ্রীধর চন্দ্র কোরা

ও

স্বর্গীয় মাস্টারমশাই শুভাশিস বিশ্বাস মহাশয়কে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রথমেই আমি আমার এই গবেষণাপত্রের জন্য আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপিকা (ড.) মহুয়া সরকার মহাশয়াকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই। তিনি ইতিহাস বিভাগের বহু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলে এবং নিজের শারীরিক অসুস্থতার মধ্যেও আমার গবেষণার কাজকে সঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে সবসময় পরামর্শ ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অপত্য স্নেহের কারণে আমি আমার গবেষণাপত্রটির কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছি। আমাকে তিনি তাঁর কাছে গবেষণার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমি চিরঋণী রইলাম। তাঁর ঐকান্তিক অনুপ্রেরণা ও প্রচেষ্টাই আমার এই গবেষণা সম্পন্নের অন্যতম পাথেয়। অবনত মস্তকে তাঁর চরণে আমার প্রণাম জানাই।

আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাই আমার রিসার্চ অ্যাডভাইসারি কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক রূপকুমার বর্মন মহাশয় ও ড. চন্দ্রানী ব্যানার্জী মুখার্জী মহাশয়াকে, যাঁরা নানান পরামর্শ দিয়ে আমার গবেষণাকে সমৃদ্ধ করতে সহযোগিতা করেছেন। ধন্যবাদ জানাই যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের মাননীয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের যাঁদের আন্তরিক সহযোগিতায় দীর্ঘসময় এই বিভাগে কাটিয়েছি।

আন্তরিক ভাবে কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জানাই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ‘বাবু জগজীবন রাম চেয়ার অধ্যাপক’ অধ্যাপক অনিল কুমার সরকার মহাশয়কে, যাঁর সহযোগিতা আমার গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

ধন্যবাদ জানাই আমার বিভাগের শিক্ষা সহযোগী কর্মীদের যাদের আন্তরিক সাহায্য আমার গবেষণার পথকে সহজ করেছে। ধন্যবাদ জানাই পি এইচ ডি সেলের মেহেলী দি, ও অন্য সকল কর্মীদেরকে। গবেষণা কাজে সহযোগিতা পেয়েছি— যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, স্টেট আর্কাইভ, অ্যানেক্স বিল্ডিং, জাতীয় গ্রন্থাগার, ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনস্টিটিউট, ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ আর্কাইভ, গর্ভমেন্ট অফ ফিশারিস মীন ভবন (সল্টলেক ও বারাসাত), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর- ডায়মন্ড হারবার, মৎস্য দপ্তর- পাথরপ্রতিমা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সকল গ্রন্থাগারিক ও সকল আধিকারিকদের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিক ড. তিমির বরণ মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক কিশোর বাবু, বারাসাত মীন ভবনের আধিকারিক ড. পার্থ সারথি কুণ্ডু, ড. স্বপন কুমার সাহা, পাথরপ্রতিমা ব্লক উন্নয়ন দপ্তর আধিকারিক, কাকদ্বীপ ব্লক উন্নয়ন দপ্তর আধিকারিক ও ডায়মন্ড হারবার সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক যাদের সহযোগিতা ছাড়া তথ্য সংগহ সম্ভব হত না।

আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার দুই প্রিয় মানুষকে— শুভঙ্কর দে ও সোহিনী দাস। যাদের শাসন ও ভালোবাসা ছাড়া আমি গবেষণার কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম না।

আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই আমার মানসিক সমর্থক ও প্রিয় বন্ধু ব্রততী পাল'কে। তার কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। তার সহযোগিতা ছাড়া আমার একাজ সম্ভব হত না।

গবেষণা চলাকালীন যারা নানা ভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন তারা হলেন— শুভদীপ দাস, অনির্বাণ দাস, মুরারি মোহন মিস্ত্রি, পার্থ মণ্ডল, লব মাহাতো, পার্থ প্রামাণিক, শুভঙ্কর কোরা, এদের প্রত্যেকের কাছে আমি ঋণী।

সুন্দরবনবাসী মৎস্যজীবীদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ, ক্ষেত্রসমীক্ষার সময় তাদের অমূল্য বক্তব্য আমার গবেষণার পথকে অনেকটা সহজ করেছে।

সর্বোপরি যাঁদের জন্য আমি প্রথম এই পৃথিবীর আলো দেখেছি আমার সেই শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় পিতা শ্রীধর চন্দ্র কোরা এবং মাতা শতদল কোরা, তাঁদের চরণে শতকোটি প্রণাম। মায়ের অফুরন্ত ভালোবাসা আমার গবেষণার পথে এগিয়ে যেতে অনেক ভাবে সাহায্য করেছে, যা আমার জীবনের প্রধান পাথেয় ভবিষ্যতের পথে এগিয়ে যাওয়ার। আমার দাদা শ্রী অসীম কোরা সব সময় আমার পাশে থাকার জন্য তাকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। শ্রদ্ধা জানাই— স্বর্গীয় ননীভূষণ পাল, কাজললতা পাল, ভাস্বতী পাল, সৌম্য কান্তি পাল ও সাধনা পাল। আমার পরিবার আমার পাশে না থাকলে আমি কখনও এই কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। তাই আবারও সকলকে শ্রদ্ধা, প্রণাম জানিয়ে শেষ করলাম।

অলোক কোরা

গবেষক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা, আগস্ট, ২০২৩

সূচীপত্র

কৃতজ্ঞতা স্বীকার i-iii

সারণীসূচী v-vi

চিত্রসূচী vii

ভূমিকা ১-৩৪

প্রথম অধ্যায় : সুন্দরবনের গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও মৎস্যজীবীদের সমাজ-সংস্কৃতি। ৩৫-৯৫

দ্বিতীয় অধ্যায় : সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও মৎস্যজীবীদের অবস্থান। ৯৬-১৩৯

তৃতীয় অধ্যায় : স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবন চিত্র। ১৪০-২০১

চতুর্থ অধ্যায় : সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় ও মৎস্যজীবীদের বিপন্নতা। ২০২-২৭২

উপসংহার : আশা-নিরাশার দোলাচলে মৎস্যজীবীরা। ২৭৩-২৮৫

পরিশিষ্ট ২৮৬-৩১১

গ্রন্থপঞ্জী ৩১২-৩৪৬

সারণীসূচী

১.১. ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জাতি কাঠামোর তালিকা। পৃ- ৬৪

১.২. পশ্চিমবঙ্গের মৎস্যজীবীদের শিক্ষার হার সংক্রান্ত তালিকা। পৃ- ৮১

২.১. ঝড়খালি মৎস্য খামার থেকে ১৯৮৪-২০০৮ সাল পর্যন্ত উৎপাদিত মৎস্যের আয়-ব্যয়ের তালিকা। পৃ- ১১২

২.২. ২০১৫ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ফিশারি দপ্তরের প্রকল্পিত অর্থ বিনিয়োগ সংক্রান্ত তালিকা। পৃ- ১১৩

২.৩. ২০১১ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ফিশ ফিড ও ফিঙ্গারলিং বিতরণ সংক্রান্ত তালিকা। পৃ- ১১৪-১১৫

৩.১. পেশাভিত্তিক মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের তালিকা। পৃ- ১৪২

৩.২. সুন্দরবনে মাছ ধরার জালের তালিকা। পৃ- ১৫১-১৫৩

৩.৩. একটি ট্রিপে মৎস্যজীবীদের ভাগে উপার্জিত অর্থ তালিকা। পৃ- ১৫৩

৩.৪. মাছ ধরার নৌকা ও তাদের ব্যবহার সংক্রান্ত তালিকা। পৃ- ১৫৭

৩.৫. ১৯৬০-৬৩ সাল পর্যন্ত মাছ সংগ্রহের তালিকা। পৃ- ১৫৯

৩.৬. ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত মাছ ধরার তালিকা। পৃ- ১৬০

৩.৭. সুন্দরবনে ব্লক ভিত্তিক ফিশারি সংখ্যার তালিকা। পৃ- ১৬২

৩.৮. ১৯৯৯-২০০৩ সাল পর্যন্ত নদীর মীন সংগ্রহ ও আয় সংক্রান্ত তালিকা। পৃ- ১৭০

৩.৯. ১৯৯২-৯৫ সাল পর্যন্ত শাবার শিল্পের তালিকা। পৃ- ১৭৪-১৭৫

৩.১০. শাবার শিল্প থেকে আয়ের তালিকা। পৃ- ১৭৬

৩.১১. সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের আয় সংক্রান্ত তালিকা। পৃ- ১৭৭

৪.১. একটি গাছের মূল্য সংক্রান্ত তালিকা। পৃ- ২১৬

৪.২. ১৯৫১-২০১১ পর্যন্ত সুন্দরবনের আদমশুমারির উপর ভিত্তি করে সুন্দরবনের জনসংখ্যার বৃদ্ধি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান। পৃ- ২২২

৪.৩. ১৯৭৩ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের বাঘের পরিসংখ্যান। পৃ- ২৩০

৪.৫. ১৯১৭-২০২০ পর্যন্ত সুন্দরনের বিভিন্ন ভূমির অবক্ষয় জনিত তালিকা। পৃ- ২৩৩

চিত্রসূচী

১। গবেষণা এলাকার মানচিত্র। পৃ- ২৮৬

২। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল। পৃ-২৮৭

৩। সুন্দরবনের অবক্ষয়ের চিত্র। পৃ- ২৮৭

৪। মৎস্য সংগ্রহের দেশী নৌকা। পৃ- ২৮৮

৫। যন্ত্রচালিত মাছ ধরার সামুদ্রিক ট্রলার। পৃ- ২৮৮

৬। সুন্দরবনের নদীতে মীন ধরার চিত্র। পৃ- ২৮৯

৭। কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মৎস্যজীবী মানুষের লড়াই। পৃ- ২৮৯

৮। সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের জাল। পৃ- ২৯০

৯। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী- দোন শিকারি। পৃ- ২৯০

১০। নদীর মৎস্য সংগ্রহের চিত্র। পৃ- ২৯১

১১। অসহায় নারীদের মাছ বিক্রয়ের চিত্র। পৃ- ২৯১

১২। সুন্দরবনের পথে বরফের বাক্সে করে মাছ বিক্রয়। পৃ- ২৯২

১৩। মাছের আড়ত। পৃ- ২৯২

ভূমিকা

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ সুন্দরবন তার সামুদ্রিক ও মোহনার মৎস্য সম্পদের জন্য বিশেষ ভাবে পরিচিত। তাছাড়া সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ জলাশয়, খাল, বিল ও মাছ চাষের ভেড়ি থেকেও প্রচুর পরিমাণে মৎস্য উৎপাদিত হয়ে থাকে। সুন্দরবনের জনসংখ্যার একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী এই মৎস্য কার্যক্রমের উপর নির্ভরশীল, যারা মৎস্যজীবী নামেই পরিচিত। এই মৎস্য আহরণ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম, তাছাড়া সুন্দরবনের অর্থনীতির মেরুদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় এই মৎস্য সম্পদকে। মানবজাতির মাছ ধরা জীবিকা নির্বাহের অন্যতম প্রাচীন মাধ্যম। আধুনিক বিশ্বে এই মৎস্য সম্পদের প্রতি মানুষের মনোযোগ বেড়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সুন্দরবন বন্যপ্রাণী ও বিষাক্ত সাপের বাসভূমি ছিল। তাসত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সরকার ব-দ্বীপের এই জলাবদ্ধ বনভূমিকে তাদের রাজস্বের উৎস হিসেবে দেখেছিল। এর ফলে সুন্দরবন পুনরুদ্ধার হয় এবং শ্বাপদসংকুল আতিথ্যহীন অঞ্চলগুলি চাষের জমিতে পরিণত হতে থাকে। সুন্দরবন আবিষ্কৃত হয়েছিল একথা সত্য নয়, কেননা এই অঞ্চলের চন্দ্রকেতুগড়, ছত্রভোগ, জটার দেউল, জি-প্লট, রাক্ষসখালি, হরিনারায়ণপুর, আটঘড়া, খাড়ি, কঙ্কনদীঘি, মণির তট ইত্যাদি স্থানের থেকে প্রাপ্ত নিদর্শন সুন্দরবনের ঐতিহ্যকে খ্রীষ্টপূর্ব যুগে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সুদীর্ঘ ইতিহাসের পরিক্রমায় সুন্দরবন বিভিন্ন সময়ে কালের গহ্বরে তলিয়ে গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের সময়কালে এই অঞ্চল পুনরায় অন্ধকার থেকে আলোতে উদ্ভূত হয়েছিল। সুন্দরবনের আধুনিক ইতিহাস অবশ্য ঔপনিবেশিক পুনরুদ্ধার নীতির বাস্তবায়নের ফল। জমির পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার জন্য সুন্দরবনের জনসংখ্যার সিংহভাগ ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গের পার্বত্য অঞ্চলের অর্থাৎ উত্তরের সংলগ্ন জেলাগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক অভিবাসীদের

নিয়ে আসা হয়েছিল। জমির পুনরুদ্ধারের পর সমগ্র সুন্‌দরবন কৃষি উৎপাদনকারী ভূমিতে পরিণত হয়েছিল। তামাক, মটর, সরিষা, মরিচ, বেগুন, পেঁয়াজ, তরমুজ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সব ফসল এখানে চাষ হত। সুন্দরবনের এই অঞ্চলে অন্য কোন পেশা না থাকার কারণে এখানকার মানুষেরা কৃষিকাজের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের সহায়ক মাধ্যম হিসেবে মাছ ধরা, কাঠ কাটা ও মধু সংগ্রহ প্রভৃতি কাজ করত। সুতরাং কৃষিকাজ হল সুন্দরবনের মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি এবং মৎস্য ও বনজ সম্পদ সংগ্রহ হল তাদের সহায়ক মাধ্যম। বর্তমানে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে মৎস্য সম্পদ অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি হলেও ১৯৪৭ সালের পর থেকে ২০২১ সময়কালের মধ্যে জনসংখ্যার চাপ, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় এই এলাকার জীববৈচিত্র্য, স্থায়িত্ব ও মৎস্য সম্পদের অস্তিত্ব এবং মৎস্যজীবীদের জীবিকার মধ্যে সংকট তৈরি করেছে, তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। এইসব সমস্যা সত্ত্বেও সুন্দরবনে মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের ভালো সম্ভাবনা রয়েছে, কেননা এখানে সামুদ্রিক ও অভ্যন্তরীণ প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, নানা কারণে তারা এই সমাজ গড়ে তোলে। প্রাচীন ইতিহাস দেখলে বোঝা যায় যে, সভ্যতার ইতিহাসে নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল বড় বড় সভ্যতা, গড়ে উঠেছিল নদীমাতৃক সভ্যতা। এই নদীমাতৃক সমাজ ব্যবস্থায় মৎস্যশিকার পেশাটির প্রাচীনতা অস্বীকার করা যায় না। সুপ্রাচীন এই পেশাটি অনেকাংশে অন্যান্য পেশা অপেক্ষা আলাদা। একা একা এই পেশা সম্ভব নয়। মাছ ধরা ও মাছ চাষ একটি যৌথ প্রক্রিয়ার পেশা, সংঘবদ্ধতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে এই পেশার সফলতা। মৎস্যজীবী সম্প্রদায় এইভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতায় সমাজ গড়ে তোলে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রেও একথা সমান

ভাবে প্রযোজ্য। পেশার সুবিধার্থে মৎস্যজীবী মানুষেরা নদী-জলাশয়ের ধারে, গ্রামের প্রান্তে বসবাস করে জীবিকা নির্বাহ করে, বহু প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে মৎস্য প্রিয় মানুষের কাছে এই সম্পদ তারা তুলে দেয়।

সুদূর অতীত থেকে মাছধরা এই ব্যাপারটাই শিকার ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্কিত। সভ্যতার সূচনাতে মানুষ তাদের জীবন ধারণের জন্য মৎস্য শিকারকে উপায় হিসাবে বিবেচনা করেছিল। ডেভোনিয়ান সময় অর্থাৎ ৪১.৯২ কোটি থেকে ৩৫.৮৯ কোটি বছর সময়কাল থেকে মাছ ৩৫০ মিলিয়ন বছরেরও বেশি সময় ধরে জলজ পরিবেশে বাস করছে।[১] ইংল্যান্ডের ডেভন অঞ্চল থেকে প্রথম এই যুগের পাথরের প্রাপ্তি ও গবেষণার সুবাদে অঞ্চলটির নামে যুগের নামকরণ হয়েছে ডেভোনিয়ান যুগ। এই সময় জলভাগে মাছেদের বহুসংখ্যক প্রজাতির আবির্ভাব ঘটার কারণে ডেভোনিয়ান সময়কালকে মাছের যুগ বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন প্রস্তর সময়কাল থেকে মানুষ মাছকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করেছিল। যার ধারা আজও বজায় রয়েছে। মেগালিথিক (Megalithic) যুগ থেকে (খ্রীষ্টপূর্ব ১০,০০০-৬,০০০) মানব সভ্যতার কাছে মাছ ধরার কৌশল সম্পর্কে জ্ঞান ছিল। আনুমানিক ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরে ও রোমে মাছ চাষের প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। চীন দেশে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ শুরু হয়েছিল। চীন হল প্রথম দেশ যে পদ্ধতিগত মৎস্য চাষ শুরু করেছে, এবং এই মৎস্য চাষকে একটি শিল্পের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। টেলিকিডসের রচনা থেকে জানা যায় ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ সময়ে গ্রীসবাসীরা খাদ্য হিসেবে মাছকে গুরুত্ব দিত।[২] রামায়ণ ও মহাভারতে ধীবর জাতি ও তাদের মাছ ধরা (Capture Fishery) সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। মহাভারতের রচয়িতা বেদব্যাস ছিল মৎস্যগন্ধ্যা ও ঋষি পরাশরের পুত্র। পঞ্চপাণ্ডবের অর্জুন স্বয়ংবর সভায় অলক্ষ্যে

ঝোলানো মাছের চোখ তীরবিদ্ধ করে দ্রৌপদীকে স্ত্রীরূপে লাভ করে। ঋষি সৌভরী সুখে ক্রীড়ারত সন্তান-সন্ততিসহ মৎস্যকে দেখে সংসার-ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিল।[৩] সুশ্রুতের রচনা (খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ), কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (৩২১-৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব) এবং রাজা সোমেশ্বরের মনসোল্লাসা (১১২৭ খ্রি.) এর মতো ঐতিহাসিক গ্রন্থে মাছ চাষের উল্লেখ রয়েছে। পৌরাণিক কাহিনীতে ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে মাছের উল্লেখ রয়েছে। এখানে মৎস্য জগৎপালক বিষ্ণুর প্রতীক। "Fish occupies an important place in the Indian mythology, history and tradition. For instance, one of the incarnations of God was in the form of fish, Matasyavatara. Fish is also a symbol of Vishnu or Buddha. Among Hindus, it is an incarnation of God Vishnu."[৪] ভারতবর্ষে মাছ ধরার শিল্প খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে শুরু হয়েছিল। প্রাক-ঐতিহাসিক কালের মহেঞ্জোদারো সভ্যতাতে মানব-মানবীদের কাছে মৎস্য শিকারের কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান ছিল বলে জানা যায়।[৫] সিন্ধু সভ্যতার অধিবাসীদের কাছে মাছ খাদ্য হিসাবে খুব প্রিয় ছিল। তবে বৈদিক যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০-১০০০ অব্দ) মানুষের কাছে মাছ ধরার প্রচলন ছিল কিনা সঠিক ভাবে জানা যায় না। খনার বচনেও মাছ চাষের উল্লেখ রয়েছে। ঋগ্বেদে মৎস্য শুধুমাত্র একবার উল্লেখ রয়েছে। অথর্ববেদ, সংহিতা, উপনিষদ ও সূত্রে মাছ ধরার জালের উল্লেখ রয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় ইতিহাসে দ্রাবিড়ীয়দের মধ্যে মাছ ধরার প্রবণতা দেখা যায়। সম্রাট অশোকের সময়ে তার প্রজারা বৈজ্ঞানিক ভাবে মাছ চাষ করতেন বলে জানা যায়। অশোকের পঞ্চম স্তম্ভানুশাসন (খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৬ অব্দ) থেকে জানা যায় মাছের সংরক্ষণ (Conservation) ও প্রজনন ঋতুতে মাছ ধরার উপরে নিষেধাজ্ঞা সম্বন্ধীয় (Closed Season) বিধান।[৬]

ইতিহাসে মাছ ধরার কাজে যুক্ত কৈবর্ত সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় মনুসংহিতায়, যেখানে তাদেরকে মিশ্র জাতি (Mixed Origin) বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরাণে এই কৈবর্ত আবার 'Nonbramanyas' বলে উল্লিখিত হয়েছে।[৭] "The first historical mention of the Kaibartas is found at the time of the Pal Dynasty when a Kaibarta rule was established in Barendri in North Bengal after killing Mahipal-II of the Pal Dynasty."[৮] বিষ্ণুপুরাণ থেকে জানা যায় যে, কৈবর্তরা ব্রাহ্মণ সমাজ সংস্কৃতি কেন্দ্রের বাইরে থাকতো। মনুসংহিতায় উল্লিখিত হয়েছে যে কৈবর্তরা ছিল নৌকার মাঝি। বৌদ্ধজাতক গল্পে (Older than the first and second century B.C.) জেলেদেরকে কেবাত্তা (Kebatta) বা কেবার্তা (Kebarta) বলা হয়। আজও পূর্ববঙ্গের কৈবার্তারা হয় জেলে না হয় নৌকার মাঝি। খ্রিষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে কৈবর্তরা বাংলায় কেবাত্তা নামে পরিচিত ছিল। বৃহৎধর্মপুরাণে (১৩০০ খ্রিষ্টাব্দ) ৪১ টি বর্ণের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে স্বতন্ত্র দুই বর্ণ— ধীবর (মাছ ব্যবসায়ী) এবং জালিয়া (জেলে/মৎস্যজীবী)। তাছাড়া এখানে রাজবংশী ও মালো নামে দুটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ রয়েছে, যাদের জীবিকা মাছ ধরা ও বিক্রি করা।[৯] পুরাণ থেকে যেমন মাছ ও মৎস্যজীবীর কথা জানা যায়, প্রাচীন সাহিত্য থেকে তেমনি মৎস্য প্রীতির কথা জানতে পারা যায়। গৌরী সেন প্রাচীন যুগ থেকে বাংলা ও মিথিলার নিবিড় সম্পর্কের কথা বোঝাতে জনৈক মৈথিলী কবির কথায় বলেছেন—

"কোচ্চিবদন্ত্যমৃতমস্তি পুরে সুরানাং।
কোচ্চিবদান্ত বনিতাধরপল্লবেষু।।
ব্রুমো বয়ং সকল শাস্ত্র বিচার দক্ষাঃ।
জম্বীর নীর পরিপুরিত মৎস্য খন্ডে।।"[১০]

অর্থাৎ কেউ বলে অমৃত আছে স্বর্গে, কেউ বলে নারীর অধর সুধাই দিতে পারে অমৃতের আস্বাদ, কিন্তু সকল শাস্ত্র বিচার করে মনে হয়, মাছের ঝোলের সাথে জামির লেবু মেখে ভাত খেয়ে যে সুখ হয় তাই অমৃত আস্বাদন।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য মাছের অসংখ্য উদাহরণে সমৃদ্ধ। চণ্ডীদাস তাঁর লেখায়, দ্বীজ-বংশীবদন সিংহল সম্রাটকে দেওয়া উপহারের তালিকায় শুঁটকি মাছ সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত ম্যাঙ্গোফিস বা তপসে মাছের প্রশস্তি করেছেন। অমৃতলাল ইলিশ, রাজকৃষ্ণ রায় ইলিশ-তপসে মাছের উল্লেখ করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যে মাছের উপমা রয়েছে। কবি হেমচন্দ্র মাগুর মাছের ঝোল নিয়ে কবিতা লিখেছেন, কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ইলিশকে নিয়ে ছন্দের কবিতা লিখেছেন, রবিঠাকুর তাঁর লেখাতে মাছ ধরার বর্ণনা করেছেন। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মাছ ও বঁড়শির উল্লেখ রয়েছে।[১১] মাছ এইভাবে আমাদের জীবন-জীবিকা, ঘরোয়া আলাপ, কবিতা-রম্যরচনা, ভালবাসা-শ্রদ্ধা, বিরহে-মিলনে, দুঃখে-সুখে জড়িয়ে আছে। মাছ আমাদের জীবনে এমনই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সুদূর অতীত থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এই মৎস্য সংস্কৃতি লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম। সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে বসবাসকারী ৭০ শতাংশ মানুষই কোন না কোন ভাবে মাছের সাথে যুক্ত, তৈরি হয়েছে নিজস্ব ও স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। বংশ পরম্পরায় জাল বুনে, মাছ ধরে, জলের রং দেখে মাছের উপস্থিতি বোঝা, আবহাওয়ার চেহারা বোঝা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সাথে লড়াই, বাঘ-কামট-কুমিরের ভয় এসবের মাঝে জীবন যুদ্ধের মানসিক শক্তি নিয়ে অসামান্য পেশাগত দক্ষ এই মৎস্যজীবী সম্প্রদায়।

গবেষণা সন্দর্ভের সময়কাল

এই গবেষণা সন্দর্ভের নামকরণ করা হয়েছে স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের পর্যালোচনা (১৯৪৭-২০২১)। উল্লিখিত গবেষণা সন্দর্ভের সময়কাল ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত নির্ধারণ করেছি। গবেষণা শুরুর সময়কাল হিসেবে ১৯৪৭ সাল নেওয়ার উদ্দেশ্য হল, ১৯৪৭ সালের পরে অখণ্ড সুন্দরবন ভারতবর্ষ ও পূর্ব পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) মধ্যে দ্বিখন্ডিত হয়। এই গবেষণার শিরোনামে যে সুন্দরবনের ইতিহাস পর্যালোচিত করার চেষ্টা করা হয়েছে তা ভারতীয় সুন্দরবন। সেকারণেই যুগসন্ধিক্ষণ হিসেবে ১৯৪৭ সালকে নির্বাচন করেছি। মৎস্যজীবীদের ইতিহাস চর্চায় ২০২১ সালকে নির্বাচন কারণ হল, ভারত সরকার ২০২১ সালে যে নতুন মৎস্যবিল এনেছে তার দ্বারা বহুমুখী পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে উপকূলীয় মৎস্য শ্রমিক ও ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের জীবিকা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে সুনিশ্চিত করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকাশিত সর্বশেষ ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যার যে চাপ তা সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকার উপর আঘাত এনে বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়কে আরও প্রকট করে তুলেছে। তাছাড়া ২০২১ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয় আমফান ও ইয়াস দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত নোনা জলের মাছ চাষিদের সহায়তা করার জন্য ঐ বছরে 'স্বর্ণমৎস্য যোজনা' নামে প্রকল্প নেওয়া হয়েছে তা কিভাবে মৎস্যজীবীদের জীবিকার উপর পরিবর্তন এনেছে তা এখনও জানা যায়নি। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ বা International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) এর রেড লিস্ট অফ ইকোসিস্টেম ফ্রেমওয়ার্ক-এর অধীনে ২০২০-২১ সালের মূল্যায়নে ভারতীয় সুন্দরবনকে বিপন্ন বলে উল্লেখ করেছে।

তাছাড়া এই সময়কালের মধ্যে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক পট পরিবর্তন সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তাই বর্তমান গবেষণায় এই সামগ্রিক সময়কালকে বিশ্লেষণ করেছি।

আমার বিশ্লেষণের প্রধান উপজীব্য হল ভারতীয় সুন্দরবনের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্যজীবীরা। বর্তমানে আমাদের দেশে মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক জীবনের উন্নয়নে মৎস্য শিকারের অবদান রয়েছে। মাছের উৎপাদন ১৯৫০ সালের ৮,০০,০০০ টন থেকে ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে ৪.১ মিলিয়ন টন বেড়েছে। ১৯৯০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ভারতীয় মৎস্য শিল্প ত্বরান্বিত হয়েছে, মোট সামুদ্রিক এবং মিষ্টি জলের মাছের উৎপাদন প্রায় ৮ মিলিয়ন মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। ২০০৬ সালে, ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার তার কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীনে মৎস্য চাষের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি নিবেদিত সংস্থার সূচনা করে। যৌথ উদ্যোগের মাধ্যমে উপকূলীয় মৎস্য চাষকে আধুনিকীকরণ এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরাকে উৎসাহিত করার জন্য ব্যাপক ও নিবিড় অভ্যন্তরীণ মাছ চাষের প্রচারের জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টার ফলে উপকূলীয় মৎস্য উৎপাদন ১৯৫০ সালের ৫২,০০,০০০ টন থেকে ২০১৩ অর্থবছরে ৩.৩৫ মিলিয়ন টন বেড়েছে। ২০০৮ সালে ভারত মৎস্য উৎপাদনে, বার্ষিক মোট অভ্যন্তরীণ পণ্যের ১% এরও বেশি অবদান রেখেছিল। ভারত বিদেশে মাছ রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা নিয়ে আসছে।[১২] এই মৎস্য যেমন পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান দেয় সেই সঙ্গে বৃহৎ কর্মসংস্থানের জায়গাও তৈরি করেছে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৭-০৮ থেকে ২০১০-১১ সালে মোট মৎস্য উৎপাদন ছিল ৫৮ লক্ষ ৮২ হাজার মেট্রিক টন, ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ সালে রাজ্যে মৎস্য উৎপাদন বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি।[১৩] সারা ভারতে

মৎস্য উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয়। ২০১৯ থেকে ২০২০ সালের হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ ১৭.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদন করেছে।[১৪] যার একটা বড় অংশের মৎস্য উৎপাদন সুন্দরবনের নদী-খাল-বিল, জলাশয় ও সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল মৎস্যকে কেন্দ্র করে ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে বসবাসকারী অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবিকার মাধ্যম হিসাবে এই সম্পদ কাজ করে চলেছে।

উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উন্নয়নশীল ১৯টি ব্লক নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবনের জনবসতি। সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরবনে প্রায় ৫ লক্ষের অধিক মানুষ সরাসরিভাবে মৎস্য কেন্দ্রিক জীবিকার সঙ্গে জড়িত। সুবিস্তৃত এই সুন্দরবনের মানুষের মৎস্য চাষ ও মৎস্য সংগ্রহ কেন্দ্রিক জীবন-জীবিকার ইতিহাস খুবই ঘটনাবহুল। মৎস্যজীবীদের জীবন প্রকৃতি নির্ভর, যেকারণে মৎস্যজীবীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে উপেক্ষা করা যায় না। মাছ ধরা মানব সমাজের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম মাধ্যম। সুন্দরবনের ঐতিহ্যবাহী এই জেলে সম্প্রদায় মাছ ধরাকে তাদের পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল মাছের সহজলভ্যতা, মৎস্য চাষ এবং বড় জাতের মাছের প্রতি এই অঞ্চলের মানুষদের ভালোবাসার কারণে। তাই মৎস্যের সাথে তাদের সম্পর্ক এতটাই নিবিড় যে প্রকৃতিই তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতির নিয়ন্ত্রক। ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বড় মৎস্যক্ষেত্রে অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল এবং তারা প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়ে অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষে মাছ ধরার প্রথাগত অধিকার উপভোগ করতে পারত। কিন্তু ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ধীরে ধীরে জলাশয়ের উপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করলে

মৎস্যজীবীদের জীবিকার পরিসরও সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। আবার স্বাধীনোত্তর পর্বে এই মৎস্য নির্ভর জীবিকাই মৎস্যজীবীদেরকে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে পরিপূর্ণতার পথে চালিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। সুন্দরবনের পরিবেশ, অর্থনীতি, সমাজজীবন, জলসম্পদ, মৎস্যসম্পদ, ও সংস্কৃতি নিয়ে যে বাস্তুতন্ত্র গড়ে উঠেছে, সেই বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন চিত্র তুলে ধরাই আমার গবেষণার উদ্দেশ্যে।

সুন্দরবনঃ প্রাকৃতিক পরিচয়

সুন্দরবন হল প্রাচীন কালের এক সমৃদ্ধ জনপদ। সুন্দরবন যত প্রাচীনই হোক, নামের দিক থেকে সুন্দরবন তত প্রাচীন নয়। বিভিন্ন গ্রন্থে বিভিন্ন নামে সুন্দরবনের পরিচিতি পাওয়া যায়। ইতিহাসে বর্ণিত গঙ্গে, গঙ্গাহৃদি, সমতট, ব্যাঘ্রতটী, কালিকাবন, রসাতল, হরিকেল, পাতাল, বঙ্গাল, পুন্ড্রবর্মন প্রভৃতি সব স্থাননামের অন্তরালে সুন্দরবনের পরিচিতি রয়েছে। তবে ঐতিহাসিকদের লেখনীতে এই নিম্নভূমি কখনো 'ভাটি' আবার কখনো 'বারভাটি বাঙ্গালা' নামে উল্লিখিত হয়েছে। তবে বর্তমানে এই অঞ্চল সুন্দরবন নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রাচীন যুগে ভারতে আঙ্গেরীয় বন, প্রাচ্যবন, নৈমিষারণ্য, পঞ্চনদবন, সৌরাষ্ট্রবন, অপরান্তক বন, বামন বন, দশার্ণকবন, কারুষবন, দন্ড্যকারণ্য, কলিঙ্গবন, ও কালেসবন— এইরূপ তেরোটি মহারণ্য-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আঙ্গেরীয় বন থকে সুন্দরবনের সৃষ্টি।[১৫] বঙ্গোপসাগরের থেকে ধেয়ে আসা সামুদ্রিক ঝড়, জীব-বৈচিত্র্যের বিপুল সম্ভার, বাঘে-মানুষের লড়াই ও জোয়ার-ভাঁটা নির্ভর নদীগুলি থেকে মানুষের বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহের কঠোর লড়াই এবং সুন্দরবন নিয়ে মানুষের তীব্র কৌতূহল— এসবের মধ্যেই আবার প্রশ্ন জাগে সুন্দরবনের নামকরণের। ভয়ংকর বিপদসংকুল এই অরণ্যের নাম সুন্দরবন কেন হল এই প্রসঙ্গে Fredrick Eden Pargiter উল্লেখ করেছেন—"The derivation

of the word Sundarban is undecided. Several derivations have been suggested, but only two appear to me to deserve attention. One is sundari, "the sundari tree", and ban, "forest", the whole meaning "the sundari forests;" and the other samudra, "the sea", and ban, "forests", the whole meaning "the forest near the sea." There are two arguments in favour of the former— first, that the sundari the commonest tree there, and secondly, that the word is sometimes locally pronounced as Sundariban. There is one argument in favour of the second derivation, the word Samudravana in Sanskrit means to the author as meaning large forest tracts near the sea."[১৬] সুন্দরী বৃক্ষের কারণে এই অঞ্চল সুন্দরবন এই মতামত যথার্থ। "সুন্দরবনের সর্বত্র প্রচুর সুন্দরী বৃক্ষ জন্মায়, সুন্দরী বৃক্ষই অন্যান্য বৃক্ষ অপেক্ষা জনসাধারণের কাছে অধিক পরিচিত। সর্বজন পরিচিত সুন্দরবন হইতেই বনবিভাগের নামকরণ করা হয়েছে সুন্দরবন।"[১৭] 'History of Baker Gange' গ্রন্থে উল্লিখিত হয়েছে অবিভক্ত সুন্দরবনের বাখরগঞ্জ জেলার সুগন্ধা নদী রয়েছে, এই সুগন্ধা নদীর পাড়ের বনভূমিকে সুন্দরবন বলা হয়ে থাকে।[১৮] খ্রিষ্টীয় ষোল-সতেরো শতকের সময়কালে ইউরোপীয়রা সাগরের পথ ধরে এদেশে আসতো। তারা এই ভূভাগকে 'সানড্রাইবনস' নামে ডাকতো, তা থেকেই এই বনভূমি সুন্দরবন। খ্রিষ্টীয় সাত-আট শতকে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা বনিকেরা সাগরের উপকূলে দাঁড়িয়ে থাকা এই বনকে 'সমুদ্দর বন' বলত, সেখান থেকে এই অঞ্চল সুন্দরবন।[১৯]

অতি প্রাচীনকাল থেকে সুন্দরবনের অস্তিত্বের কথা জানা যায়। দুই থেকে তিন হাজার বছর আগে এই সুন্দরবন জলের গভীরে ছিল। পঞ্চম থেকে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে সাগরের বুকে পলির দ্বীপ হিসেবে সুন্দরবনের ব-দ্বীপ উত্থিত হয়েছিল। পুরাণ বা ধর্মগ্রন্থে সমুদ্রতীরে বনের বিবরণ আছে। সেন আমলের রাজত্বকালে (১০৯৫-১২০৫) সুন্দরবন, সেন সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। পঞ্চদশ শতকে খান জাহান আলি সুন্দরবনে আবাদ করে গ্রাম ও নগর পত্তন করেছিলেন।[২০] মোগল আমলে সুন্দরবন সাতগাঁ সরকারের অধীনে ছিল। মোগল সম্রাট আকবরের সময়ে টোডরমল ১৫৮২ সাল নাগাদ সুন্দরবনের বিস্তৃত এলাকা জরিপ করে রাজস্ব নির্ধারণ করেছিল।[২১] সুলতান সুজার নেতৃত্বে ১৬৫৮ সালে সুন্দরবন জরিপ করে মুরাদখানা নামে চিহ্নিত হয়েছিল। মামুদ শাহের সময়ে জাফর খাঁর নেতৃত্বে তৃতীয়বার সুন্দরবন জরিপ হয়। পরে মিরকাশিমের সময়ে ১৭৬১-৬২ সালে সুন্দরবন চতুর্থবার জরিপ করা হয়েছিল। সুন্দরবন তখন কাঠ, মোম, মধু, লবণ ও চুন সংগ্রহের স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় এবং সুন্দরবনের আর্থিক সম্পদের দিকে সরকারের দৃষ্টি পড়েছিল।[২২] ইতিমধ্যে মীরজাফরের কাছ থেকে ১৭৫৭ সালে লর্ড ক্লাইভ চব্বিশ পরগণার জমিদারি হস্তগত করেছিল। “On the 20th December 1757, Mir Jafar, the new Nawab of Bengal, made an assignment to the East India Company of zamindari or landholder’s rights over a tract of country known as the Zamindari of Calcutta, or as the 24-Parganas Zamindari.”[২৩] কৃষিকাজের উদ্দেশ্যে ১৭৭০ সালে সুন্দরবনের জঙ্গল সংস্কার করে আবাদে পরিণত করার কাজ শুরু করেছিল কালেকটর-জেনারেল ক্লড রাসেল।[২৪] ১৮২৫ সালে নবম রেগুলেশন আইনে সুন্দরবনের উপর সরকারের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসনদন্ড ইস্ট ইন্ডিয়া

কোম্পানির নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে চলে আসে, সেই সঙ্গে সুন্দরবনও তার স্বতন্ত্রতা হারায়। যদিও ১৮৭৪ সালে সুন্দরবনের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে বাংলার লেফটেনেন্ট গর্ভনর স্যার রিচার্ড টেম্পল এই অঞ্চলকে সংরক্ষিত বনাঞ্চল হিসাবে রক্ষা করার প্রস্তাব নিয়েছিলেন। ১৯০৩ সালে সুন্দরবন কমিটি এই জঙ্গল এলাকায় রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করে। ১৯৪৭ সালের আগে পর্যন্ত সুন্দরবন ব্রিটিশ সরকারের অধীনে শাসিত হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে রাজনৈতিক সীমারেখা দ্বারা সুন্দরবন দ্বিধাবিভক্ত হয়। ভারতবর্ষ এক বৈচিত্র্যময় দেশ। এই বৈচিত্র্য অনেক সময় মানুষের জীবিকার ধারণের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে। যুগ যুগ ধরে সেই জীবিকাই আবার সে এলাকার সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিমণ্ডলকে পরিচালিত করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দক্ষিণাংশ জুড়ে লবণাম্বু অরণ্যভূমি হল সুন্দরবন। স্থানীয় ভাষায় এটি বাদাবন নামেও পরিচিত। সুন্দরবনবাসী মৎস্য নির্ভর জীবিকায় এক অনন্যতা রেখেছে। তবে সময়ের গতিময়তার সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়, সরকারি বিভিন্ন নিয়ম নীতি, অভিপ্রয়াণ ও জীবিকার পরিবর্তন তাদের সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনকে সঙ্কটের মধ্যে দাঁড় করিয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে এই এলাকার উল্লেখ থাকলেও ঔপনিবেশিক সরকার প্রশাসনিক সুবিধার্থে বিশেষ ভাবে এই এলাকাকে চিহ্নিত করে। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৮৮২ বর্গমাইল এলাকা বিশিষ্ট চব্বিশটি পরগণার জমিদারি স্বত্ব লাভ করে। বাংলার নবাব মীরজাফর কর্তৃক ক্লাইভকে দেওয়া চব্বিশটি পরগণার দলিলে কলিকাতা, আকবরপুর, আমীরপুর, আজিমাবাদ, বালিয়া, মেদনিমল, ময়দা, হাতিয়াগড়, পেচাকুলি, শাহপুর, ও উত্তর পরগণা প্রভৃতি এলাকার নামের উল্লেখ রয়েছে। এখানকার মানুষ মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভর করেই তাদের জীবন ও জীবিকাকে গড়ে তোলে।

মৎস্য নির্ভর জীবিকার টানে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এই এলাকায় মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভর করে সুন্দরবনের মানুষজন এক স্বতন্ত্র সমাজ সংস্কৃতি গড়ে তোলে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকারি বিভিন্ন নিয়মনীতি, বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় ও পরিকাঠামোগত অভাব এই মৎস্য নির্ভর সমাজ-সংস্কৃতি ও অর্থনীতিকে এক গভীর সংকটের মধ্যে দাঁড় করিয়েছে।

দীর্ঘদিন চর্চার অভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় সমাজের অগোচরেই রয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যিক বর্ণনায় এর কিছু উল্লেখ থাকলেও ঔপনিবেশিক সরকার প্রথম এই মানুষদেরকে চর্চার আলোতে নিয়ে আসে। তবে নিম্নবর্গের চর্চার সূত্র ধরেই আরো গভীরে আরো স্বতন্ত্রভাবে মৎস্যজীবীদের নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। পৃথিবীর প্রতিটি সম্প্রদায়ের মানুষদের এলাকা ভিত্তিক স্বতন্ত্র এক পরিচিতি রয়েছে। সেই এলাকার সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি গঠনে মুখ্য ভূমিকা নিয়ে থাকে সেখানকার গঠন ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডল। সেই রকম ভাবেই সুন্দরবনের মানুষের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি গঠনে সেই এলাকার গঠন ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। জঙ্গলময় এই এলাকাটি একসময় মনুষ্য বসবাসের উপযোগী ছিল না। ঔপনিবেশিক সরকার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার্থে ১৭৭০ সাল থেকে এই এলাকার সংস্কারের কাজ শুরু করে। যার দরুন এলাকাটি মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে বাংলার সীমানা নতুন ভাবে গঠিত হলেও এই এলাকার গঠনের দিক থেকে বিশেষ কিছু পরিবর্তন হয়নি ঠিকই, তবে সময়ের সাথে সাথে সুন্দরবন ভূ-প্রকৃতিগত দিক থেকে অবনমনের দিকে এগিয়েছে যা সুন্দরবনের মানুষদের জীবন ও জীবিকায় কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। এখানকার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল এই এলাকাটিকে মৎস্য নির্ভর জীবন জীবিকা গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। সুন্দরবন পুরোটাই একটা জলাভূমি। মৎস্য চাষের উপযুক্ত

পরিবেশ থাকায় এখানকার মানুষ কৃষি কাজের পরিবর্তে মৎস্য চাষকে তাদের জীবন জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। এই মৎস্য নির্ভর জীবন জীবিকা সুন্দরবনের মানুষদের সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি গঠনে অনন্যতা দান করেছে। একদিকে যেমন মাছ ধরা ও মাছ চাষের মাধ্যমে যে অর্থ উপার্জন হয় সেই অর্থের বিনিময়ে তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উৎসব-অনুষ্ঠান পরিচালিত হয়। তেমনি অন্যদিকে মৎস্যকে কেন্দ্র করে জেলেদের গাওয়া বিভিন্ন গান, লোকাচার, বিশ্বাস ও বিভিন্ন খেলার প্রতিযোগিতা সাংস্কৃতিক তথ্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কালে বাংলার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহত্তর অর্থে না হলেও সুন্দরবনে এর একটা প্রভাব এসেছিল। ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে ৩৮ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে। এর কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু সুন্দরবনে বসতি বিস্তার করে। আবার এই এলাকার জমির স্বত্বাধিকারীরা ছিল মেদিনীপুরের জমিদার শ্রেণী। জমির দেখভাল, জঙ্গল পরিষ্কারের ও বিভিন্ন সংস্কার মূলক কাজে মেদিনীপুর থেকে প্রচুর মানুষ এখানে আসতে থাকে। ফলে একদিকে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু, মেদিনীপুরের শবর-সাঁওতাল আর সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষদের মধ্যে এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান ঘটতে থাকে। এই ভাব বিনিময়ে তৈরি হয় এক মিশ্র সংস্কৃতির। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় সুন্দরবনের জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষের অধিক, এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দরুন পূর্বে সৃষ্ট হওয়া তেভাগা আন্দোলন, বর্গা আন্দোলন ও বিভিন্ন ভূমি সংস্কার আইন এই এলাকার জীবন-জীবিকায় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

অন্যদিকে এখানকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের দরুন ১৯৪৭ থেকে ২০২১ পর্যন্ত সৃষ্ট হওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস) একদিকে যেমন ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ বাড়িয়েছে তেমনি

অন্যদিকে লবনাক্ততার বৃদ্ধি চাষযোগ্য জমি ও মৎস্য চাষের অনুকূল পরিবেশকে নষ্ট করেছে। আবার ঘূর্ণিঝড়, বন্যা মৎস্যজীবীদের থাকার বাসভূমিকেও নষ্ট করেছে। কিন্তু এই ভূমিক্ষয় রোধ, জেলেদের বসতি নির্মাণ ও উদ্বাস্তু সমস্যায় তৎকালীন সরকার কিছু প্রকল্পের ঘোষণা করলেও তা বাস্তবায়নের পথে অনেক ত্রুটি থেকে যায়। যার দরুন এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণের জন্য মানুষ মৎস্য নির্ভর জীবন জীবিকার পরিবর্তে অন্য জীবিকাকে বেছে নিয়েছে। এরই সঙ্গে বিভিন্ন সমিতি ও সংগঠন স্থাপনের মাধ্যমে জেলেরা মৎস্য নির্ভর জীবন জীবিকাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে। তৎকালীন সরকারি বিভিন্ন নিয়মনীতি, প্রকল্পের বাস্তবায়নের বিভিন্ন ত্রুটিগুলি কিভাবে সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল এবং মিশ্র সংস্কৃতি জেলেদের মৎস্য নির্ভর সমাজ-সংস্কৃতিতে কি ধরণের প্রভাব এনেছিল? এই প্রশ্ন গুলির পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আমি এই গবেষণায় দেখানোর চেষ্টা করেছি কিভাবে মৎস্যজীবীদের মৎস্য নির্ভর জীবন-জীবিকা ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ধারা এসেছিল? সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল এখানকার মানুষদের জীবন জীবিকার উপর সর্বদাই যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। প্রাকৃতিক বিশৃঙ্খলা ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস একদিকে যেমন নদীবাঁধের উপর আঘাত হানে, তেমনি প্রচুর এলাকা নোনা জলে প্লাবিত করে। যার দরুন কৃষিকাজ ও মৎস্য চাষের উপরও যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। মূলত মৎস্য নির্ভর জীবিকা হলেও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এখানকার মানুষ বিভিন্ন পেশার মধ্যে জড়িয়ে জীবন চালিত করে। বর্তমানে সুন্দরবনের জেলে-মৎস্যজীবী মানুষেরা এক গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্যহীনতা যেমন একদিকে তাদের শিরঃপীড়ার কারণ আবার অপরদিকে সরকারি নীতির কার্যকারিতায় জীবন জেরবার। নদী ও সমুদ্রের মাছ ধরার উপর রয়েছে নানান বিধিনিষেধ। সুন্দরবনের প্রতিকূল এই পরিবেশে কিভাবে যুগ যুগ ধরে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষেরা

নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে পেরেছে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত করছে সেটাই তুলে ধরাই হবে আমার গবেষণার উদ্দেশ্য।

সাহিত্য পুনঃসমীক্ষা

প্রাথমিক ভাবে মৎস্যজীবীদের নিয়ে চর্চা হত পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের জীবন-জীবিকা ও সমাজ সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হয় বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে। মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে রচিত গ্রন্থ গুলিকে গবেষণা কাজের সুবিধার্থে আলোচনা করতে পারি। W W Hunter (1875), তাঁর ‘A Statistical Account of Bengal: Districts of the 24 Parganas and Sundarbans’ গ্রন্থে জেলে জাতি, তাদের সংখ্যা এবং অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা করেছেন।[২৫] L. S. S. O’Malley (1914), তাঁর ‘Bengal District Gazetteers: 24 Parganas’ গ্রন্থে বাংলার উপকূলীয় জেলাগুলির মৎস্যজীবীদের প্রসঙ্গ ও তাদের সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার প্রসঙ্গে তথ্য দিয়েছেন।[২৬] K. G. Gupta (1908), তাঁর ‘Reports on the results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into Fishery Matters in Europe and America’ তথ্যে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও তাদের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার মৎস্য বিষয়ক অনুসন্ধানও লিপিবদ্ধ করেছেন।[২৭] B. Hamilton (1822), তাঁর ‘An Account of the Fishes found in the River Ganges and its Branches’ গ্রন্থে বাংলার মৎস্যের বর্ণনার পাশাপাশি, জেলেদের মৎস্য ধরার প্রযুক্তি ও মেছোদের অবস্থা সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরেছেন।[২৮] একই ভাবে T. C. Das (1931), ‘The Cultural Significance of Fish in Bengal’ প্রবন্ধে বাঙালির জীবনে মাছের বহুমুখী ভূমিকার বিষয়ে আলোকপাত করেছেন।[২৯] Dr. Sundarlal Hora, Journal of the Asiatic Society of

Bengal (1932 to 1955) জার্নালে প্রকাশিত 'Ancient Hindu Conception of Correlations between form and Locomotion of Fishes', 'Knowledge of the Ancient Hindus Concerning Fish and Fisheries of India', and 'Symposium of Hilsa and its Fiseries', এই গবেষণামূলক নিবন্ধগুলিতে ঐতিহাসিকভাবে প্রাচীন হিন্দুদের মাছ, মাছের বিপণন, মাছ চাষের সমস্যা, মাছ ধরা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন ধরণের তথ্য প্রদান করছেন।[৩০] K. C. Saha (1970), তাঁর 'Fisheries of West bengal' গ্রন্থে ফিশারি সম্পর্কিত একটা গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি উপকূলের অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষ, মোহনা ও সমুদ্রে মাছ ধরা, এবং মাছের বাজারজাতকরণ, মাছের সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মৎস্যজীবীদের অবস্থা সম্পর্কে একটা চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩১] Arne Martin Klausen (1968), তাঁর 'Kerala Fishermen and Indo-Norwegian Pilot Project' গবেষণামূলক গ্রন্থে কেরলের উপকূলের দুটি পাশাপাশি গ্রামের মৎস্যজীবীদের জীবনের উপর প্রযুক্তি ও অর্থনীতির ভূমিকা কিভাবে পড়েছিল, সেই চিত্র তুলে ধরেছেন।[৩২] Rup Kumar Barman (2008), তাঁর 'Fisheries and Fishermen A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal' গ্রন্থে ঔপনিবেশিক বাংলা এবং উত্তর-ঔপনিবেশিক পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী জেলে সম্প্রদায়, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক, জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ এবং ঔপনিবেশিক আমলে মাছ ধরার শিল্পের বাণিজ্যিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এছাড়াও তিনি জেলেদের প্রতি উত্তর-ঔপনিবেশিক চ্যালেঞ্জ এবং জেলেদের মর্যাদা উন্নীত করার জন্য রাষ্ট্রের প্রচেষ্টাগুলির সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করেছেন। এই আলোচনায় বিভিন্ন জাতির মানুষের

সম্মিলিত অংশগ্রহণে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবিকার দিকটা তুলে ধরে আরও বেশি তথ্য সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।[৩৩] Bikash Raychaudhuri (1980), তাঁর "The Moon and the Net: Study of A Transient Community of Fishermen At Jambudwip" গ্রন্থে সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপে বসবাসকারী মৎস্যজীবীরা যে নির্দিষ্ট সময়ে মাছ ব্যবসার উপর বিশাল কর্মকান্ড পরিচালিত করত, তাদের মূল বাসস্থান সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি বিষয় তুলে ধরেছেন। মৎস্যজীবীরা তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাছ ধরার কাজে যুক্ত থেকে অর্থনৈতিক জীবন অতিবাহিত করছে তাও তিনি আলোচনা করেছেন।[৩৪] Suman Kalyan Samanta (2022), 'Continuity and Change of the Traditional Fishing Communities: A Study of Purba Medinipur Coast' গ্রন্থে পূর্ব মেদিনীপুরের উপকূলীয় ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের সামুদ্রিক জীবিকার জটিলতায় তাদের অর্থনীতিকে কিভাবে পরিচালিত করছে সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।[৩৫] S K Pramanik (1993), তাঁর "Fishermen Communities of Coastal Villages in West Bengal" গ্রন্থে দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুলতানপুর ও হারা নামক দুটি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের জীবনের প্রতি আলোকপাত করেছেন।[৩৬] Annu Jalais (2010), তাঁর 'Forest of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans' গ্রন্থে সুন্দরবনের নানা দিকের খন্ডিত ইতিহাস বিশ্লেষণ করে, মূলত সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যজনিত প্রশ্নে বাঘের প্রয়োজনীয়তার প্রতি আলোকপাত করেছেন।[৩৭] ইন্দ্রানী ঘোষাল (২০০৬), তাঁর "সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য" গ্রন্থে মৎস্যজীবীদের জীবন ও লোকসংস্কৃতি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন।[৩৮] রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, (২০০৭) 'সুন্দরবনের অর্থনীতি

জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ' গ্রন্থে সুন্দরবনের অর্থনীতিকে স্বল্প পরিসরে তুলে ধরেছেন।[৩৯] Sutapa Chatterjee Sarkar (2010), তাঁর 'The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals' গ্রন্থে সুন্দরবনের জমি উদ্ধার, পোর্ট ক্যানিং ও গোসাবা সমবায়ের উন্নয়ন, ক্রমবর্ধমান নদীর জোয়ার ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন।[৪০] সতীশ চন্দ্র মিত্র (১৩২১, ১৯৬৫), তাঁর দুই খন্ডে রচিত 'যশোর খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থে সুন্দরবনের উত্থান, মানুষের বাসস্থান সংক্রান্ত ইতিহাস ও সমাজ-সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাছাড়া এই বঙ্গে মোগল, পাঠান ও ব্রিটিশ আধিপত্য নিয়েও আলোচনা করেছেন।[৪১] সুন্দরবনের ইতিহাস রচনায় বই দুটিকে প্রামাণ্য দলিল বলা যেতে পারে।

কেবলমাত্র ইতিহাসমূলক গ্রন্থ নয় সুন্দরবনকে জানা ও চেনার জন্য সাহিত্যমূলক গ্রন্থ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিবশঙ্কর মিত্রের 'সুন্দরবন সমগ্র' (১৩৭১), ও 'সুন্দরবনে আর্জান সর্দার' (১৩৬৮), অমিতাভ ঘোষের (২০০৫), 'The Hungry Tide' প্রভৃতি রচনা থেকে সুন্দরবনকে আরও বেশি করে জানা যায়। সমরেশ বসুর (১৩৬৪), 'গঙ্গা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৩৫৫) 'পদ্মা নদীর মাঝি' ও অদ্বৈত মল্লবর্মণের (১৩৬৫), 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি উপন্যাসগুলিতে জেলে ও তাদের মাছ ধরার জীবন কাহিনী চিত্রিত হয়েছে। এই সাহিত্য ও উপন্যাসগুলি ইতিহাস রচনার এক স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। এই সব রচনার মধ্য দিয়ে আমার গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি।

গবেষণা সম্পর্কিত প্রশ্নাবলী

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভে নিম্নলিখিত প্রশ্ন গুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। **প্রথমত,** পেশা হিসাবে মৎস্য সম্পদের উপর নির্ভরশীলতা কিভাবে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সামাজিক জীবনকে

প্রভাবিত করে? **দ্বিতীয়ত,** স্বাধীন ভারতে সরকারি প্রকল্প ও প্রগতির প্রচেষ্টাগুলি মৎস্যজীবীদের জীবন জীবিকায় কতটা প্রভাব ফেলেছিল? **তৃতীয়ত,** সরকারি সহযোগিতা ও বাজার অর্থনীতির দ্বারা সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অস্তিত্বের অবস্থা কিভাবে প্রভাবিত হয়? **চতুর্থত,** মৎস্যজীবীদের অর্থনীতির রূপরেখায় প্রযুক্তির কি ভূমিকা রয়েছে? **পঞ্চমত,** পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় মৎস্যজীবীদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে কি ধরণের প্রভাব নিয়ে এসেছে?

সুন্দরবনের কাকদ্বীপ কিংবা নামখানার মৎস্যজীবীদের নিয়ে আলোচনা থাকলেও, সমগ্র সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের নিয়ে সেই রকম ভাবে কোন গবেষণামূলক কাজ হয়নি। মাছধরা ও মাছচাষের সঙ্গে যুক্ত মানুষগুলোকে কোন জাতিগত বিভাজন না করে 'মৎস্যজীবী' এই সাধারণ পরিচিতির মধ্য দিয়ে আমি আমার গবেষণার পর্যালোচনা করেছি। আমার গবেষণার মাধ্যমে নিম্নলিখিত আরও বেশ কিছু প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি– মৎস্যজীবী জেলে মানুষেরা সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে নিজেদেরকে মানিয়ে নিয়ে তাদের জীবন চালিত করছে? সরকারি নীতির বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে তাতে কি ধরণের প্রভাব পড়েছে মৎস্যজীবীদের উপর? নদী-সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীদের নিজস্ব বা বংশানুক্রমিক যে পদ্ধতিগত জ্ঞান এবং সরকারি নিরাপত্তামূলক ঘোষণা কিভাবে তাদের সহযোগিতা করে?

অধ্যায় বিভাজন

এই গবেষণা সন্দর্ভের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কিছু অজানা ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার নানা দিক বিশ্লেষিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। গবেষণার সুবিধার্থে নিম্নলিখিত চারটি অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে

সুন্দরবনের গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও মৎস্যজীবীদের সমাজ-সংস্কৃতি। উক্ত অধ্যায়ে ঔপনিবেশিক সময়কালে অবিভক্ত সুন্দরবনের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ১৭৭০ সাল থেকে টিলম্যান হেঙ্কেল সুন্দরবনের আবাদ ভূমির সংস্কার করিয়ে ইজারা প্রথার মাধ্যমে রাজস্ব লাভের জন্য বসতি গড়ে তুলেছিলেন সেই ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। ১৭৭০ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঔপনিবেশিক সরকারের প্রচেষ্টায় যে ভূমি সংস্কার হয়েছিল অর্থাৎ সুন্দরবনের ভূমি ব্যবস্থার সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের যে গঠন, তা আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর সুন্দরবন দ্বিখণ্ডিত হয়। স্বাধীনোত্তর পর্বেও সুন্দরবনের জঙ্গল সংস্কারের কাজ থেমে থাকেনি, ১৯৭৮ সাল পর্যন্তও সুন্দরবন সংস্কার করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১০২ টি দ্বীপ নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবনের আয়তন ৯৬৩০ বর্গ কিলোমিটার, ৫৪ টি দ্বীপে মানুষের বসতি নির্মিত হয়েছে। সুন্দরবন বহু নদী-খাল-খাঁড়ি সহ বনজ সম্পদ ও মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। সুন্দরবনের এই ভৌগোলিক সমৃদ্ধি বিশ্বের কাছে এক অনন্যতা প্রদান করেছে। সুন্দরবনের ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে উঠেছে। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবতপুরে ১৯৭৬ সালে গড়ে তোলা হয়েছে কুমির প্রকল্প। ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি বনাঞ্চলের ৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার, হ্যালিডে দ্বীপের ৫.৯৫ বর্গ কিলোমিটার এবং লোথিয়ান দ্বীপের ৩৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ১৯৭৬ সালে 'বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য' ঘোষণা করা হয়েছে। সুন্দরবন ১৯৮৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৮৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগণা জেলাকে ভেঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা গঠন করা হয়, এই দুই পরগণার ১৯ টি উন্নয়নশীল ব্লক নিয়ে ভারতীয় সুন্দরবনের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া স্বাধীনোত্তর পর্বে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে

সুন্দরবনের জনসংখ্যার বৃদ্ধির তারতম্য বজায় রেখে, বর্তমানে ৫০ লক্ষাধিক জনসংখ্যার মধ্যে ৫ লক্ষের অধিক মানুষ মৎস্যজীবী হিসেবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। সুন্দরবনের সেই সমাজ কাঠামোতে মৎস্যজীবীদের নিয়তি নির্ভর সমাজ-সংস্কৃতির বিবর্তনের যে চিত্র তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে যে বিরামহীন লড়াই করে তারা বেঁচে থাকে তা লোকানুষ্ঠান ও লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন দেব-দেবী, তাদের ব্রতকথা, নিয়তি নির্ভর এই সুন্দরবনে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ে গুনিনের মন্ত্র মৎস্যজীবীদের কিভাবে বাঁচিয়ে রাখে সে সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও মৎস্যজীবীদের অবস্থান**। এই অধ্যায়ে ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কালে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারি প্রকল্পের বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ (Sundarban Development Board) গঠনের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য সরকারি পরিকল্পনা কার্যকরী হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করে কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ ও মৎস্য খামার তৈরি, সামাজিক বনায়ন, রাস্তার বাঁধ, কালভার্ট, ব্রিজ এবং জেটি প্রভৃতি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য। ১৯৭৮-৭৯ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গ্রামীণ শিল্পের উন্নতির জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। সুন্দরবনের বিস্তৃত এলাকার নদী, খাল, খাঁড়ি, জলাশয়, মোহনার মৎস্য সম্পদের অভাবনীয় উপস্থিতি মৎস্যজীবীদের জীবিকা নির্বাহের প্রধান নিয়ন্ত্রক। ১৯৮১-৮২ সালে IFAD (International Fund for Agricultural Development) প্রকল্পের অধীনে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় চিংড়ি, লোনা জলের মাছ চাষের খামার তৈরির বিষয়ে সহযোগিতা করে। এই ভাবে সুন্দরবনে মাছ ধরা ও মাছ চাষের গুরুত্ব বাড়তে শুরু

করেছিল। সুন্দরবনের এই মৎস্যজীবী প্রান্তিক মানুষেরা বহু প্রতিকূলতা ও শারীরিক কষ্ট স্বীকার করে মৎস্য প্রিয় মানুষের মুখে এই পুষ্টিকর খাদ্য তুলে দিচ্ছে, যাদের নিজেদের পুষ্টি পরিপূর্ণ হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প যেমন— মৎস্য চাষের ঋণ দান, চারাপোনা বিতরণ, মৎস্যজীবীদের গৃহনির্মাণ, মাছ চাষের পদ্ধতি সংক্রান্ত শিক্ষাদান, বার্ধক্যভাতা প্রকল্প, মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্প, মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা ও মাছ চাষের সরঞ্জাম বিতরণ প্রভৃতি উন্নয়ন মূলক প্রকল্পগুলি বর্তমান সময়ে মৎস্যজীবীদের জীবিকার উন্নয়নে যে গতিময়তা এনেছে তা এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া RKVY (Rashtriya Krishi Vikash Yojana), NFDB (National Fisheries Development Board), FFDA (Fish Farmers Development Agency) এবং STCP (Short-Term Cost Plan) প্রভৃতি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলির ইতিবাচক পরিকল্পনা মিষ্টি জলে মাছ চাষ ও নোনা জলে মাছ প্রকল্প এনে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন সাধিত করেছে তা আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবন চিত্র**। উক্ত অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক রূপরেখা। এপ্রসঙ্গে তাদের দৈনন্দিন জীবনের কঠোর সংগ্রাম ও মৎস্য ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আড়তদার-দাদনদার প্রমুখের দ্বারা সৃষ্ট শোষণ-নিপীড়ন ও তাদের সামাজিক অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরা হয়েছে। মৎস্য মূলত একটি অর্থকরী পেশা হলেও সুন্দরবনের দরিদ্র মৎস্যজীবীরা এখান থেকে খুব একটা লাভবান হয় না, তাসত্ত্বেও সুন্দরবনের জঙ্গলে, নদী-খাঁড়ি ও সমুদ্রে গিয়ে চরম প্রতিকূলতাকে সঙ্গী করে মৎস্য শিকার করতে যেতে হয় সেই প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে। শুকনো মাছের ব্যবসাকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপে সৃষ্ট জটিলতা মৎস্যজীবীদের

জীবিকার প্রতি যে আঘাত এনেছিল সেই সম্পর্কেও এখানে আলোকপাত করা হয়েছে। তাছাড়া মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য কাঁকড়া ধরে, জঙ্গলের থেকে কাঠ-মধু সংগ্রহ করে কিভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে সেই প্রসঙ্গ এখানে আলোচিত হয়েছে। ১৯৮০র দশক থেকে সুন্দরবনে ফিশারির রমরমা চলে। যেখানে বাগদার চিংড়ির গুরুত্ব খুব বেশি। বাগদার মীন সংগ্রহ করে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবিকার একটা দিক উন্মোচিত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গও এখানে আলোচিত হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছে **সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় ও মৎস্যজীবীদের বিপন্নতা**। এই অধ্যায়ে সুন্দরবনের পরিবেশ সংক্রান্ত ভারসাম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। ঔপনিবেশিক পর্ব থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর পর্বেও সুন্দরবন সংস্কার করে মনুষ্য বসতি গড়ে তোলা হয়েছে। বর্তমানে নতুন করে বসতি নির্মাণ নয়, বিঘার পর বিঘা সুন্দরবনের জঙ্গল পরিষ্কার করে মাছের ভেড়ি তৈরি চলছে। এর ফলে সুন্দরবনের ভূমিক্ষয়ের পরিমাণ যেমন বেড়েছে অন্যদিকে বন কাটার ফলে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিপর্যস্ত হচ্ছে সেই বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের রক্ষায় বনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বন না থাকলে সমুদ্র ক্রমশ গ্রাস করে নেবে সুন্দরবনের ভূমিকে। ঔপনিবেশিক আমলে বন আইন তৈরি করে যেমন অরণ্য রক্ষার কথা ভাবা হয়েছিল, স্বাধীনোত্তর পর্বেও বিভিন্ন আইনের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের প্রকৃতিকে রক্ষার প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বনসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের জন্য সবার সহযোগিতার গড়ে ওঠেনি। নির্বিচারে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের ধ্বংস সাধিত হচ্ছে এই বিপন্নতা যেমন আলোচিত হয়েছে, অন্যদিকে সারা বিশ্ব আজ উষ্ণায়নের দহনে জ্বলছে, যার থেকে সুন্দরবনের রেহাই নেই। মাত্রাতিরিক্ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে সুন্দরবন বিপন্নতার সম্মুখীন

হয়েছে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সুন্দরবনের ৮০ শতাংশ মানুষ কৃষিজীবী হলেও নদীর মৎস্য ধরে জীবিকা নির্বাহ করে ৫ লক্ষের অধিক মানুষ। কিন্তু বর্তমানে সুন্দরবনের এই বিপন্নতায় মৎস্যজীবীদের জীবিকাই আজ বিপন্ন হতে বসেছে। মৎস্যজীবীদের কাছে বিকল্প কোন পেশা নেই যার মাধ্যমে তারা তাদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। তাছাড়া মাছের ওপর সরকারের বিভিন্ন আইন, জঙ্গলে প্রবেশের জন্য বনদপ্তরের নিয়মনীতি মৎস্যজীবীদেরকে অর্থনৈতিক উদ্বাস্তুতে পরিণত করেছে সে বিষয়ও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

গবেষণা সন্দর্ভের উপসংহার পর্বে আলোচিত হয়েছে **আশা-নিরাশার দোলাচলে মৎস্যজীবীরা**। এই পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন-সংগ্রামের পাশাপাশি তাদের দুর্দশার চিত্র আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে প্রতিনিয়ত আর্থিক সুখানুভূতির অর্জনের যে প্রচেষ্টা তা এখানে আলোচিত হয়েছে।

গবেষণা কর্মের পদ্ধতি

আমার গবেষণার কাজের জন্য আকর তথ্য উপাদান হিসাবে রয়েছে লেখ্যাগারে সঞ্চিত মৎস্যজীবীদের নিয়ে লিখিত দলিল-দস্তাবেজ ও পর্যবেক্ষণ রিপোর্ট এবং মৎস্যজীবীদের নিয়ে লেখা সাহিত্যিক বিবরণ ও ঐতিহাসিক বিবরণ। সহায়ক উপাদান হিসাবে রয়েছে মৎস্যজীবী সম্পর্কিত নানা গ্রন্থ, পত্রপত্রিকা ও জার্নাল। এক্ষেত্রে পরিসংখ্যান ও গুণগত উভয় ধরণের তথ্য ব্যবহার করেছি। এর সঙ্গে যুক্ত করা সংগত হবে অধুনা গৃহীত উপাদান হিসাবে Oral Evidence বা মৌখিক ভাষ্য। আমার গবেষণার কাজের সহায়তায় ইতিহাসের পাশাপাশি, সমাজতাত্ত্বিক ও পরিবেশগত বিষয় গুলি সংযুক্ত করা হয়েছে। গবেষণা কাজের সুবিধার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগার (অ্যানেক্স বিল্ডিং), ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট লাইব্রেরী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের

ইতিহাস বিভাগের গ্রন্থাগার ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, লিটল ম্যাগাজিন গ্রন্থাগার, ক্যানিং বসন্ত সেন গ্রন্থাগার, বারুইপুর গ্রন্থাগার, মহাকরণ লাইব্রেরী থেকে প্রাপ্ত প্রয়োজনীয় তথ্য ব্যবহার করেছি। গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য মুখ্য উপাদান হিসেবে সুন্দরবন সম্পর্কিত বিভিন্ন দপ্তর পরিদর্শন করে তথ্য সংগ্রহ করেছি, যেমন— রাজ্য মহাফেজখানা, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, ফিশারি দপ্তর (সল্টলেক), মীন ভবন (বারাসাত), সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর (ডায়মন্ড হারবার), পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য দপ্তর (পাথরপ্রতিমা), ব্লক উন্নয়ন দপ্তর (পাথরপ্রতিমা), ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট দপ্তর (কাকদ্বীপ), ব্লক উন্নয়ন দপ্তর (কাকদ্বীপ) প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের মাধ্যমে গবেষণার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছি। এছাড়া সুন্দরবনের ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার মৎস্যজীবী, মধু-কাঠ সংগ্রহকারী, সরকারি আধিকারিক প্রমুখ ব্যক্তিদের সাথে আলাপচারিতার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে গবেষণার কাজ করার চেষ্টা করেছি। সুন্দরবনের প্রান্তিক এই মৎস্যজীবীদের ইতিহাস জানার জন্য উপাদান হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা, মুখের কথায় ইতিহাস প্রভৃতির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। একথা অনস্বীকার্য যে, সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সম্পর্কিত ইতিহাস পাওয়া দুর্লভ, তাসত্ত্বেও বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে গবেষণার তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছি।

আমি নিজেই এই অঞ্চলে বসবাস করি, বঙ্গোপসাগর ও কার্জনক্রীক নদী-মোহনার তীরে অবস্থিত উপকূলবর্তী জি-প্লটে বড় হয়েছি, ছোট থেকে নদীতে মীন-কাঁকড়া ধরেছি, বন্ধুদের সঙ্গে ডিঙি নৌকাতে করে মাছ ধরেছি। তাই মৎস্যজীবীদের মাছ ধরা, তাদের জীবন-যাপন, সংস্কৃতি ও সমস্ত রকমের আনন্দ বেদনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম। তাই আমার গবেষণায় মৎস্যজীবীদের জীবন কিভাবে আরও গতিময় হয়ে উঠতে পারে সেই পথের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা

করেছি। কিছু প্রথাগত ও প্রচলিত রীতিনীতি, মৌখিক ভাষ্য ও যৎসামান্য লিখিত উপাদান সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষদের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে মূল হাতিয়ার। আশা করি, নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রান্তিক এই মৎস্যজীবী মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই গবেষণাপত্রটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে সহায়ক তথ্য রূপে বিবেচিত হবে।

সূত্রনির্দেশ

১। S. C. Agarwal, History of Indian fishery (Delhi: Daya Publishing House, 2006), P-1. এই বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য– www.bn.wikipedia.org/Wiki/ডেভোনিয়ান

২। ডঃ দেবজ্যোতি চক্রবর্তী, আমাদের দেশীয় মাছগুলি অবলুপ্তির পথে, সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৩ শে জানুয়ারি, ২০১০, পৃ-৪৬।

৩। ডঃ মধুমিতা মুখার্জী, সুন্দরবন ও কালোসোনা কাঁকড়ার চাষ- প্রসঙ্গেঃ মাছ, মাছমারা আধুনিক মাছ চাষ, মৎস্য, জলজপ্রাণী বিকাশ, জলসম্পদ ও মৎস্যবন্দর দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বেনফিস, ২০০৬, পৃ-৬।

৪। S. C. Agarwal, History of Indian fishery, (Delhi: Daya Publishing House, 2006), P-1.

৫। Khurshed Hasan Shaikh and Syed M. Ashfaque, Moenjodaro: A 5000 year old legacy, 1981, UNESCO, 7 Place de Fontenoy, 75700, Paris, Pp-37-38.

৬। নিরঞ্জন জলদাস, কাকদ্বীপের মৎস্য অর্থনীতি ও বাস্তুতন্ত্র (১৯০০-২০০০), অপ্রকাশিত এম.ফিল. থিসিস, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১, পৃপৃ-১-২।

৭। K. C. Saha, Fisheries of West Bengal, (Calcutta: West Bengal Government Press, 1970), P-101.

৮। Ibid, P-101.

৯। Madhumita Mukherjee, Fishers, Fishery and Gear in Sunderban Wetlands, Dr. Madhumita Mukherjee (Ed.), Sunderban Wetlands, Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours, Government of West Bengal, 2007, P-116.

১০। ডঃ মধুমিতা মুখার্জী, সুন্দরবন ও কালোসোনা কাঁকড়ার চাষ- প্রসঙ্গেঃ মাছ, মাছমারা আধুনিক মাছ চাষ, মৎস্য, জলজপ্রাণী বিকাশ, জলসম্পদ ও মৎস্যবন্দর দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং বেনফিস, ২০০৬, পৃ-৯।

১১। তদেব, পৃ-৬।

১২। www.en.wikipedia.org/Wiki/Fishing_in_India

১৩। ডঃ দেবনারায়ন সরকার, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে পশ্চিমবঙ্গ প্রায় শীর্ষে, দৈনিক স্টেটসম্যান, ১৯ শে ডিসেম্বর, ২০১৭।

১৪। www.en.wikipedia.org/Wiki/Fishing_in_India

১৫। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব পরিমণ্ডল (কলকাতা: আনন্দ, ২০১২), পৃ-১৫।

১৬। Frederick Eden Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, Vol-I, From 1765 to 1870, (Kolkata: West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, 2002), P-1.

১৭। এ এফ এম আব্দুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস (কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০), পৃ-১১।

১৮। BIVARIJ, History of Baker-Gange (Dacca: Dacca University, 1882), P-10.

১৯। মোঃ মোশারফ হোসেন, সুন্দরবন বৈচিত্র্যের ওপর নাম (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৯), পৃ-১৭।

২০। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (একখন্ডে) (গড়িয়া: মাস এন্টার্টেন্মেন্ট্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০), পৃ-৬৮৩।

২১। স্বপন কুমার মণ্ডল, আঠারোভাটির আদিকথা (কলকাতা: অনন্যা, ২০২১), পৃ-২৩।

২২। শশাঙ্ক মণ্ডল, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন (কলকাতা: পুনশ্চ, ২০১৭), পৃ-১০।

২৩। L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers 24 Parganas, (Calcutta: West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, 1998), P-57.

২৪। Madhumita Mukherjee, The Sunderbans: An Introduction to one of the World's Largest Mangroves, Dr. Madhumita Mukherjee (Ed.), Sunderban Wetlands, Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours, Government of West Bengal, 2007, P-19.

২৫। W W Hunter, A Statistical Account of Bengal- Districts of the 24 Parganas and Sundarbans, vol-I (London: Trubner & Co, 1875).

২৬। L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers 24 Parganas, (Calcutta: West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, 1998).

২৭। K G Gupta, Reports on the Results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into the Fishery Matters in Europe and America, Calcutta, 1908.

২৮। B Hamilton, An Account of the Fishes found in the River Ganges and its Branches, Edianburgh, 1822.

২৯। T C Das, The Cultural Significane of Fish in Bengal, Man in India, Vol-11, 12, Ranchi 1931, 1932.

৩০। Dr. Sundarlal Hora, Ancient Hindu Conception of Correlations between form and Locomotion of Fishes, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 3rd Series, Vol-I, 1935.

...............Knowledge of the Ancient Hindus Concerning Fish and fisheries of India, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Science, Vol-XIV, No-1, 1954.

..............Symposium of Hilsa and its Fisheries, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Science, Vol-XX, No-1, 1954.

৩১। K C Saha, Fisheries of West Bengal, (Calcutta: West Bengal Government Press, 1970).

৩২। Arne Martin Klausen, Kerala Fishermen and Indo-Norwegian Pilot Project, (Londown: allen and unwin, 1968).

৩৩। Rup Kumar Barman, Fisheries and Fishermen- A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal (Delhi: Abhijeet Publications, 2008).

৩৪। Bikash RayChaudhuri, The Moon and the Net: A Study of a Transient Community of Fishermen at Jambudwip (Calcutta: Anthropological Survey of India, 1980).

৩৫। Suman Kalyan Samanta, Continuity and Change of the Traditional Fishing Communities: A Study of Purba Medinipur Coast (New Delhi: Aayu Publications, 2022).

৩৬। S K Pramanik, Fishermen Community of Coastal Villages in West Bengal (Jaipur: Rawat Publications, 1993).

৩৭। Annu Jalais, Forests of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans (New Delhi: Routledge, 2010).

৩৮। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য (দক্ষিণ গড়িয়া: গ্রথন, ২০০৬)।

৩৯। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ (কলকাতা: রীসা রিডার্স সার্ভিস, ২০০৭)।

৪০। Sutapa Chatterjee Sarkar, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals (New Delhi: Orient BlackSwan, 2010).

৪১। সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খন্ড (কলিকাতা: চক্রবর্ত্তী চাটার্জি এন্ড কোং, ১৩২১)।

...............যশোর খুলনার ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড (কলিকাতা: দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৫)।

প্রথম অধ্যায়

সুন্দরবনের গঠন, ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও মৎস্যজীবীদের সমাজ-সংস্কৃতি

পৃথিবীর বৃহত্তম বাদাবন হল সুন্দরবন। বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত সুন্দরবন প্রশস্ত একটি বনভূমি। 'সুন্দরবন' এই শব্দবন্ধটির মধ্যে লুক্কায়িত রয়েছে ভয়ঙ্কর এক রহস্যময় ইঙ্গিত যা প্রকৃতিপ্রেমী মানুষদেরকে বারংবার টেনে নিয়ে যায় তার কাছে। সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষের কথা শুনলেই প্রতিটি মানুষের স্মৃতিতে জেগে ওঠে বাদাবনের অরণ্যসৌন্দর্যের হৃদয়গ্রাহী রূপ। সুন্দরবন প্রকৃতির দান। সময়ের হাত ধরে সৃষ্ট হওয়া এই ব-দ্বীপ গাঙ্গেয় বঙ্গোপসাগরের উপর যেন ভাসমান অবস্থাতে রয়েছে। অসংখ্য নদ-নদী, খাল-খাঁড়ি সহযোগে যুক্ত সুন্দরবন। সুন্দরবন সক্রিয় এক ব-দ্বীপ অঞ্চল। এ কারণেই সক্রিয় যে, সুন্দরবনের গঠন প্রক্রিয়া বর্তমান কাল পর্যন্তও হয়ে চলেছে। সুন্দরবন পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র নদীত্রয়ের অববাহিকার ব-দ্বীপ এলাকায় অবস্থিত। বিশ্বের প্রাকৃতিক বিস্ময়াবলির অন্যতম সুন্দরবন, পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, বরগুনা ও পটুয়াখালী জেলা এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কলকাতাসহ দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জুড়ে বিস্তৃতি ছিল। দেশ ভাগের সূত্রে ১৯৪৭ সালে সুন্দরবন দ্বিধাবিভক্ত হয়। সমগ্র সুন্দরবনের ১/৩ অংশ ভারতীয় সুন্দরবন, বাকি ২/৩ অংশ অর্থাৎ বেশিরভাগটাই পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের। লর্ড ক্লাইভের জমিদারির অধীনে থাকা ২৪ পরগণা থেকে একসময় কলকাতা বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রধান কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। সুন্দরবন জুড়ে থাকে ২৪ পরগণার মধ্যেই।

সুন্দরবন যেহেতু মোহনার ব-দ্বীপ অঞ্চলের শেষভাগ, এবং সম্পূর্ণ নদীর মাধ্যমে তার মানচিত্র নির্মিত হয়েছে, ফলে আমার গবেষণা কালপর্বের (১৯৪৭-২০২১) অনেক আগে থেকেই

এই অঞ্চলের ভৌগোলিক সীমানা বারেবারেই নির্দিষ্ট হয়েছে। এই অঞ্চলের ইতিহাস নিয়ে ব্রিটিশ প্রশাসক ও এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে প্রধান বিতর্ক হল এই যে সুন্দরবনের আদৌ কোন প্রাচীন ইতিহাস আছে কিনা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে নদী কেন্দ্রিক সুন্দরবনের পরিবেশে প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে মৎস্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক সময়ে ১৭৭০ সালে সুন্দরবন সংস্কার করতে যারা এসেছিল, তাদের কাছে কৃষিকাজের পূর্বে নদীর মৎস্যই খাদ্যের পাশাপাশি জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম হয়েছিল বলে আমার মনে হয়। সেই অর্থে, সুন্দরবনবাসীর কাছে মৎস্য সংগ্রহ হয়ে উঠেছিল গুরুত্বপূর্ণ পেশা। আমার গবেষণায় সেই জেলে-মৎস্যজীবীদের ইতিহাস চর্চার অধ্যয়ন গুরুত্ব লাভ করেছে।

সুন্দরবন আধুনিক কিন্তু নতুন নয়। সভ্যতার প্রাচীন সময়কাল থেকে সুন্দরবনের অস্তিত্বের ও মনুষ্য বসবাসের প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তা ধারাবাহিক ভাবে নয়। বিভিন্ন ঐতিহাসিক, গবেষক ও লেখক তাদের গবেষণায় ও লেখায় সেই তথ্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সুন্দরবনের ক্ষেত্রে আধুনিক সময়কাল বলতে ব্রিটিশ শাসনে নতুন করে সুন্দরবনকে জরিপ করে আবাদ ভূমির সম্প্রসারণ ঘটিয়ে মনুষ্য বসবাসের পরিস্থিতিকে বোঝানো হয়ে থাকে। সুন্দরবনকে আধুনিক ভাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করেন অর্থাৎ বর্তমানে সুন্দরবনে জনবসতির যে চিত্র আমারা দেখতে পাই, সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল ১৭৭০ সালে চব্বিশ পরগণার কোম্পানি নিযুক্ত কালেক্টর জেনারেল ক্লড রাসেলের হাত ধরে। একথা সত্য যে গভীর অরণ্যসমৃদ্ধ সুন্দরবনকে সংস্কার করে আবাদে পরিণত করা এবং সেখানে প্রজা বসিয়ে রাজস্ব আদায়ের মধ্য দিয়ে লাভবান হওয়া খুব সহজ কাজ ছিলনা। এই পথকে আরও সহজতর করেছিলেন যশোরের তৎকালীন জেলাশাসক এবং ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল (Tilman Henckell)। তিনি ১৭৮৩ সালে বড়লাট ওয়ারেন

হেস্টিংসের কাছ থেকে সুন্দরবনের কিছু এলাকার জঙ্গল সংস্কার করার অধ্যাদেশ লাভ করেন। সেই সুপারিশের ভিত্তিতে টিলম্যান হেঙ্কেল ১৭৮৩ থেকে ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত হরিণঘাটা ও রায়মঙ্গল নদীর মধ্যবর্তী স্থানে ৬৪,৯২৮ বিঘা জমিতে ১৪৪ টি রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত অনুমোদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই অঞ্চল গুলি হেঙ্কেল তালুক নামে পরিচিত।[১]

টিলম্যান হেঙ্কেল যখন সুন্দরবন আবাদ শুরু করেন তার আগে থেকেই দেশিয় তালুকদারি জমিদাররা সুন্দরবনে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট রেখেছিলেন। কিছু মৌলিক চিন্তা ভাবনার দিক দিয়ে হেঙ্কেলের সঙ্গে স্থানীয় এই উচ্চ মানুষদের মানসিকতার পার্থক্য ছিল। গরিব মানুষদের দিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি তৈরির ভাবনা উভয়েরই ছিল ঠিকই। জনকল্যাণের মানসিকতায় হেঙ্কেল এদের থেকে অনেকটা ছিল অগ্রণী। “He was worshipped as a God by the swellers of Sundarbans.”[২] পারজিটারের (Frederick Eden Pargiter) দেওয়া তথ্যে সেই সত্যতার উল্লেখ রয়েছে। তাঁর বিবরণ অনুযায়ী হেঙ্কেলের পরিকল্পনাই ছিল “To lease out plots of land raiyats, and create a multitude of occupants. Each raiyats would clear his own ‘little spot’ and hold it directly under Government, free from the interference of zamindars, farmar, sazawal, or any one immediately invested with the management of the collections.”[৩] মিঃ ক্লড রাসেল নির্দিষ্ট কিছু শর্তের ভিত্তিতে ১৭৭০ থেকে ১৭৭৩ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সীমান্তবর্তী সুন্দরবনের ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। “With the object of reclaiming it, leases were granted by the Collector-General, Mr. Claude Russell, to individuals during the years 1770 to 1773 on certain conditions, of which the following were the most

important. The lands were to be held free of rent for seven years generally after which they were to be subject to a yearly progressive assessment up to the full rate of 12, 8 or 6 annas per bigha, according to their quality, which was to be determined by a survey made on the expiration of the free period."[৪] ক্লড রাসেলের তত্ত্বাবধানে বন্দোবস্ত গ্রহণকারী জমিদার বা তালুকদাররা যে মহলগুলি আবাদ করেছিলেন সেগুলি আসলে 'পতিতাবাদী তালুক'[৫] নামে পরিচিত। "Patitabad means the cultivation of waste or fallow land."[৬] ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে চব্বিশ পরগণার কালেক্টর রেভেনিউ বোর্ডের কাছে পাঠানো তথ্যে ১২২ টি পতিতাবাদি মহলের উল্লেখ করেছেন।[৭] এই পতিতাবাদি মহলগুলি ঔপনিবেশিক আমলে সুন্দরবনে আবাদ পত্তনের প্রথম পর্যায় ছিল বলে মনে হয়।

সুন্দরবন কমিশনার পারজিটারের (Frederick Eden Pargiter) দেওয়া তথ্যের বিবরণ অনুযায়ী "The patitabadi mahalls extended from the Salt Water Lake along the edge of the Sundarban jungle to the south-west corner of the district below culpi."[৮] উল্লেখযোগ্য পতিতাবাদি মহলগুলি হল- শোভানগর, হরিমাল, গঙ্গাধরপুর, বেলপুকুরিয়া, লক্ষ্মীপাশা, রামতনুপুর, লক্ষ্মীপুর, রামচন্দ্রপুর, শিবপুর, ভৈরবনগর, খুদাদাদপুর, শ্যামনগর, গোবিন্দপুর, রাধাকান্তপুর, রামলোচনপুর, রাঙাফুলা, ধানখোলা, কাশিনগর, শ্যামনগর, কেষ্টরামপুর প্রভৃতি।[৯] সুন্দরবন কমিশনার ডেল (Mr. Dale) এবং সার্ভেয়ার প্রিন্সেপ (Mr. Prinsep) ১৮২২-২৩ সাল নাগাদ যে প্রতিবেদন সরকারকে দিয়েছিল সেখানেও বেশ কিছু পতিতাবাদি তালুকের উল্লেখ ছিল। উল্লেখযোগ্য তালুকগুলি হল— অরুননগর, ফিঙ্গা, টোনা, দুসরা, ভগবানপুর, কেষ্টপুর,

ঘোলা, শ্রীকৃষ্ণনগর, রামচন্দ্রনগর, শিমুলবেড়িয়া, বাঁটরা, লক্ষ্মীনারায়ণপুর, মশামারি, খড়মপাড়া, জলাসি, দুর্গানগর, তেঘরিয়া, পানকুয়া, শ্রীকৃষ্ণপুর, খড়ম্বা, সন্তোষপুর, চন্ডীবেড়িয়া, চাপান, বনহুগলি, গোপালপুর, মল্লিকপুর, ও ঈশ্বরপুর।[১০] ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালক সভা যখন লর্ড কর্নওয়ালিসকে ভারতবর্ষের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তখন ২৪ পরগণা তথা সুন্দরবনে সঠিক নীতি নির্ধারণে ও রাজস্ব ব্যপারে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণেও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। মূলত জমিদার ও তালুকদারদের স্বার্থই এই সমস্যার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই ব্যপারে কর্নওয়ালিসকে সহযোগিতা করেছিলেন টিলম্যান হেঙ্কেল, জন শোর ও জেমস গ্রান্ট।[১১] ১৭৯০ সালে কোম্পানি বাংলাতে দশশালা বন্দোবস্ত কার্যকরী করেছিল, কিন্তু জমিদারদের সঙ্গে সঠিক বোঝাপড়া হয় ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে। এই বন্দোবস্তের পরে লর্ড কর্নওয়ালিস উন্নয়নের স্বার্থে সুন্দরবনকে ২৪ পরগণার সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন। তবে নতুন করে কোনো বন্দোবস্ত প্রবর্তন করার আগে প্রয়োজন ছিল সুন্দরবনের সীমানা নির্ধারণের। ১৮১৭ সালে সুন্দরবনকে সরকারি সম্পত্তি বলে বিবেচিত করা হলে একটা বিশ্বাসযোগ্য সীমানার দরকার অনুভব করে কোম্পানি।

প্রাথমিক পর্যায়ে হেঙ্কেল সুন্দরবনের সীমানা তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। ১৭৮৬ সালে হেঙ্কেল রায়মঙ্গলের হেঙ্কেলগঞ্জ এলাকা থেকে সুন্দরবনের উত্তর দিকের সীমানা এঁকে ছিলেন বাখরগঞ্জের হরিণঘাটা নদী পর্যন্ত তাও আবার বাঁশ দিয়ে।[১২] এই কাজে সমস্যা তৈরি হওয়ায় দেশিয় আমিনদের দিয়ে সুন্দরবনকে পুনরায় জরিপ করা হয়। ১৮১০ সালে ক্যাপ্টেন রবার্টসন (Captain Robertson) হুগলী থেকে নোয়াখালী পর্যন্ত জরিপ করেন। ১৮১৩-১৪ সালে হুগলী পূর্বের সমুদ্র উপকূলের একটি অংশ লেফটেন্যান্ট ব্লেন (Lieutenant Blane) দ্বারা জরিপ করা

হয়েছিল।[১৩] ১৮১১-১৪ পর্যন্ত সময়কালে সার্ভেয়ার লেফটেন্যান্ট মরিসন (Lieutenant W. E. Morrieson) হুগলী থেকে পশর নদী পর্যন্ত সুন্দরবন এলাকার অসমাপ্ত একটা সার্ভে করেন। ১৮১৮ সালে তাঁর ভাই হগ মরিসন (Captain Hugh Morrieson) এই অসমাপ্ত জরিপের দায়িত্ব নিয়ে তা সম্পূর্ণ করেন।[১৪] তাতেও সমস্যার সমাধান হয়ে ওঠেনি। কেননা মরিসন-ভাইদের সার্ভেতে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি সরকার। পরে এই কাজে সুচারু শিল্পী রূপে দায়িত্বভার গ্রহন করেন সার্ভেয়ার এনসাইন প্রিন্সেপ (Ensign Prinsep)। কথিত আছে মরিসন ভাইদের সার্ভে কাগজ হাতে নিয়ে টানা দুই বছর সুন্দরবনের নদী ও খাঁড়িতে ঘুরে ঘুরে যমুনা নদী থেকে পিয়ালী নদী পর্যন্ত ১৮০ মাইল এলাকার সীমানা নির্ধারণের কাজটি করেন।[১৫] এক্ষেত্রেও নানা বাধা বিপত্তি সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮২৮ সালের জানুয়ারি মাসে সুন্দরবন সার্ভেয়ার হয়ে আসেন লেফটেন্যান্ট আলেকজান্ডার হজেস। মিস্টার ড্যাম্পিয়ারকে নিয়োগ করা হয়েছিল সুন্দরবনের কমিশনার হিসাবে। কমিশনার ড্যাম্পিয়ারের সহযোগিতায় আলেকজান্ডার হজেস হুগলী নদী থেকে মেঘনা নদী পর্যন্ত সঠিক ভাবে সুন্দরবনের সীমানা চিহ্নিত ও নির্ধারণের কাজটি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১৬] সুন্দরবনের এই সীমারেখা কমিশনার ড্যাম্পিয়ার ও আলেকজান্ডার হজেসের নামেই ড্যাম্পিয়ার-হজেস লাইন নামেই পরিচিত হয়। এই রেখার উত্তরে থাকল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি এলাকা ও দক্ষিণে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অনাবাদি জনবসতিহীন সুন্দরবন।[১৭] বর্তমান উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত সুন্দরবন এলাকার ১৯ টি ব্লকের মধ্যে উল্লিখিত মহল বা তালুকগুলির বেশিরভাগ অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

ক্লড রাসেলের সময় সুন্দরবন চব্বিশ পরগণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সুন্দরবন তখন মালিকানাহীন ভূমি হিসাবে বিরাজ করতো। ১৭৫৭ সালের ২০ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত চব্বিশ

পরগণা নামে কোন জেলার অস্তিত্ব ছিল না বাংলায়। এই জেলাগুলি তখন বর্ধমানের মহারাজ কীর্তিচন্দ্র, হুগলীর ফৌজদার এবং লক্ষ্মীকান্ত মজুমদারের বংশধর সাবর্ণগোত্রীয় শিবদেব রায় বা সন্তোষ রায়ের অধীনে ছিল।[১৮] "২৪ পরগণা তৈরি হওয়ার আগে এই অঞ্চল মধ্যযুগে একটি বিশেষ সরকারি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেন আমলে বাংলায় ৫টি বিভাগ ছিল- রাঢ়, বাগড়ি, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা। বঙ্গের আবার তিনটি ভাগ ছিল- লক্ষ্ণৌতি, সাতগাঁ, সোনারগাঁ। বাংলায় প্রথম জরিপ ১৫৮২ সালে আকবর ও আকবরের অর্থসচিব টোডরমলের আমলে। এই জরিপে বাংলাকে উনিশটি রাজস্ব অঞ্চল বা সরকারে এবং ৫৩টি মহলে ভাগ করা হয়। এরমধ্যে একটি বিভাগ ছিল সরকার সাতগাঁ বা সপ্তগ্রাম সরকার। এর সীমা উত্তরে পলাশি থেকে দক্ষিণে সাগরদ্বীপের হাতিয়াগড় এবং পূর্বে কপোতাক্ষ থেকে পশ্চিমে হুগলী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ২৪ পরগণা ছিল এই সাতগাঁ সরকারের একটি অংশ। ১৭২২ সালে মুর্শিদকুলি খাঁর সময়ে মুঘল আমলের শেষ জরিপে ঐ পরগণা গুলিকে চাকলা হুগলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।"[১৯] মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় কোম্পানীর পক্ষে রবার্ট ক্লাইভ প্রভূত অর্থের পাশাপাশি চব্বিশ পরগণার জমিদারি উপহার পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ক্লাইভ তাঁর পছন্দ মত পরগণাগুলি দাবি করেছিলেন। মীরজাফর কলকাতাসহ পার্শ্ববর্তী দক্ষিণ দিকে কুলপি পর্যন্ত ২৪ টি পরগণা ক্লাইভকে প্রদান করেছিলেন। সেই এলাকা গুলো তখন হুগলীর ফৌজদার মির্জা মহম্মদ সালাউদ্দিনের জায়গিরদারের অধীনে ছিল। মীরজাফরের থেকে প্রাপ্ত ক্লাইভের মালিকানায় চব্বিশ পরগণার আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গ মাইল।[২০] ১৭৭৪ সালে লর্ড ক্লাইভ মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পরে ২৪ পরগণার ভূমি ও রাজস্ব ব্যবস্থায় কোম্পানি শাসনের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।[২১]

মীরজাফর যে চব্বিশ পরগণা কোম্পানিকে দিয়েছিলেন সেখানে পূর্ণ পরগণার সংখ্যা ছিল "১২টি যাকে দেরুবস্ত বলা হত এবং আংশিক পরগণার সংখ্যা ছিল ১২টি যা কিসমত নামে পরিচিত ছিল। দেরুবস্ত বা পূর্ণ পরগণা গুলি ছিল- (১) মাগুরা, (২) খাসপুর, (৩) মেদিনীমল্ল, (৪) ইখতিয়ারপুর, (৫) বারিদহাটি, (৬) খাড়িজুড়ি, (৭) দক্ষিণ সাগর, (৮) মেলাঙমহল, (৯) মুড়াগাছা, (১০) পাঁচকুলি, (১১) হাতিয়াগড়, (১২) ময়দা। কিসমত বা আংশিক পরগনাগুলি ছিল- (১) গড়, (২) কলিকাতা, (৩) পাইকান, (৪) মানপুর, (৫) আমিরাবাদ, (৬) শাহনগর, (৭) শাহপুর, (৮) আমিরপুর, (৯) আজিমাবাদ, (১০) আকবরপুর, (১১) বালিয়া, (১২) বাসুন্দি বা বাসন্ধারি।"[২২] কলকাতাসহ বনগাঁ ও বসিরহাট থেকে কুলপি পর্যন্তও ছিল উল্লিখিত পরগণার বিস্তৃতি। ১৭৫৭ সালে চব্বিশটি পরগণার ভূখণ্ড ইংরেজ কোম্পানির জমিদারির আওতায় এলেও সুন্দরবনের কোন ভূমি তখনও পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল না। ইংরেজ রাজত্বের সময়কালেই যে কেবল সুন্দরবন সংস্কার করা হয়েছিল তা কিন্তু নয়। সুন্দরবন এলাকার ওপর স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, গাঁতিদার প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষের স্বার্থ জড়িত ছিল, চব্বিশ পরগণার স্থানীয় তালুকদার-লাটদার-জমিদার সরকারি সম্মতির প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করে জঙ্গল সংস্কারের মাধ্যমে তাদের জমিদারির বিস্তার ঘটিয়েছিল। সমগ্র সুন্দরবন এলাকার আবাদ সংস্কার করতে নদিয়ার নফরচন্দ্র পালচৌধুরী (বাসন্তী এবং নফরগঞ্জ এলাকা) ও ঈশ্বরচন্দ্র পালচৌধুরী (উত্তর ২৪ পরগণা, সন্দেশখালি ও হিঙ্গলগঞ্জ), টাকির কালীনাথ রায়চৌধুরী (কালিয়াগঞ্জ, টাকি ও পাথরপ্রতিমার জিপ্লট দ্বীপের কিছু অংশ), খুলনার হরিচরণ চৌধুরী (বুড়ি গোয়ালিনী, সাহেবখালি), কলকাতার মহেশচন্দ্র রায়চৌধুরী (বাসন্তী ও মহেশপুর এলাকা), বরদাপ্রসাদ রায়চৌধুরী (মথুরাপুর ও বরদাপুর), রমাপতি মুখার্জী (কুলতলি এলাকা), উত্তরপাড়ার প্যারিমোহন মুখার্জী (সাগরদ্বীপের

কচুবেড়িয়া ও ঘোড়ামারা এলাকা), কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (নামখানা এলাকা)[২৩] প্রমুখ লাটদারদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বা ক্লাইভ এই বে-আইনিভাবে বিস্তার করা চব্বিশ পরগণার আবাদভূমিকে সরকারের প্রচেষ্টায় জমিদারির অধীনে আনতে পারেননি। ১৭৭০ সালে ক্লড রাসেল কোম্পানির কালেক্টর পদে আসীন হওয়ার পর তিনি নিজ উদ্যোগে এই বেআইনি আবাদকে আইনসম্মত করার প্রচেষ্টা শুরু করেছিলেন। স্থানীয় বা আঞ্চলিক তালুকদারদের এই ম্যানগ্রোভ আচ্ছাদিত আবাদকে বন্দোবস্ত দেওয়ার কাজ শুরু হল। ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দের ২১ শে আগস্ট রেগুলেশন III আইন পাশ হলে সুন্দরবন সরাসরি ভাবে সরকারের সম্পত্তি বলে চিহ্নিত হয়।[২৪] এবং ১৮২৮ সালেই হজেস সুন্দরবনের সীমানা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে ইতি টানলে তারপর থেকেই সুন্দরবনের বিস্তৃতির প্রসঙ্গেও স্থির সিদ্ধান্ত নিতে সরকারের সুবিধা হয়েছিল। সুন্দরবন জরিপ ও সীমানা নির্ধারণের পাশাপাশি জঙ্গল হাসিলের কাজও সহজ হয়ে উঠেছিল।

পতিতাবাদি মহল এবং কাটকিনা তালুক, যা সুন্দরবনকে আবাদিভূমিতে পরিণত হতে সাহায্য করেছিল, এই মহল গুলিই ছিল সুন্দরবন গঠনের প্রাথমিক ধাপ। আবাদ বিস্তারের ইতিহাস মূলত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৭৭০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত ক্লড রাসেল ও হেঙ্কেলের প্রচেষ্টায় সুন্দরবন সরকারি অধীনে আসে। দ্বিতীয় ধাপে ১৮৩০ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় অর্থবান মানুষেরা সুন্দরবনে লাটদারি ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। তৃতীয় ধাপে অর্থাৎ ১৯১৯ সালের কিছু আগে শুরু হয়ে ছিল। এই সময়কাল থেকে শুরু হয়েছিল রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত। এই বন্দোবস্তের মাধ্যমে সরাসরি প্রজাদের সঙ্গে চুক্তি করা হয়।[২৫] সুন্দরবন সংস্কারের এই কাজের মধ্যমে কোম্পানির সরকার এখান থেকে রাজস্ব ব্যাপারে সুনিশ্চিত

হয়েছিল। সুন্দরবনকে আবাদে রূপান্তরের কাজ খুব সহজ ছিল না। বঙ্গোপসাগরের নিকটবর্তী ২৪ পরগণা, যশোর ও বাখরগঞ্জের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত বনভূমির জন্য এই সত্য অপরিবর্তনীয়। 'ড্যাম্পিয়ার-হজেস লাইন' সুন্দরবনের জন্য সীমানা নির্ধারণের কাজটি সম্পূর্ণ করে। হজেস এই অঞ্চলকে হুগলী থেকে পশরনদী পর্যন্ত পশ্চিম থেকে পূর্বে ১ থেকে ২৩৬টি লটে পর্যায়ক্রমিকভাবে চিহ্নিত করেন। এই ২৩৬টি লটে মোট জমির পরিমাপ ছিল ১,৭০২,৪২০ একর বা ২,৬৬০ বর্গ মাইল।[২৬]

দেশ বিভাগের সঙ্গে এই লট সংখ্যার পরিমাণ কমে আসে। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা মিলে লটের সংখ্যা ছিল ১৬৩টি মতান্তরে ১৬৭টি। ২৪ পরগণাতে লট গণনার পর্ব শুরু হয়েছিল কাকদ্বীপ থানার উত্তর দিকের এলাকা চন্দ্রনগর থেকে, ১ থেকে ১৫ পর্যন্ত লট এবং ১১০ নং লটের অবস্থান ছিল এই কাকদ্বীপ এলাকার মধ্যে। বাকি অন্যান্য সংখ্যার লটগুলি গোসাবা, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, কুলতলি এলাকা গুলিকে কেন্দ্র করে বিস্তার লাভ করে। নেতিধোপানি, আড়বেশি ও পীরখালি এবং ঝিলা এলাকা গুলিতে আবাদ করার কাজ হয়নি।[২৭] বেশ কিছু এলাকা, যেমন- সাগরদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, ফ্রেজারগঞ্জ, মৌসুনি, হ্যালিডে ও ডালহৌসি দ্বীপ আবার লট-চিহ্নিত করণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সমুদ্রের দিকের অংশ হিসাবে পাথরপ্রতিমা চিহ্নিত হয়। মিস্টার স্মিথ ও উমাকান্ত সেন নামক এক বাঙালি সার্ভেয়ার ১৮৫০ থেকে ১৮৫৩ সালের মধ্যে ২৪ পরগণার বেশ কিছু এলাকা ও তারসঙ্গে পাথরপ্রতিমা এলাকার বেশ কিছু জঙ্গলে এলাকা পরিমাপ করেন এবং সমুদ্রের দিকে বিস্তৃত দ্বীপ গুলিকে A থেকে L পর্যন্ত ১২টি প্লটে নাম নথিভুক্ত করেন।[২৮] প্লট গুলির বিস্তৃতি এভাবেই- "A-Plot- নামখানা-হাতানিয়া-দোয়ানিয়ার পরের অংশ, B-Plot- মদনগঞ্জ, শিবনগর এলাকা, C-Plot- মৌসুনি-

রাধানগর, D-Plot- ফ্রেজারগঞ্জ-বকখালি-নারায়ণীতলা, E-Plot- পাথরপ্রতিমা অঞ্চল, F-Plot- ব্রজবল্লভপুর অঞ্চল, G-Plot- জিপ্লট- সুরেন্দ্রগঞ্জ, বুড়াবুড়ির তট অঞ্চল, H-Plot- বনশ্যামনগর অঞ্চল, I-Plot- অচিন্ত্যনগর-লক্ষ্মীজনার্দনপুর অঞ্চল, J-Plot- হেরম্বগোপালপুর অঞ্চল, K-Plot- পূর্ব ও পশ্চিম শ্রীপতিনগর অঞ্চল, L-Plot- শ্রীধরনগর অঞ্চল।”[২৯]

প্রথমেই আলোচিত হয়েছে যে ২৪ পরগণার তথা সুন্দরবনকে বেশ কয়েটি ধাপেই সংস্কার করার মধ্যে দিয়ে গঠন প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ঔপনিবেশিক আমলে শুরু হলেও বর্তমান সময় পর্যন্ত এই সংস্কার কাজ হয়ে চলেছে। ১৭৬৫ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত দু’দফায় হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, ভাঙড়, কুলপি, মিনাখাঁ, ক্যানিং, জয়নগর, মথুরাপুর, এবং সাগর অঞ্চলে ব্যাপকহারে সুন্দরবনের বন হাসিল করা হয়। যদিও ১৮১২ সাল নাগাদ কোম্পানির এক সদস্য মিস্টার জোনস সাগরদ্বীপের ইজারা নেন ও আবাদ করার কাজ শুরু করেন। সাগরদ্বীপের উত্তর এলাকা এবং মাঝের এলাকার জঙ্গল সংস্কার করে সাগরদ্বীপের উন্নয়নের জন্য ‘সাগর আইল্যান্ড সোসাইটির’ জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৮৭৩ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্তও সুন্দরবনের সন্দেশখালি, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, বাসন্তী, কুলতলি, গোসাবা, ক্যানিং, মথুরাপুর ও সাগরদ্বীপের বাকি এলাকার জঙ্গল সংস্কারের কাজ চলেছিল।

১৯৩৯ সালে সুন্দরবন লোকালয় হিসাবে এবং সংরক্ষিত বন এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হলেও ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের বেশ কিছু এলাকা সংস্কার করা হয়। বিশেষ করে ১৯৬৩ সালে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য সুন্দরবনের হেড়োভাঙ্গা ও ঝড়খালি অঞ্চলের ৫০০০ একর বনাঞ্চল সংস্কার করা হয়েছিল। বাংলাদেশের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫০-১৯৭১ সাল পর্যন্ত হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, বাসন্তী, কুলতলি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, ও সাগরদ্বীপের কিছু কিছু স্থান

যেখানে বন অবশিষ্ট ছিল সেখানেও সংস্কারের কাজ অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। তাছাড়া ১৯৭৭-১৯78 সালে দণ্ডকারণ্য থেকে ফিরে আসা উদ্বাস্তুরা সুন্দরবনের মরিচঝাঁপি দ্বীপের আরাবাসি-২ এর ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকার সংরক্ষিত স্থানের বনাঞ্চল ধ্বংস করার চেষ্টা করে এবং বসতি স্থাপনের জন্য জোর করে কিছু বন কেটে ফেলে।[৩০] ড্যানিয়েল ম্যাকিনান হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবনের গোসাবা, সাতজেলিয়া ও রাঙাবেলিয়ার বন হাসিল করেন।[৩১] স্কটিশ ব্যবসায়ী পরিবারের সন্তান হ্যামিলটন সুন্দরবনের দারিদ্রপীড়িত মানুষদের সেবার উদ্দ্যেশে এখানে এসেছিলেন। ১৯০৩ সালে তিনি সুন্দরবনের ১৪৩ ও ১৪৯ নম্বর লটের ১ লক্ষ ৫২ হাজার বিঘের জঙ্গল ইজারা নেন। তিনি সমবায়ভিত্তিক লটদারি প্রতিষ্ঠার সংকল্প নিয়েই তাঁর জমিদারি ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন।[৩২] দক্ষিণ ২৪ পরগণা তথা সুন্দরবনকে আবাদে পরিণত করতে সরকার জমিদারি ও লটদারি ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জমিদারদের সঙ্গে ১৮৫৩ সালের আইন অনুযায়ী ৯৯ বছরের জন্য আবাদ বন্দোবস্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৯ সালে সরকার লার্জ ক্যাপিটালিস্ট রুল প্রণয়ন করে বন্দোবস্তের মেয়াদ ৪০ বছরে নামিয়ে আনেন। বড় পুঁজির ক্ষেত্রে পত্তনি পাওয়া যেত ২০০ থেকে ৫০০০ বিঘে পর্যন্ত। শর্ত ছিল ইজারার ১/৮ অংশ ৫ বছরের মধ্যে আবাদ করতে হবে, তা না হলে সরকার সেই এলাকা পুণরায় অধিগ্রহণ করে নিতে পারবে।[৩৩] এই পরিস্থিতিতে ১৯০৪-০৫ সালে বৃহৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বন্ধ রেখে ২৪ পরগণার কোন কোন এলাকায় সরকার পরীক্ষামূলকভাবে রায়তওয়ারি বন্দোবস্ত চালু করেন। এই ব্যবস্থাতে কৃষকদের সঙ্গে ১০ থেকে ৭৫ বিঘে পর্যন্তও জমির পরিমাণ ধার্য করে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। এই সময়ে সুন্দরবন কমিশনার স্যান্ডার এর সহযোগিতায় বন্দোবস্তের পাশাপাশি বন সংস্কার করে বাঁধ তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল।[৩৪]

প্রকৃত অর্থে ২৪ পরগণাসহ সুন্দরবনকে সংস্কার করে ভূমির ব্যাপক বিস্তারের মধ্য দিয়ে গঠনকাজ সম্পন্ন হয়েছিল দুইভাবে। (ক) মূল যে ভূখণ্ড তার সংস্কার করে। (খ) বাঁধ দিয়ে। সমুদ্রের গতিপথকে বাধা দিয়ে এই নির্মাণ রচনা করা হয়েছিল। ৩৫০০কিলোমিটার নদী বাঁধ সমগ্র সুন্দরবনের রক্ষাকবচ।[৩৫] সুন্দরবনকে ঘিরে থাকা এই দীর্ঘ বাঁধ সুন্দরবনে বসবাসকারী মানুষদেরকে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে তেমন সমুদ্রের গ্রাস থেকেও সুন্দরবনের মূল ভূখন্ডকে বাঁচায়। সুন্দরবনের এই দীর্ঘ গঠন প্রক্রিয়া প্রাকৃতিক ভাবে তো ছিলই, ১৭৭০ থেকে ঔপনিবেশিক সরকার তথা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রশাসনিক সুবিধার্থে ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে নিয়ে এসে চব্বিশ পরগণা তথা সুন্দরবন সংস্কারের কাজে নিযুক্ত করেন। ১৭৫৭ সালে মীরাজাফরের কাছ থেকে লর্ড ক্লাইভ যে ২৪ পরগণা পেয়েছিলেন সেই চব্বিশ পরগণা তার অতীত রূপ পরিবর্তন করে ১৯৮৬ সালের পরে বৃহত্তর একটা পৃথক জেলার মর্যাদা লাভ করে। ইংরেজ আমলেই চব্বিশটি পরগণার জমিদারি নিয়েই গঠিত হয়েছিল চব্বিশ পরগণা জেলা। চব্বিশ পরগণা তৎকালীন প্রেসিডেন্সী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট দেশ ভাগের সময়ে যশোহর জেলার বনগাঁ মহকুমা চলে আসে চব্বিশ পরগণার মধ্যে। বনগাঁ, বারাসাত মহকুমার অধীন ছিল ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ২৩শে ফেব্রুয়ারি গাইঘাটা ও বনগাঁ নিয়ে নতুন মহকুমার সৃষ্টি হয়। পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় এক বিশেষ অধিবেশনে ১৯৮০ সালে ৩০শে জুন চব্বিশ পরগণা জেলাকে ভেঙ্গে দ্বিখন্ডিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্য এর আগে বিধান চন্দ্র রায়ের আমলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা (সদর আলিপুর) এবং উত্তর চব্বিশ পরগণা (সদর বারাসাত) দুটি জেলা গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হলেও তা কার্যকরী হয়নি। কিন্তু অতিরিক্ত জেলা শাসক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপারিন্টেনডেন্ট, সেসান কোর্ট ও

বিভিন্ন সরকারি অফিসের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ১৯৮০ সালে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে উত্তরাংশের সদর হিসাবে বারাসাতকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বারাসাত, ব্যারাকপুর, বনগাঁ, বসিরহাট (গোসাবা বাদে) পড়ে উত্তরাংশে। আলিপুরের সঙ্গে ক্যানিং হয়ে গোসাবার যোগাযোগ পথ সহজ থাকায় দক্ষিণ ২৪ পরগণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার দুটি মহকুমা-আলিপুর ও ডায়মন্ড হারবার। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য দুটি ভাগে কাজ স্বতন্ত্র করে সদর আলিপুর থেকে সব কাজ করা হত। উত্তরাংশের সমৃদ্ধশালী উপনগরী ও দক্ষিণাংশে সুন্দরবনের বেশির ভাগ অঞ্চল। বজবজ থেকে বীজপুর পর্যন্ত চব্বিশ পরগণার বিস্তৃত শিল্পাঞ্চল। কমিশনের সুপারিশ কার্যকরী হয়েছিল ১লা মার্চ ১৯৮৬।[৩৬] উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার তুলনায় আয়তনে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা অনেক বড়। প্রশাসনিক কার্যাবলীর সুবিধার্থে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীসভায় ১৯৮০ সালে চব্বিশ পরগণার দ্বিখন্ডিকরণের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তার নিরিখে ১৯৮৬ সালের ১লা মার্চ চব্বিশ পরগণাকে সরকারি ভাবে দ্বিখণ্ডিত করে উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা নামে দুটি পৃথক জেলা তৈরি করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে দেশ ভাগের পর চব্বিশ পরগণার বন্টন নিয়ে 'লোকায়ত সুন্দরবন' খণ্ডে সুভাষ মিস্ত্রীর বক্তব্য- "কথিত আছে, সম্রাট সুলতান মামুদের উজির খাজা-ই-জাহান বা জাহান আলি দক্ষিণবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল তথা সুন্দরবন সংস্কার-উন্নয়নের সূচনা করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তপর্বে (১৭৯৩) ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন বহির্ভূত হুগলী শাসনাধীন চব্বিশ পরগণার আদিভূমি সুন্দরবনকে চব্বিশ পরগণাভুক্ত করা হয়। যদিও সুন্দরবন জরিপ, সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি কার্যাদি চলে ১৭৮৪-র ৭ ফেব্রুয়ারি যশোরের ম্যাজিস্ট্রেট টিলম্যান হেঙ্কেল সাহেবের দেওয়া প্রস্তাব মোতাবেক। সে সময় ১৪৪ জন দেশি-বিদেশী জমিদারদেরকে ঠিকা দেওয়া হয় ও

১৮১৬ সালে ৯ নম্বর রেগুলেশন অনুসারে সুন্দরবন প্রশাসনের ভার ন্যস্ত হয় একজন কমিশনারের উপর এবং ১৯০৫ সালে তা রদ হয়। বলা চলে, ১৮১৬ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত 'সুন্দরবন জেলা'র বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হবার সাথে সাথে সুন্দরবনকে যেভাবে খন্ডিত করা হয়, তার চেয়ে অধিকতর নিষ্ঠুরতা ও অবিমৃষ্যকারিতায় ১৯৮৬-র মার্চ সুন্দরবনকে জরাসন্ধবধের মত করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ভাগাভাগি করে দেওয়া হয়েছে।"[৩৭] দুই চব্বিশ পরগণার দক্ষিণাংশ হল ভারতীয় সুন্দরবন। পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম ব-দ্বীপ হিসেবে চিহ্নিত সুন্দরবন। অখণ্ড সুন্দরবনের গঠন কার্যকলাপ প্রশাসনিক ভাবে ১৯৪৭ সালে শেষ হলেও বিভক্ত ভারতীয় সুন্দরবনের সংস্কার ও গঠন কার্য ভৌগোলিক ভাবেও যেমন হচ্ছে তেমন স্বাধীনতা পরবর্তীকালীন সরকারি প্রচেষ্টাতেও সেই কার্য এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। জাতিসংঘের মানব পরিবেশ সম্মেলন ১৯৭২ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। উক্ত সম্মেলনে পরিবেশ সংক্রান্ত যে সচেতনতার নীতি উত্থিত হয়েছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের পর থেকে ভারতীয় সুন্দরবনকে সুরক্ষিত রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে। ১৯৭৩ সালে গড়ে ওঠে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, এছাড়া এই বছরেই গড়ে ওঠে সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প। এরপর থেকে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের হাত ধরেই সুন্দরবনকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে পাথরপ্রতিমার ভগবতপুরে গড়ে তোলা হয় সুন্দরবন কুমির প্রকল্প, তাছাড়া ঐ বছরেই সজনেখালি, লোথিয়ান ও হ্যালিডে দ্বীপকে সুন্দরনবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। এরপর ১৯৮৪ সালের ৪ঠা মে সুন্দরবনকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনকে ১৯৮৯ সালে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হিসাবে ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনকে নিয়ে

১৯৯৪ সালে পৃথক সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তর তৈরি হলে পূর্বে গঠিত হওয়া সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ মিলিত ভাবে আরও সংগঠিত হয়। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর সুন্দরবন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ২০০১ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনের এই বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার এর আওতায় নিয়ে আসে। ২০১৩ সালে সুন্দরবনকে পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্য বা West Sundarban Wildlife Sanctuary হিসেবে ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবনের এই সব সুরক্ষা সত্ত্বেও IUCN বা International Union for Conservation of Nature and Natural Resources এর রেড লিস্ট অফ ইকোসিস্টেম ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে ২০২০ সালের মূল্যায়নে ভারতীয় সুন্দরবনকে বিপন্ন বলে মনে করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ২০০৯ সালের আইলা, ২০১৯ সালে ফণী, বুলবুল, ২০২১ সালে আমফান ও ইয়াস প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের গঠনের দিক থেকে সেই বিপন্নতার সত্যতা তুলে ধরেছে।

সুন্দরবনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য

সুন্দরবন ভৌগোলিক কারণেই, প্রাচীন সমুদ্র সমতটের দক্ষিণাংশে পৃথিবীর বৃহত্তম ও বিস্ময়কর গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ এলাকায় গড়ে উঠেছে। বাংলা দেশের যে ত্রিকোণ ভূ-ভাগের পশ্চিমে ভাগীরথী ও উত্তর পূর্ব দিকে পদ্মা ও মেঘনা নদ এবং দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগরের সেই বিস্তীর্ণ ভূ-ভাগ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ নামেই পরিচিত।[৩৮] এই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের পশ্চিমাংশ ভারতীয় সুন্দরবন এবং পূর্ব দিকের অংশ বাংলাদেশের। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে রায়মঙ্গলের পর থেকে নোয়াখালি পর্যন্ত ওপার বাংলা অর্থাৎ বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের, যার প্রত্নতাত্ত্বিক আলোচনা আমার গবেষণার অন্তর্ভুক্ত নয়। তাসত্ত্বেও আমার গবেষণার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখতে অবিভক্ত সুন্দরবন আলোচনার অঙ্গ হিসেবে গবেষণার সন্দর্ভে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে আলোচিত

হয়েছে। ভৌগোলিক ভাবে ভারতীয় সুন্দরবন কর্কটক্রান্তি রেখার সামান্য দক্ষিণে ২১°৩৫' থেকে ২২°৩০' উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮°১০' থেকে ৮৯°৫১' পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।[৩৯] গোকুল চন্দ্র দাস ১৯৪৭ সালের আগে অর্থাৎ অবিভক্ত সুন্দরবনের অবস্থান উল্লেখ করেছেন ৮৮°৫''-৯০°২৮'' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ এবং ২১°৩১''-২০°৩৮'' দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে।[৪০] সুন্দরবনের মোট আয়তন ২৫,৫০০ বর্গ কিলোমিটার।[৪১] ইম্পেরিয়াল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডিয়ার প্রভিন্সিয়াল সিরিজ-এ অবিভক্ত সুন্দরবনের আয়তন উল্লেখ করা হয়েছে ৬,৫২৬ বর্গ মাইল[৪২] অর্থাৎ ১৬,৯০২ বর্গ কিলোমিটার। ১৯০৩ সালে সুন্দরবনের আয়তন ছিল ১৭,৫০০ বর্গ কিলোমিটার, দেশ ভাগের পরে সমগ্র সুন্দরবন জুড়েই মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে ফলে অরণ্যের আয়তনও হ্রাস পেয়েছে। "১৯৭৭ সালের সমীক্ষায় দেখা যায় অঙ্গচ্ছেদের পরে সুন্দরবনের আয়তন ভারতবর্ষের দিকে ২,০০,০০০ হেক্টর এবং বাংলাদেশের পরিমাণ ৬,০০,০০০ হেক্টর"।[৪৩]

সুন্দরবনের কমিশনার ও সার্ভেয়ার দ্বারা ১৮৩০ সালে সৃষ্ট যে ম্যাপ ও সীমানা সুন্দরবনের উত্তর দিক নির্দেশ করেছে, সেই ড্যাম্পিয়ার-হজেস লাইন ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে ভারতীয় সুন্দরবনের অংশ হিসেবে এপারেই থেকে গেছে। সেই মত ভারতীয় সুন্দরবনের সীমানা হিসেবে বলা যেতে পারে-

"দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর বিশাল জলাশয়/ ড্যাম্পিয়ার হজেস লাইন উত্তরে অক্ষয়,

রায়মঙ্গল, কালিন্দী আর ইছামতি নদী/ পূর্বদিকে আছে জেনো বহে নিরবধি,

পশ্চিমদিকে হুগলী নদী জানিও নিশ্চয়/ কাকদ্বীপ থেকে বসিরহাট রেখার দক্ষিণ ভাগ হয়"।[৪৪]

এই সুন্দরবনের পূর্ব থেকে পশ্চিমে দৈর্ঘ্য ১৬০ মাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রস্থ ৭০-৩০ মাইল। যার গড় প্রস্থ ৫০ মাইল।[৪৫] ১৯৮৬ সালে বৃহত্তম ২৪ পরগণা উত্তর ও দক্ষিণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সর্ব দক্ষিণ দিকের এলাকাই সুন্দরবন। উত্তর চব্বিশ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, মিনাখাঁ, সন্দেশখালি ১নং ও ২নং এই ৬টি এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সাগর, নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, কুলতলি, মথুরাপুর ১নং ও ২নং, ক্যানিং ১নং ও ২নং, জয়নগর নং ও ২নং বাসন্তী ও গোসাবা এই ১৩টি অর্থাৎ মোট ১৯টি ব্লক নিয়ে সুন্দরবনের জনবসতি অঞ্চল। এই জনবসতির মধ্যে প্রধাণত কৃষক ও জেলে। শতকরা ৯০ ভাগের বেশি চাষি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক, ৪৪ শতাংশ তফশিলি শ্রেণীভুক্ত, ৫০ শতাংশের মত মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে অতি কষ্টে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করে।[৪৬] ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সুন্দরবন নানা ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় পরিবেশ সচেতনতায় ১৯৭৩ সালের পর থেকে সুন্দরবন দেশের মানুষের কাছে যেমন পরিচিতি পেয়েছে তেমনি বিশ্বের কাছেও ১৯৮৭ সালে বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান রূপে চিহ্নিত হয়েছে। ১৯৪৬-১৯৭০ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ৫২.৮৩ লক্ষ উদ্বাস্তু পূর্ব-পাকিস্তান থেকে চলে এসেছিল, এর মধ্যে ৩৯.৫৬ লক্ষ উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিয়েছিল।[৪৭] ১৯৫০ এর দশকে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে আসা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ৫,৪১,৭২০ জন উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণায় আশ্রয় নিয়েছিল।[৪৮] ১৯৫১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় ২৪ পরগণায় মালোদের সংখ্যা ৫০৭৯ জন, জালিয়া-কৈবর্ত ৯৪৫৫ জন, তিয়র ১১,৮৯৫ জন এবং গণরী (Gonrhi) ৩৮৪ জন ছিল।[৪৯] এদের পেশা ছিল মাছ ধরা অর্থাৎ এরা জেলে। এই জনগণনার তথ্য থেকে আরও জানা যায়, জাল ও হুক দিয়ে এরা মাছ ধরে। ছোট জেলেরা মাছ ধরে নৌকায় জলের মধ্যে বাঁশের

খাঁচায় বেঁধে রাখতো, যাতে বাজারে পৌঁছানোর আগে পর্যন্ত মাছগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা যায়। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা মাছ ধরার নৌকা থেকে মাছ সংগ্রহ ও বাজারে নিয়ে যাওয়ার জন্য মোটর লঞ্চ বা বিশেষ নৌকা ব্যবহার করতো, এবং মাছ সংরক্ষণের জন্য বরফও ব্যবহার করতো। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর কলকাতায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্গত সুন্দরবনের একটি ছোট অংশের নদী ও খাঁড়ি থেকে কলকাতায় মাছের চাহিদা বেড়েছে, যদিও পরিবহন তখন ভালো ছিল না।[৫০] সময়ের সাথে সাথে সুন্দরবনের নদী-খাঁড়ি-জলাশয়ের উপর মৎস্যজীবীদের নির্ভরতা বেড়েছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে মৎস্যজীবীদের সংখ্যা ছিল ২৫,৩০০ জন, ১৯৮৯-৯০ সালে ছিল ২৫,৫৫০ জন, ১৯৯০-৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬,৪০০ জন।[৫১] বর্তমানে ২০২০-২১ সালে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সংখ্যা হল ৪,১৭,৯৭০ জন।[৫২] বামফ্রন্ট সরকার ১৯৭৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আসার পর সুন্দরবনও রাজনৈতিক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। দণ্ডকারণ্যের প্রতিকূল পরিবেশের কারণে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু ১৯৭৮ সালের মার্চ মাসে সুন্দরবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিল।[৫৩] এবং মরিচঝাঁপি দ্বীপে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করেছিল। তবে সরকার এই সংরক্ষিত বনের গুরুত্ব বুঝে এখান থেকে উদ্বাস্তু সরাতে বাধ্য হয়েছিল। প্রশাসনিক কারণে চব্বিশ পরগণা জেলা ১৯৮৬ সালে উত্তর ও দক্ষিণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এই দুই পরগণার দক্ষিণাংশের ১৯টি ব্লক নিয়ে গঠিত হয় সুন্দরবন অঞ্চল। এরপর দীর্ঘ ৩৪ বছরের বাম শাসনের পরে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসে, যার ধারা আজও অব্যাহত। আমার গবেষণার কালপর্বে (১৯৪৭-২০২১) প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত সমস্যা সুন্দরবনের ভৌগোলিক গঠনের দিকে বেশ কিছু পরিবর্তন এনেছিল।

বর্তমান সরকারের চিন্তাতে সুন্দরবনকে নিয়ে আলাদা জেলা তৈরির পরিকল্পনা থাকলেও ২০২১ সালের মধ্যে তা কার্যকরী হয়ে ওঠেনি।

বর্তমানে সুন্দরবনের উন্নয়নশীল ১৯টি ব্লকের লোকালয় ও বাদাবন মিলে সুন্দরবনের আয়তন ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ৪,২৬৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা শুধুই বন এবং ১,৯৬৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নদ-নদী, নদীর চর বা ঢাল। সমুদ্র সংলগ্ন নদীর জল নোনা। হুগলী-ইছামতী-বিদ্যাধরী দক্ষিণে বয়ে যাওয়া নদীর জল মিষ্টি হলেও সুন্দরবনের পশ্চিমের নদী-খাঁড়ির জল লবণাক্ত।[৫৪] এই লবণাক্ত জলকে আশ্রয় করে লক্ষ লক্ষ সুন্দরবনের মৎস্যজীবী তাদের জীবন অতিবাহিত করে। সুন্দরবনকে ঘিরে থাকা হুগলী, মাতলা, বড়তলা বা মুড়িগঙ্গা, সপ্তমুখী, ঠাকুরান, রায়মঙ্গল, ইছামতি, কর্তাল, বিদ্যাধরী, জামিরা, গোসাবা, হরিণঘাটা বা বালেশ্বর, বঙ্গদুনি এই সব নদীগুলি সুন্দরবনবাসী ও মৎস্যজীবীদের বেঁচে থাকার অবলম্বন। ১৭৭০ সালের জঙ্গল সংস্কার করার জন্য ঔপনিবেশিক সরকার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষদেরকে নিয়ে এসে সুন্দরবনে বসতি বিস্তারের কাজে লাগিয়েছিল। বন পরিষ্কার করে চাষের জমি তৈরির পাশাপাশি, সুন্দরবনকে ঘিরে থাকা ছোট-বড়ো নদীর মৎস্য সম্পদই প্রাণ ধারণের হাতিয়ার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল এই সকল আগন্তুকদের কাছে। সেই থেকেই অরণ্যজীবী এই মানুষদের কাছে অর্থনৈতিক জীবনের রসদ বলে পরিগণিত হয় এই প্রাকৃতিক সম্পদ তথা মৎস্য। বর্তমানে সুন্দরবনে ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ১০২টি দ্বীপ রয়েছে। এরমধ্যে ৪৮টি দ্বীপ বনাঞ্চল, সরকারের নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এখানে প্রবেশের। বাকি ৫৪টি দ্বীপে সুন্দরবনবাসীদের বসতি নির্মিত হয়েছে।[৫৫] দ্বীপগুলিকে কেন্দ্র করে নদী, নালা, খাল ও খাঁড়ি চারিদিকে ঘিরে রয়েছে। নদী-খাঁড়ির সহযোগে

সুন্দরবনের এই দ্বীপ গুলিতে ২৪ ঘণ্টায় ২ বার সমুদ্রের জলের আগমনে জোয়ার-ভাঁটা হয়। সুন্দরবনের উত্তরের অংশ উঁচু ও দক্ষিণের অংশ নীচু।

বঙ্গোপসাগরের জলের স্রোত প্রতিনিয়ত আসার কারণে ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত সুন্দরবনের নদীতে প্রচুর মাছের আনাগোনা দেখা যায়। প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ পৃথিবীর বৃহত্তম বাদাবন হল সুন্দরবন। মৎস্য ও অরণ্য সম্পদে পরিপূর্ণ সুন্দরবনের দ্বীপ, নদী-নালা-খাল-খাঁড়ি। উইলিয়াম হান্টার তার সুন্দরবন বিষয়ক প্রতিবেদনে দেখিয়েছেন যে সুন্দরবনের নদী গুলিতে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ যেমন- ভেটকি, কই, ভোলা, শোল, মাগুর, পাঙ্গাস, ট্যাংরা, বাঁশপাতা, পার্সে, ভাঙ্গন, শিঙ্গি, পুঁটি, চিংড়ি, তাছাড়া রুই, কাতলা, মৃগেল, ল্যাটা, তপসে, ম্যাঙ্গ-ফিশ, কালবোস, চিতল প্রভৃতি দেখা যায়।[৫৬] এছাড়া হান্টার তার প্রতিবেদনে সুন্দরবনের অরণ্য সম্পদের অর্থাৎ বিভিন্ন প্রজাতির ম্যানগ্রোভ সম্পর্কে বিস্তারিত গুণাগুণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য কিছু ম্যানগ্রোভ- আমুর, বাইন, গরান, গেঁওয়া, ঝাউ, হেঁতাল, কাঁকড়া, কেওড়া, খলসি, পশুর, ও সুন্দরী।[৫৭] জীব বৈচিত্র্যের ভাণ্ডার হল সুন্দরবন। "অরণ্যসমৃদ্ধ সুন্দরবনের জঙ্গল ও খাঁড়িতে ১৫৮৬ প্রজাতির প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। ২০০ থেকে ২৫০ প্রজাতির পাখি, ৭০ প্রজাতির কাঁকড়া-শামুক-ঝিনুক, ১৩০ প্রজাতির মাছ, ৬৪ প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদসহ জলচর ও স্থলচর জীবজন্তু ও প্রাণীদের বিচরণ ক্ষেত্রে ও আবাসস্থল হল এই সুন্দরবন।"[৫৮] সুন্দরবনে জলাভূমির বিস্তৃতি বিশাল বা বলা যায় সুন্দরবন নিজেই একটা বৃহৎ জলাভূমি। বন বিভাগের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুয়ায়ী সুন্দরবনের জলাভূমির পরিমাণ ১৯২০ বর্গ কিলোমিটার যা সমগ্র বনভূমির ৪৫ শতাংশ।[৫৯] এই জলাভূমিকে কেন্দ্র করে যেমন বিভিন্ন জাতের মাছেদের জীবন চক্র পরিচালিত হচ্ছে তেমনি সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের রক্ষাকর্তা বাঘেদের জীবনও পরিচালিত হচ্ছে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামে বিশ্ববন্দিত

এই বাঘ জেলে-মৎস্যজীবীদের কাছে সামাজিক দেবতা ‘দক্ষিণরায়’ নামে পরিচিত ও পূজিত। এছাড়া হরিণ, কুমির, সাপ, কচ্ছপ, হাঙর, শুশুক, বনবিড়াল, বন্যশুকর, কাঁকড়া, মৌমাছি, প্রায় ৫০ রকম প্রজাতির পরিযায়ী পাখি নিয়ে সুন্দরবনের অরণ্য প্রকৃতি ভৌগোলিক ভাবে ভীষণই স্বতন্ত্র। যে কারণে ১৯৭৩ সালে ২৩শে ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক সহয়তায় ও পশ্চিমবঙ্গের বনবিভাগের তত্ত্বাবধানে সুন্দরবনের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে মাতলা নদীর পূর্বে ২৫৮৫.১০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে রয়েছে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প। এই ব্যাঘ্র প্রকল্পের ১৩৩০.১০ বর্গ কিলোমিটার ঘন ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে ৪ঠা মে ১৯৮৪ সালে জাতীয় অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত সজনেখালি বনাঞ্চলের ৩৬২.৪০ বর্গ কিলোমিটার, হ্যালিডে দ্বীপের ৫.৯৫ বর্গ কিলোমিটার এবং লোথিয়ান দ্বীপের ৩৮ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ১৯৭৬ সালের জুন মাসে বন্যপ্রাণীদের জন্য সুন্দরবন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৩ সালে ব্যাঘ্র প্রকল্পের অন্তর্গত ৮৯২.৬০ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে বাফার বা মধ্যবর্তী অঞ্চল হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছে। এই বাফার অঞ্চলে বন বিভাগের অনুমতি সাপেক্ষে ও নির্ধারিত কর প্রদানের মাধ্যমে স্থানীয় সুন্দরবনবাসী মানুষের বসবাস, মাছ ধরা, কাঠ কাটা, মধু সংগ্রহ করা এবং বেড়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৬০] ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের মধ্যে ৫৪টি দ্বীপে সর্বশেষ জনগণনার রিপোর্ট অনুযায়ী ৪৪,২৬,২৫৯ জন মানুষের বসতি রয়েছে।[৬১] ৫৪টি দ্বীপের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য দ্বীপ গুলি হল-মিনাখাঁ, হাসনাবাদ-বরুনহাট-শিতলিয়া, সন্দেশখালি-দ্বারিক জঙ্গল, সজনেখালি, বাসন্তী-সোরানবোস, জামতলা, কুলতলি, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগরদ্বীপ, জম্বুদ্বীপ, মরিচঝাঁপি, বকখালি, রায়দীঘি ও পাঠানখালি।[৬২] ৫৪টি দ্বীপের আধিকাংশ সুন্দরবনের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে মিশে গেছে, আলাদা করে দ্বীপগুলিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব

নয়। দ্বীপগুলিকে কেন্দ্র করে পরিবর্তিত আবহাওয়া ও যে প্রাকৃতিক পরিবেশ রয়েছে সুন্দরবনে, সেই ভৌগোলিক অবস্থানেই প্রথম থেকেই মানুষের বেঁচে থাকার কঠিন জীবন সংগ্রাম রচিত হয়েছে। কর্কটক্রান্তি রেখার কাছাকাছি অবস্থানের কারণে সুন্দরবনের আবহাওয়া খুব চরম হয়ে ওঠেনি।

সুন্দরবনের ভূপ্রকৃতির অস্থিরতা, সামুদ্রিক ঝড় ও জলতরঙ্গ এখানকার আবহাওয়ার প্রধান নিয়ন্ত্রক। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে সুন্দরবনের পরিবেশ বছরের অধিকাংশ সময়ে আর্দ্র থাকে। গ্রীষ্মকালের সময়কাল মার্চের মাঝামাঝি থেকে জুনের মাঝামাঝি পর্যন্ত। বর্ষা শুরু হয় জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলে।[৬৩] গৌতম কুমার দাস দেখিয়েছেন- সুন্দরবনের গড় বৃষ্টিপাত ১৯০৮ মিমি। এখানকার গড় তাপমাত্রা ২৫°-৩০° সেলসিয়াস। নদীজলের লবনাক্ততা ৮.৬-২৮.৪ পি.পি.টি (Parts Per Thousand, 1P.P.T=1000mg,salt/liter)। সুন্দরবনের বাতাসের গড় গতিবেগ ঘন্টায় ৬.৬৫-১১.৫ কিমি।[৬৪] এই প্রসঙ্গে বি সি শর্মা তার গবেষণায় দেখিয়েছেন সুন্দরবনের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৭৫০ মিমি থেকে ১৮০০ মিমি। তবে বিভিন্ন সময়ে তা কখনো বেড়েছে বা কমেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৭২ সালে গোসাবাতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ১২৪৪ মিমি, ১৯৭৬ সালে সাগরে ১২৭০ মিমি।[৬৫] ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই সুন্দরবনের এই পরিস্থিতি। আবার অনুরাধা ব্যানার্জী তাঁর গবেষণাতে দেখিয়েছেন সুন্দরবনের গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৮০০ মিমি।[৬৬] সুন্দরবনের পরিবেশের প্রধান নিয়ন্ত্রক ক্রান্তীয় মৌসুমি বায়ু, জোয়ার-ভাঁটার প্রকৃতি, সমুদ্রের সান্নিধ্য, সমুদ্র স্রোত, ভূমির ঢাল, মৃত্তিকা, সুন্দরবনের ভূমিরূপ ও ম্যানগ্রোভের আধিক্য।[৬৭]

সুন্দরবনের ১০২টি দ্বীপের ভারসাম্য বজায় রাখে এই ম্যানগ্রোভ। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ প্রজাতির যে বৈচিত্র্য তা কেবলমাত্র সারা ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বের কাছে তা অনন্য। পৃথিবীর মোট ৫০টি উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে সুন্দরবনে পাওয়া যায় ৩৫টি, এছাড়া ২৪টি লবণাম্বু সহযোগী এবং ৭টি বাধ্যতামূলক লবণাম্বু বা অব্লিগেটরি ম্যানগ্রোভ। বনবিভাগের তথ্য অনুযায়ী সুন্দরবনের মোট প্রজাতির সংখ্যা ৮৪। এরমধ্যে লবণাম্বু প্রজাতি ২৬টি, লবণাম্বু সহযোগী ২৯টি এবং পশ্চাৎ লবণাম্বু বা ব্যাক ম্যানগ্রোভ ২৯টি। এই সমস্ত উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে প্রায় ৩০টি বৃক্ষ জাতীয়, ২০টি গুল্ম এবং অন্য ২০টি বীরুৎ।[৬৮] ম্যানগ্রোভের আধিক্য ও জীব বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যের কারণে সুন্দরবনে একটি বিশিষ্ট জীবপরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে। তাছাড়া স্বীকৃতি স্বরূপ বিশ্বের দরবারে ভারতীয় সুন্দরবন ১৯৮৪ সালে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং ১৯৮৯ সালে ৯,৬৩০ বর্গকিলোমিটার পুরোটাই সুন্দরবন জীবপরিমন্ডল হিসেবে বিশেষ পরিচিতি পেয়েছে।[৬৯] সুন্দরবনের এই সমৃদ্ধ বাস্তুতন্ত্র ও তার ভারসাম্য পুরোটাই সুন্দরবনের মৃত্তিকা বা মাটির ওপরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

নদী প্রবাহের সাথে হিমালয় থেকে বয়ে আনা নুড়ি-পাথর-পলির সহযোগে সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভূমি গড়ে উঠেছে। তারপরে যুগ যুগ ধরে সেই পলিস্তরে গঠিত মৃত্তিকার ওপর গাছপালা জন্মেছে, জীবজন্তুর পাশাপাশি মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল। এই মাটিকে কৃষিকাজের উপযোগী করে সুন্দরবনের মানুষ জীবন জীবিকার পথ তৈরি করেছে। কমল চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে সুন্দরবনের মাটির চার ধরণের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, (ক)বালিয়াড়ি বা দোসরা মাটি- লালচে রঙের এই মাটি চাষের উপযুক্ত নয়। (খ) ঢপ বা চুরা- লবণের পরিমাণ সমৃদ্ধ এই সাদা মাটিও চাষের পক্ষে উপযুক্ত নয়। (গ) ঢাল- এই মাটির রঙ লালচে, বর্ষায় এই মাটিতে ধান চাষ হয়। (ঘ) মাটিয়াল- সাদা রঙের এই মাটিতে ধান চাষ ভালো হয়।[৭০]

সুন্দরবনের ১৯টি উন্নয়নশীল ব্লকের অধিকাংশ মানুষের জীবিকা অতিবাহিত হয় কৃষিকাজের মাধ্যমে। গঙ্গা পদ্মার অসংখ্য শাখানদীর পলিমাটি ধান চাষের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উপযোগী বলেই প্রাচীনকাল থেকে সুন্দরবনে গ্রামীন কৃষি সমাজ গড়ে উঠেছে।[৭১] এই সমাজ গঠনের পশ্চাতে যাদের অবদান সেই চন্ডাল, কৈবর্ত, কাওরা, বাগদি, জেলে, শুঁড়ি, মুন্ডা, হো, ওঁরাও, সাঁওতাল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষই আদিবাসী। সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে রাজস্ব লাভের আশায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে শ্বাপদসংকুল এই পরিবেশে নিয়ে আসে। আবাদি কর্মের আদি পর্বে ভিন প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত প্রবাহ সুন্দরবনে জনজোয়ার এনেছিল। মেদিনীপুরের ভূমিজ, ছোটনাগপুর-রাঁচি অঞ্চলের সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা ও উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ জেলার আদিবাসীদের সুন্দরবনে আনা হয়েছিল মূলত আদিপর্বে আবাদি জমি উদ্ধার করার জন্য।[৭২] বর্তমানে এরা সুন্দরবনের মানুষের মধ্যেই মিশে গেছে। ক্রমে সুন্দরবনকে ঘিরে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক পর্যায়ের কৃষি নির্ভর জীবিকার পাশাপাশি বিকল্প ভাবে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনতে মৎস্য নির্ভর জীবিকাই সুন্দরবনের একাংশের কাছে প্রধান জীবিকা হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। নদী-খাল-খাঁড়ির ও সমুদ্রের থেকে মৎস্য সংগ্রহ যা কিনা মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনকে ভীষণই প্রভাবিত করে, এর প্রতিফলন তাদের সংস্কৃতিতেও প্রতীয়মান হয়।

মৎস্যজীবীদের সমাজ-সংস্কৃতি

সুন্দরবনে লোকজীবনের যে ছন্দ তা লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে মৎস্যজীবীদেরকে অবিরত সংগ্রাম করে তাদের জীবিকা চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়। মৎস্যজীবীদের সমষ্টিচেতনার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায় তাদের মনোভাব। এই মনোভাবের

প্রেক্ষাপটেই গড়ে ওঠে লোকসংস্কৃতি। ঔপনিবেশিক সময়ে সুন্দরবনে আসা মানুষগুলোকে পেটের ভাত জোগাড় করতে গিয়ে যে সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়েছিল, আজও সুন্দরবনের শ্রমজীবী মানুষদেরকে জীবিকার জন্য বাঘ, সাপ, কুমির, ও প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করতে হয়। সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশই সুন্দরবনবাসীদেরকে আরও বেশি করে দৈবশক্তির উপর নির্ভরশীল করে তোলে। এই দৈবশক্তির পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে আনন্দ করা এখানকার লোকসংস্কৃতির মূল কথা। পৃথিবীর ইতিহাসে সুন্দরবন আজও ভাঙ্গা গড়ার স্বাক্ষর বহন করে চলেছে। নিত্য নব যৌবনশালিনী স্রোতস্বিনী তটিনীর তর্জন গর্জন সুন্দরবনবাসীদের ভাবিয়ে তোলে। দোয়ানী-ভারানী পথে মৎস্যজীবীরা কাতারে কাতারে ঘুরে বেড়ায় মাছ-কাঁকড়ার সন্ধানে।[৭৩] ভারতীয় সমাজে পেশা হিসেবে মাছধরার সামাজিক সম্মান ছিল না। মৎস্য সম্পদের সহজলভ্যতা, মাছের স্বাদের প্রতি বাঙালিদের ভালোবাসা বাংলার কিছু ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের মাছধরাকে, তাদের জীবিকার উপায় হিসেবে গ্রহণ করতে আকৃষ্ট করে।[৭৪] এই জীবিকাতে অংশ গ্রহণকারী মৎস্যজীবীরা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়, সুন্দরবনের সমস্ত ধর্মের মানুষ নিজেদেরকে এই পেশায় নিয়ে এসেছে। বংশগত ভাবে সুন্দরবনবাসী নদীর রুপালি শস্যকে আশ্রয় করে পরিবারের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার চেষ্টা করে চলেছে। আসলে সুন্দরবনে বসবাসকারী অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমানার নীচে বসবাস করে এবং এই দারিদ্রতা এদেরকে আরও বেশি পরিমাণে নদী-খাল-ভেড়ির মাছ ও কাঁকড়ার ওপরে নির্ভরশীল করেছে। সুন্দরবনের একটা বৃহৎ অংশের মানুষ নদীর মীন সংগ্রহের কাজে যুক্ত রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে এরা মৎস্যজীবী। এরা খুবই সাহসী, কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। দিনরাত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করে।

আমার গবেষণা সন্দর্ভের আলোচনাতে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে মৎস্য সংগ্রহকে আশ্রয় করে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষেরা সমাজের মূল স্রোতে থেকেও লৌকিক আচারকে তাদের সমাজ-সংস্কৃতির নিজস্ব জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করে কিভাবে তাদের জীবন পরিচালিত করছে। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের আগে যারা সুন্দরবনে এসেছিল এবং দেশ ভাগের পরে যারা এসেছে উভয়ের কাছে সুন্দরবনের উন্মুক্ত পরিবেশের সঙ্গে ছেড়ে আসা দেশের পরিবেশের সঙ্গে কোন অংশে অমিল ছিল না, যেকারণে সংস্কৃতির আদান প্রদান আরও সহজ হয়েছিল। মৎস্যজীবীদের লোকজীবন তাদের সমাজ ও সংস্কৃতিতে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অতি বিচিত্র বনভূমি এই সুন্দরবন। বিচিত্র প্রাণী ও উদ্ভিদের সমাগম সুন্দরবনের অরণ্যে। বাস্তুতন্ত্রের সুসামঞ্জস্যে খাদ্যশৃঙ্খলের সঠিক সহাবস্থান, সুন্দরবনের দ্বীপগুলোকে ঘিরে রচিত হয়েছে। এই শৃঙ্খলের অংশীদার সুন্দরবনের আর এক সম্পদ মানুষ। নরখাদক ও হিংস্র জন্তুদের সাথে লড়াই করে দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করছে অনুন্নত সুন্দরবনবাসী-মৎস্যজীবী-প্রান্তিক মানুষ। এদের জীবন ও জীবিকার পথও বিচিত্র।

সুন্দরবনের আসল অধিবাসী হল- মউলে, বাউলে, জেলে, ভূমিহীন বর্গাদার। যাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের দৃষ্টান্তমূলক এক নব্য সমাজ। এই ধারায় বা স্রোতে মিলিত হয়েছে মিশ্র সংস্কৃতির মানুষ। তাদের জীবিকা মাছ ধরা, কাঠ কাটা বা চাষের কাজ করা। এই সব কর্মের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের মানুষ জীবিকা অর্জন করতো। বর্তমান সময়েও তাই করে। বিকল্প কিছু কর্মের সন্ধান না পাওয়ায়, এভাবেই মৎস্যজীবী মানুষেরা তাদের পরিবার প্রতিপালন করে চলেছে। সুন্দরবনে জনজাতির পরিচয় প্রদান করে হান্টার তাঁর রিপোর্টে দেখিয়েছেন- সুন্দরবন অঞ্চলের জনগোষ্ঠীতে হিন্দু ও মুসলমান এই দুটি ধর্মের মানুষের সংখ্যা বেশি। এছাড়া কিছু মগ বৌদ্ধ ও

নেটিভ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষদেরকেও দেখা যায়।[৭৫] হিন্দু ধর্মাবলম্বী বসবাসকারী মানুষের কয়েকটি ভাগ আছে। এ অঞ্চলের হিন্দু বেশির ভাগ নিম্নবর্ণীয় শূদ্র বা তফশিলি জাতি। তিনি হিন্দুদের পেশা অনুযায়ী নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন[৭৬]- ১) নাপিত- এরা ক্ষৌর কাজ ও কৃষি কাজের সঙ্গে যুক্ত, এরা বেশিরভাগ দরিদ্র্য। ২) কৈবর্ত- এরা জেলে এবং কৃষক। এদের মধ্যে মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত পর্যায়ের কিন্তু বেশির ভাগ দরিদ্র। ৩) কাপালি- এরা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত এবং ছোট দোকানদার, এরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। ৪) পৌণ্ড্র বা পোদ- এরা কৃষিকাজ, মাছধরা ও জঙ্গলের কাঠ কাটার সঙ্গে যুক্ত থাকে। ৫) চণ্ডাল বা চাঁড়াল- এরা মূলত নমঃশূদ্র। দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ, কৃষিকাজ ও ঋতুভিত্তিক কাঠ কাটার কাজের সাথে যুক্ত। ৬) জেলিয়া- এরা কৃষক এবং জেলে। ৭) বাগদি- কৃষক এবং জেলে এদের বেশিরভাগ খুবই দরিদ্র। ৮) তিয়র- কৃষক, শ্রমিক এবং জেলে। এরা সাধারণত দরিদ্র। ৯) ধোবা- এদের পেশা মূলত কাপড় কাচা। ১০) যোগী বা যুগী- এরা তাঁতি। কৃষিকাজ ও মহাজনী কারবার করে। ১১) শুঁড়ী- এরা মদ তৈরি ও বিক্রি করে। ১২) কাওরা বা কাহার- এদের পেশা কৃষিকাজ, শুকর পালন করা এবং এরা খুবই দরিদ্র। এল এস এস ও'মেলি, হান্টারের দেওয়া তথ্যে উল্লিখিত পৌণ্ড্র বা পোদকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করছেন যেমন- চাষি পোদ, মেছো পোদ, তাঁতি পোদ এবং ধমনা পোদ।[৭৭]

ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর 'A Statistical Account of Bengal' গ্রন্থের চব্বিশ পরগণা ও সুন্দরবন এর জাতিগত কাঠামোর একটা রূপরেখা তুলে দেখিয়েছেন— বুনো-উপজাতির মানুষেরা ছোটনাগপুর এবং পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ি জেলাগুলি থেকে এসেছিল। এদেরকে মূলত আনা হয়েছিল সুন্দরবনের পশ্চিম প্রান্তের জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য। এরা স্ত্রী ও ছেলেমেদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। এদের অনেকেই এখন সুন্দরবন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস করছে।

মালঙ্গিরা উড়িষ্যা থেকে এসে সুন্দরবনের সাগর এবং নামখানাতে বসবাস করে। এরা ১৮৬৪ সালের সাইক্লোনে নিজেদের বসতবাড়ি হারিয়ে এই অঞ্চলে চলে আসে। এদের পেশা সমুদ্রের জল থেকে লবণ তৈরি করা ও কাঠ কাটা। আর সম্প্রদায়গুলি হল— মীরশিকারি; যাদের কাজ হল বনে শিকার করা, মাছ ধরা, মাছ বিক্রি করা। বর্তমানে এরা চাষের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, সাপুড়ে, এদের কাজ হল সাপ ধরে, সাপের খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে। বেদে— এরা কোয়াক ডাক্তার, দাঁতের যন্ত্রণার ঔষধ, ঝাড় ফুঁক তুকতাক করে গ্রামে। মঘ বা মগ- এরা আরাকান এলাকা থেকে সুন্দরবনে এসে পূর্ব বাখরগঞ্জ এলাকায় বসবাস শুরু করে। বর্তমানে এরা সুন্দরবনাঞ্চলের ভাবধারায় মিশে গেছে। আবার মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেও জাতিভেদ লক্ষ্য করা যায়। সুন্দরবনে সুন্নি মুসলমান সমাজ তিনটি ভাগে বিভক্ত। যথা- শেখ, সৈয়দ ও পাঠান মুসলমান। এদের পেশা কৃষিকাজ ও কাঠ কাটা। আর এক সম্প্রদায় হল নেটিভ খ্রিস্টান-এদের পেশা কৃষিকাজ।[৭৮] বিভিন্ন জনসমষ্টি নিয়ে সুন্দরবনের সমাজ কাঠামো তাতে প্রাথমিক সময় থেকে নিম্নবর্গ-আদিবাসী সমাজের হাত ধরে সুন্দরবনে মনুষ্য সম্পদের একত্রীকরণ ঘটেছিল। তবে মনুষ্য সম্পদের এই আগমনের ইতিহাস খুঁজে পাওয়া কঠিন কারণ তথ্যের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। ১৭৭০ সাল থেকে ঔপনিবেশিক সরকার জঙ্গল পরিষ্কার করিয়েছিলেন নিজেদের সুবিধার জন্য, সেই সূত্রে ছোটনাগপুর, রাঁচি ও হাজারিবাগ প্রভৃতি এলাকা থেকে কঠোর পরিশ্রমী নিম্নবর্গের আদিবাসী মানুষদেরকে নিয়ে এসেছিল। তারাই সুন্দরবনের বিভিন্ন স্থানে বসতি বিস্তার করে এই এলাকার সম্পদে পরিণত হয়েছিল। সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের একটা বৃহৎ অংশ তপসিলিভূক্ত, যারা মূলত সুন্দরবনের মাছ-কাঁকড়া, কাঠ-মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে।

১৯৬১ সালের আদমশুমারির রিপোর্টে জাতিকাঠামোর যে পরিসংখ্যান পাওয়া যায়, তা নিম্নে তালিকার আকারে দেওয়া হল—

	নাম	দক্ষিণ ২৪ পরগণা	সুন্দরবন
১	বাগদি	১,১২,৯৩৪	৪২,১৪০
২	বেদিয়া	১,৭২৮	১,০১০
৩	ভুইয়া	৫,৫১১	৫,০০৮
৪	ভুইমালি	৩,৮৯২	২,৫৪০
৫	চামার বা মুচি	৩৯,৭৬১	৬,১৮৯
৬	ধোবা বা ধোবি	১৯,৫৪৮	৬,৫০১
৭	হরি	৭,৬৮১	৪,৬৭০
৮	জালিয়া কৈবর্ত	১২,০০০	৪,৩৯৭
৯	কান্দ্রা (Kandra)	৪,৫৬৮	৪,২৭৭
১০	কাওরা	৬৫,২০৮	২৫,৩৪৪
১১	মাহার	১,০০৮	৬৪৪
১২	মল (Mal)	২,৭৪১	১,৯১২
১৩	নমঃশূদ্র	২,০৩,৩৪২	৬২,৬০৩
১৪	পৌণ্ড্র	৭,২০,০৩৬	৩,৬২,০৬০
১৫	রাজবংশী	১,১৩,৫৩৮	২৬,২১৪
১৬	সুনরি	৩,১৩৬	৭৮৬
১৭	তিয়র	১৬,০৯৮	৩,৫৭৩
১৮	তুরি (Turi)	১,১১৪	১,০২১
১৯	অন্যান্য	৩০,৭৯১	৯,৯৪৭
মোট		১৩,৬৪,৩৬৬	৫,৭০,৮৫৬

সূত্রঃ আদমশুমারি, ১৯৬১, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

স্বাধীনোত্তর পর্বে দেশ বিভাগের সময়ে সুন্দরবনে জনবিস্ফোরণের প্রচেষ্টা দেখা গেছে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। আদমশুমারির রিপোর্ট পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কি ভয়াবহতা। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পূর্বে অবিভক্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ৭,৫৪,৪২১ জন সেখানে দেশ ভাগের পরে ১৯৫১ সালের আদমশুমারি রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী জনসংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ১১,৫৯,৫৫৯ জন।[৭৯] বর্তমানে ২০১১ সালে আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী সুন্দরবনের জনসংখ্যা ৪৪,২৬,২৫৯ জন।[৮০] এই যে জনসংখ্যার একটা চাপ সুন্দরবনে ক্রমেই বেড়ে চলেছে, সে তুলনায় সুন্দরবনবাসীর কৃষিকাজ, নদী-সমুদ্র থেকে মাছধরা, জঙ্গলের মধু-কাঠ সংগ্রহ করা ভিন্ন, বিকল্প কোন ব্যবস্থা নেই অর্থ উপার্জনের। তাছাড়া প্রতি বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সুন্দরবনের রক্ষক নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয় সুন্দরবনের চাষযোগ্য জমি। তাই কৃষিকাজ থেকে বিমুখ হয়ে এরা সারা বছর ধরে নদী-জঙ্গলের প্রাকৃতিক সম্পদের প্রতি নির্ভরশীলতা বাড়িয়ে তুলেছে। নদী ও জঙ্গলের ভয়াবহতা তাদেরকে সর্বদাই বিপদের সম্মুখীন করে তোলে। বিপদ থেকে বাঁচতে এরা বেশি করে নিয়তির প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। মৎস্যজীবীদের নিজস্ব বিশ্বাস থেকেই জন্ম হয়েছে বিভিন্ন সংস্কার। এই থেকেই তাদের সংস্কৃতির জন্ম।

সুন্দরবনের জনসংখ্যায় সব সম্প্রদায়ের ও ধর্মের মানুষ রয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মিশ্র সংস্কৃতির বিস্তার ঘটেছে। মৎস্যজীবী বলে যারা সুন্দরবনের সমাজে পরিচিত তাদের সংস্কৃতির মধ্যে সংস্কার বা কুসংস্কার যেটাই বলা হোক না কেন দেবদেবীর প্রতি তাদের যে ধারণা তা কোন অংশে অমূলক নয়। সুন্দরবন উপকূলীয় এলাকায় বলে প্রায়শই প্রাকৃতিক দুর্যোগ লেগেই থাকে, তা মোকাবিলা করার জন্য তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও অতিপ্রাকৃত শক্তির ওপর ভীষণই আস্থাশীল। যেকারণে মৎস্যজীবীদের মধ্যে গাছ, সাপ, বাঘ এদের প্রতি দেবজ্ঞানে পূজার প্রচলন

লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে বিকাশ রায়চৌধুরি বক্তব্য— "as the life of the fisherfolk is always in danger and the catches are often uncertain. they have a strong belief in supernaturalism. Beliefs in witchcraft and the magical power in amulets are widely prevalent among them."[৮১] জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে সত্য, শিব, শক্তি ও সুন্দরের আবাহনের মধ্যে সংস্কৃতির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। সংস্কৃতি, জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকে। জীবন যেমন গতিশীল, সংস্কৃতি তেমনই গতিশীল। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের গতিশীল জীবনের ধারাবাহিকতায় সংস্কৃতির জায়গাতে লৌকিক দেবদেবীর আধিক্য অনেক বেশি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি সুন্দরবনবাসীর কাছে পূজিত হয়ে আসছে বনবিবি, দক্ষিণরায়, বাবা ঠাকুর, গোরাচাঁদ পীর, বরখাঁ বা বড়খাঁ গাজি, পঞ্চানন পীর, কালু রায়, মনসা, শীতলা, ওলাবিবি প্রভৃতি, যদিও পুরাণ বা শাস্ত্রে এদের উল্লেখ নেই।[৮২] এছাড়া আটেশ্বর, মাকালঠাকুর, নারায়ণী, বিশালাক্ষ্মী প্রভৃতি দেবদেবীগণ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে পূজিত হয়ে আসছে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে লৌকিক দেবতার প্রতি ভক্তি যতটা না তাদের শ্রদ্ধাবোধ থেকে আসে, তার থেকে আরও বেশি আসে নিয়তির থেকে মুক্তি লাভ করার তাগিদে। অলক মণ্ডল তাঁর 'সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি' প্রবন্ধে লিখেছেন— "এই জেলার (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) হুগলী, বিদ্যাধরী, পিয়ালী, মাতলা, ঠাকুরান প্রভৃতি নদীগুলি এখানকার জনজীবন, জীবিকা ও ভূ-প্রকৃতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। পল্বলময় উর্বর মাটির জন্য এই জেলার অনেক অঞ্চল ঘন বনে ঢাকা। নিবিড় অরণ্যের জন্য এই জেলায় 'বনদেবতার' প্রাচুর্যও দেখা যায়। বনদেবতাদের মধ্যে দক্ষিণরায়, বনবিবি, সাতবিবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই বনদেবীরা জেলে, মালো, কাঠুরেদের উপাস্য। এই জেলায় এমন কতগুলি লৌকিক দেবদেবীর সমাবেশ ঘটেছে, যা

অন্যত্র দুর্লভ। এই দেবদেবীর থানে হিন্দু ও মুসলমান মানত করে, শিরনি দেয়।"[৮৩] বনবিবি আসলে বনদূর্গা, বনের অধিষ্ঠাত্রী। সুন্দরবনে বসবাসকারী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাউলে, মউলে, মালঙ্গী, নৌজীবী, শিকারী প্রভৃতি মানুষ বনবিবিকে ভক্তি ভরে পূজা করে। বনবিবি পৌরাণিক দেবদেবীদের মতই লাবণ্যময়ী। বনবিবির মূর্তি দুইরকমের দেখা যায়। মুসলমান এলাকায় এর আকৃতি খানদানি মুসলমান কিশোরী বালিকার মতো দেখতে হয়। মাথায় থাকে টুপি, চুলে বিনুনি করা থাকে। গলায় হার থাকে, দেহে ঘাঘরা-পাজামা-ওড়না ও পায়ে থাকে জুতো-মোজা, হাতে থাকে ঝাণ্ডা বা আশাবাড়ি। হিন্দুদের এলাকায় বনবিবির দেহের বর্ণ হরিদ্রা, মাথায় থাকে মুকুট, গলায় বনফুলের মালা থাকে, কোলে থাকে শিশু। এর বাহন মুরগী বা বাঘ।[৮৪] "প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে বসবাসকারী মানুষ বাঘের হাত থেকে রক্ষা পেতে দক্ষিণরায়ের স্মরণ নেয়। জঙ্গল মহলে মোম, মধু, কাঠ, বুনো হাঁসের ডিমসহ বনজ সম্পদ আহরণ এবং নদী-খাঁড়ি-ভারানি-দোয়ানিতে মাছ-চিংড়ি-কাঁকড়া ধরায় যুক্ত বাউলে, মউলে, কাঁকড়ামারা, মাছমারা ধীবরসহ বিচিত্র পেশাধারীরা সারা বছর ধরে এঁকে পূজা-হাজোত দেন।"[৮৫] দক্ষিণরায় সুন্দরবন বাসীদের কাছে বাঘের দেবতা, আবার পুরোহিতদের কাছে দক্ষিণরায় শিবপুত্র। কথিত আছে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে মৎস্যজীবীরা এর পূজা করেন। এই প্রসঙ্গে কবি হরিদেব লিখেছেন—

"আমি তো জঙ্গল রাজা দক্ষিণ ঈশ্বর
আমার সেবক বটে তো ধীবর।"[৮৬]

পৌষ সংক্রান্তি বা মাঘ মাসের প্রথম তারিখে এই পূজা হয়। এই পূজায় 'বারা' নামক দুটি ঘট, পুরুষ ও নারী মুখ অঙ্কিত হয়ে চিত্রিত ঘটে পূজিত হয়। পুরুষ বারাটি দক্ষিণরায় ও নারী

বারাটি তাঁর মা নারায়ণী— ইনি বিষ্ণুর শক্তি নারায়ণী নন।[৮৭] দক্ষিণ রায়কে ঘিরে সুন্দরবনের লোকসমাজের মধ্যে বিভিন্ন পালাগান বহুদিন ধরেই প্রচলিত রয়েছে, যা মৎস্যজীবীদেরকে অরণ্যে সাহস জোগায়। জঙ্গলে গিয়ে জেলে, কাঠুরে ও মউলেরা দক্ষিণ রায়কে স্মরণ করে গেয়ে ওঠে—

"দয়া কর বাবা এ বাদাবনে
ভাই বন্ধু কেউ নেই এ বাদাবনে।
তুমি রাজা, আমরা প্রজা,
সদয় থেকো এ পরাণে।
দয়া কর বাবা এ বাদাবনে।"[৮৮]

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা জলাশয়ে মাছ ধরতে নামার আগে পাড়ে মাকালঠাকুরের পূজা করে। আদিম মানুষরা যখন দেবতার মানুষ রূপ দিতে শেখেনি, মাটির ঢেলা ও পাথরের চাঁই কেটে দেবতা বানিয়ে নিত। মাকালঠাকুরের প্রতীক দেখলে সেই কথাই মনে হয়। মাকাল ঠাকুরের কোন মূর্তি নেই। মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে মাটির স্তূপকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে। এই পূজায় কোন ব্রাহ্মণ বা মন্ত্র লাগে না। পূজার উপকরণ হিসাবে চাল-কলা-বাতাসা, কলকে ও গাঁজা প্রয়োজন হয়। পূজার শেষে দেবতার প্রতীকের উপর ফুল দেওয়া হয়। লোকশ্রুতি অনুযায়ী যদি ঐ ফুল আপনা থেকে নিচে পড়ে, তাহলে মৎস্যজীবীদের আনন্দের সীমা থাকে না। তাদের মনে হয় যে তাদের জালে প্রচুর মাছ ধরা পড়বে। পুরো এই প্রক্রিয়াটিকে বলা হয় ফুল চাপানো।[৮৯] সুন্দরবনে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার সময় আটেশ্বরকে সন্তুষ্ট রাখতে 'আট মাকাল' রূপে তাঁর পূজা করেন।[৯০] মৎস্যজীবীদের দেবদেবীর পূজার্চনায় সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকাতে বিভিন্ন ধরণের প্রাণীদেরকে বলি দেওয়া, পালাগান, যাত্রা, গাজন, তর্জাগান, মনসার ভাসানগান প্রভৃতি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই ভাসানগানে মেয়েরাই পুরুষ বেশে নাচগান করে। সুন্দরবনের গোসাবা,

সাতজেলিয়া, মথুরাপুর, জয়নগর, হিঙ্গলগঞ্জ, হাসনাবাদ প্রভৃতি এলাকায় বাগদি, মালো, রাজবংশী ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মধ্যে শীতলার জাগরণ গান ও যাত্রার প্রচলন দেখা যায়। জেলেদের মধ্যে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার বেশ চল আছে। এছাড়া কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা ও রায়দীঘি এলাকার জেলেদের মধ্যে গঙ্গাপূজার প্রচলন রয়েছে।[৯১] অরণ্যবাসী মৎস্যজীবী মানুষের কাছে বিপদ ও দুর্যোগ নিত্যকালের সঙ্গী, নদীর জলে ভেসে থেকেই তাদের অন্ন সংস্থানের প্রচেষ্টা চিরকালীন। সতত দুঃখে বিভিন্ন সুর ও বিভিন্ন ভঙ্গিতে গাওয়া লোকগীতি গুলো যেমন তাদের মানসিক চেতনায় উৎসাহ প্রদান করে তেমনই অন্য দিকে ভারতীয় সঙ্গীতের ঐতিহ্যের বিভিন্নতাকে অনন্যতায় পরিপূর্ণ করে তোলে, যা মূলত যুগযুগান্তরে মৌখিক আকারে বিদ্যমান। সেই রকমই একটি লোকসঙ্গীতের উল্লেখ করা হল যা নিম্নরূপ-

সাগর নদী নিয়ে বন

কত সুন্দর সুন্দরবন

যত দিন যায় রূপ বদলায়

চির নূতন সুন্দরবন।

গরিব মানুষ আছে যারা

বাগদা ধরে খায় তারা

দেখো মা তুমি গঙ্গা দেবী

নিদয়া যেন হয়ো না কখন।[৯২]

(মূলত দীনদরিদ্র মানুষের আর্থিক সংকট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে গঙ্গা মায়ের প্রার্থনায় সৃষ্ট এই গান।)

সুন্দরবনের মানুষের জীবনের মান ও জীবিকা অনুসারে তার সমাজ ও সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। স্থান কাল ভেদে মানুষের সামজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার যথেষ্ট পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে

কারণে প্রাচ্য সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি কখনোই একে অপরের পরিপূরক নয়, বরং সম্পূর্ণ পৃথক। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সমাজতাত্ত্বিক আলোচনায় স্বাভাবিক ভাবেই তাদের বেশ কিছু আচার-অনুষ্ঠান, নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি কিংবা তাদের চিন্তা–চেতনার বিভিন্ন দিক, যে গুলোতে ঐশ্বরিক কল্পনা সর্বদাই গেঁথে রয়েছে এবং জল-জঙ্গল-জমি কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো (subsistence economy) তাদেরকে যে সংস্কারমূলক কাজ করতে উৎসাহিত করে, মৎস্যজীবীদের সঙ্গে আলাপচারিতায় পাওয়া তথ্যগুলোকে গবেষণা সন্দর্ভে তার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে মৎস্যজীবীদের সংস্কৃতির বেশ কিছু দিকের অন্বেষণ করা যেতে পারে বলে আমার মনে হয়। মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিশেষতঃ নিম্নরূপ পুজো গুলির প্রবর্তন আছে।

নৌকা বরণ পূজাঃ মৎস্যজীবীদের কাছে নৌকার পত্তনীপূজা হল নৌ-সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সাধারণ মানুষের কাছে নৌকা জলযান, কিন্তু জেলেদের কাছে তা দেবদেবীর প্রাধান্য পেয়ে থাকে। গৃহ নির্মাণের আগে যেমন ভিত পূজা করা হয় তেমনি নৌকা তৈরির পূর্বে পত্তনি পূজা হয়।[৯৩] পঞ্জিকাতে শুভদিন দেখে তবেই এই কাজ শুরু হয়। তার আগে নৌকার মাথার জন্য অর্থাৎ গলুইয়ের কাঠ কোনটা হবে তা স্থির করা হয়। এখানে পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। পূজার উপকরণ হিসেবে দেওয়া হয় একটা গামছা বা কাপড়, সঙ্গে ধূপ, দীপ, ফল, ফুল, দূর্বা, বাতাসা-সন্দেশ। পূজার দিন নৌকার যিনি কারিগর তিনি সঙ্গে থাকেন। পূজার শেষে মালিক নৌকার কারিগরকে, নতুন কাঁসার বা পেতলের কলসি বা নতুন কাপড় দিয়ে সম্মান জানায়। গলুইয়ের কাঠে একটা ছিদ্র করে তার মধ্যে সোনা, রুপোর স্পর্শ লাগিয়ে ছিদ্র বন্ধ করে দেওয়া হয়। সধবা মহিলারা শুদ্ধ হয়ে ঐদিন নতুন কাপড় পরে বরণডালা দিয়ে নৌকা বরণ করে।[৯৪] সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপগুলির সঙ্গে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম যেমন নৌকা, তেমনভাবে নদী-

সমুদ্র-জঙ্গলে মাছ-কাঠ-কাঁকড়া-মধু সংগ্রহ করার প্রধান মাধ্যম হল নৌকা। তাই নৌ-সংস্কৃতি নিয়ে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মধ্যে আদিকাল থেকেই নানা বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। কাকদ্বীপের ফটিকপুর গ্রামের কাঁকড়া শিকারির দেওয়া সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়— সুন্দরবনের জঙ্গল-খাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরতে যাওয়ার পূর্বে তারা গঙ্গাদেবীর থানে গিয়ে প্রথমে পূজা দেয়। তারপর নৌকায় ঘট রেখে গঙ্গা পূজা করে নৌকা যাত্রা শুরু করে।[৯৫] পাথরপ্রতিমার জি-প্লটের গোবর্ধনপুর গ্রামের মৎস্যজীবীর থেকে জানা জায়— তারা নদীতে মাছ ধরতে যাওয়ার পূর্বে এই গ্রামের জাগ্রত প্রাচীন দেবীপ্রতিমা বিশালক্ষ্মীর মন্দিরে পূজা দিয়ে তারপর নৌকাতে গঙ্গা পূজা করে যাত্রা শুরু করে।[৯৬] তাছাড়া এই এলাকার উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ গ্রামের প্রাচীন দেবতা 'বুড়োশিব' এর মন্দিরে পূজা দিয়ে তারপর মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে নৌকা নিয়ে যাত্রা শুরু করে। কথিত আছে 'বুড়াবুড়ি' অর্থাৎ 'শিব ও বিশালক্ষ্মী' নামানুসারে জি-প্লট অঞ্চলটির নাম 'বুড়াবুড়ির তট' হিসেবে পরিচিতি পেয়ে আসছে সুন্দরবনবাসীর কাছে।[৯৭]

হরির লুটঃ নৌকা যে দিন প্রথম জলে নামবে, সেই দিন এই অনুষ্ঠানটি করা হয়। গৃহদেবতার সামনে বা গৃহের মূল দরজার সামনে একটা কাঠের পিঁড়ি বসিয়ে তার উপর নতুন কাপড় রেখে তার উপর জলভর্তি মাটির বা পেতলের ঘট বসিয়ে তার মধ্যে আমের ডাল দিয়ে দেওয়া হয়। পরম্পরাগত ভাবে ত্রিনাথের পুজো করে থাকে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী পরিবারের লোকজনেরা। অনেক পরিবারে ঐদিন মাদক সেবনের ব্যবস্থাও হয়ে থাকে। পাথরপ্রতিমা এলাকার মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই ধরণের সংস্কার রয়েছে।[৯৮]

গলুই পূজাঃ নদীতে যেদিন যাত্রা শুরু হবে সেই দিন গলুই পূজা হয়। পুরোহিতের পরামর্শ মত নৌকাকে স্নান করানো হয়, তার পরে গলুইকে (অনেকে চণ্ডী বলে) গঙ্গার জল, ডাবের জল

দিয়ে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে দুধ ঢেলে সেখানে তেল-সিঁন্দুর মাখিয়ে দেওয়া হয়। এই গলুই পূজার সাথে ডালা পূজাও হয়ে থাকে। তারপরে পুরোহিত মাঙ্গলিক পূজা সম্পন্ন করে। মুম্বাই-এ সনকলি জেলে সম্প্রদায় যাত্রার আগে নৌকার গলুইতে একটা নারকেল ফাটায়। কর্ণাটকের মোগাভিরার জেলেরাও নৌকাকে স্নান করিয়ে, হলুদ মাখিয়ে নারকেল ফাটায়। অন্ধ্রপ্রদেশের জেলে মৎস্যজীবী সম্প্রদায় নদীতে যাওয়ার পূর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী জেলেদের মত আচার অনুষ্ঠান করে। মৎস্যজীবী পরিবারের পুরুষেরা যখন নদীতে বা সমুদ্রে থাকে কিংবা জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে যায় অথবা কাঠ-মধু সংগ্রহ করতে যায় সেই সময়ে গৃহের মহিলারা, ছেলেরাও বেশ কিছু নিয়ম কানুন মেনে চলে। মহিলারা কাপড় পরিষ্কার করা, মাথায় সিঁদুর দেওয়া, নখ-চুল কাটা এমনকি গৃহে সন্ধ্যা আরতি দেওয়াও বন্ধ রাখে। তাছাড়া এই সময়ে বিপদের আশঙ্কায় শঙ্কিত হলে তারা বিভিন্ন দেবদেবীর নামে পুজো দেওয়ার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ 'মুদো ধরা' নামক রীতি পালন করে।[৯৯] মৎস্যজীবীরা নদী থেকে ফিরে এসে মাছ বিক্রির অর্থ হাতে পাওয়ার পরে গঙ্গা দেবীকে সন্তুষ্ট করতে নানা উপকরণ সহযোগে গঙ্গাদেবীর পুজো করে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের রাক্ষসখালি দ্বীপের গোবিন্দপুর গ্রামের মৎস্যজীবী নমিতা দোলুইয়ের বক্তব্য— "নদী থেকে সব সময় তো বেশি বেশি মাছ পাওয়া যায় না। মা গঙ্গা তার কোলে সব মাছ নিয়ে বসে থাকে। তাই ধুমধাম করে গঙ্গা মায়ের পূজা দিলে তবেই তিনি সন্তুষ্ট হয়ে মাছেদেরকে নদীতে ছেড়ে দেন, তারপর আমরা আবার মাছ ধরতে পারি।"[১০০] সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের নৌকা সংস্কৃতি ও সমুদ্রে মৎস্য সংগ্রহ করতে যাওয়া প্রসঙ্গে বিকাশ রায়চৌধুরি লিখেছেন— "In the morning of the day of the voyage, five married women bring one baran dala to the river side. After this they smear the two ends of the boat with mustard oil and

sprinkle some water over it. It is a symbolic bathing ritual of the boat, the presiding deity of which is believed to be the female goddess Kastha Devi. Then the two ends of the boat are smeared with vermilion and garlanded. Somes paddy graing are strewn over it and turmeric mixed with water, thought to be auspicious and symbolically representing water mixed with gold and silver, each sprinkled with basil leaves and blades of grass. The married ladies then make some 'uludhwani' and perform a process of appeasing the deity (arati) with the earthen lamp. At the end of the ceremony, they salute the boat and sweets are distributed to all those who are present over there. This brings to the end of the boat worshipping ceremony."[১০১] তিনি আরও উল্লেখ করেছেন— সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে মাছ ধরার পূর্বে মাছের খুঁটি (fishing camp) নিয়েও তাদের মধ্যে পূজা-অর্চনার সংস্কার রয়েছে। তারা বিশ্বাস করে, প্রতিটি মৎস্যক্ষেত্রে একজন অধিপতি দেবতা রয়েছেন যা বিভিন্ন মৎস্যক্ষেত্রে বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন, বদর সাহেব (চট্টগ্রামের একজন মুসলিম পীর), ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালী এবং জম্বুদ্বীপে বন দেবী, সাগরদ্বীপে কপিল বাবা (মুনি), রসুলপুরে গাজী সাহেব (একজন মুসলিম পীর), দীঘা এলাকায় নয়া কালী ইত্যাদি। সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপে একদল বহরাদার মাছের খুঁটি তৈরি করেছিলেন। এই খুঁটি নির্মাণের পূর্বে, তীরে পৌঁছে জঙ্গলের বাইরে একটি গাছের নীচে এলাকার অধিপতি দেবতার নামে একটি মাটির পাত্র বসানো হয়। সেখানে বহরাদার নিজে মিষ্টি ও ফল দিয়ে প্রসন্ন হন। পাত্র ও গাছে সিঁদুর দিয়ে চিহ্নিত করে ধূপ

জ্বালানো হয়। সেখানে বহরদার মাথার চুল দান করেন। দলের অন্যান্য সদস্যরাও তাদের জীবনের নিরাপত্তার জন্য শপথ হিসাবে তাদের চুল দিতে পারে। অনুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা সবাই উপবাস থাকে। তাদের স্নান করার পর তারা সবাই সাতবার গাছের চারপাশে ঘুরে এবং তারপর বহরদার তাদের আগমনের প্রথম দিনে দলগুলোর পক্ষ থেকে কিছু আচার পালন করে। এটির সাথে ভালো মাছ ধরার কোনও সম্পর্ক নেই তবে এটি কেবল তাদের জীবনের সুরক্ষার জন্য করা হয়। এই অনুষ্ঠান করার আগে কেউ যেন তীরে কিছু না করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ও শেষে দলের সকল সদস্য সভাপতিত্বকারী দেবতার নামে পবিত্র স্লোগান তোলেন। অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টি ও অন্যান্য নৈবেদ্য সবার মাঝে বিতরণ করা হয় এবং মাঝে মাঝে কীর্তন গান গাওয়া হয়।[১০২] মৎস্যজীবীরা জাল তৈরির সময়ও কিছু আচার অনুষ্ঠান মেনে চলে, এরজন্য প্রথমে একটি অঞ্চল খুঁজে বের করতে অনেক অভিজ্ঞতা এবং পরিবেশের জ্ঞান প্রয়োজন হয়। যখন স্থান নির্বাচন করা হয় তখন নৌকা এবং জাল স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সহ তার সমস্ত জিনিসপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে শুদ্ধ করা হয়। এগুলি গঙ্গার মন্দিরের কাছে স্তূপীকৃত করে সেখানে ফুলের মিষ্টি দিয়ে পূজা করা হয় এবং বহরদার নিজেই ধূপ জ্বালান; সমস্ত মাছ ধরার সরঞ্জামে সিঁদুরের রেখা দেওয়া হয়, নৌকার দুই প্রান্তও সিঁদুর ও সরিষার তেল দিয়ে মাখানো হয়। মন্দিরে পূজার পর মাছ ধরার সরঞ্জামসহ সমস্ত আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে গঙ্গা, কাষ্ঠ দেবী, বান দেবী, কালী, গাজী ইত্যাদি নামে স্লোগান দিয়ে নৌকায় নিয়ে যাওয়া হয়। একজন সহকর্মী ধূপ জ্বালিয়ে এই জিনিসগুলিকে অনুসরণ করে। নৌকার কাছে পৌঁছে নৌকার মাথায় ও তাদের নিজেদের মাথায় পাঁচ-সাতবার জল ছিটিয়ে দেয় এবং তারপর সমস্ত জিনিসপত্র নৌকায় স্তূপ করে রাখা হয়। নৌকাযাত্রা শুরু হলে উপরে উল্লিখিত

দেবতাদের নামে আবার স্লোগান ওঠে। জাল ফেলার জন্য নির্বাচিত স্থানে পৌঁছালে মাঝিরা গঙ্গার নামে কিছু পুজোর জিনিস যেমন ফুলের মিষ্টি ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলে দেয়। মাঝি তার মুখ থেকে কিছু জল জালের খোলা প্রান্তে ছিটিয়ে দেয় যাতে জালের কোন ক্ষতি না হয়।[১০৩]

দেবদেবীর পূজা-অর্চনার পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের মন্ত্রতন্ত্রের প্রতিও আসক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। "ধীবরদের পেশাগত ঝুঁকি তাদের ভীষণভাবে অযৌক্তিক, অন্ধবিশ্বাসী করে তুলেছে। মাছ ধরার সময় তাদের নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হতে হয়। এই দুর্যোগের হাত থাকে মুক্তি পেতেই তাদের কুসংস্কারগ্রস্থ অযৌক্তিক বিশ্বাসে বিশ্বাসী হতে হয়েছে।"[১০৪] সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মধ্যে ভূত-প্রেত বিষয়ে ভূতশুদ্ধি, দেহশুদ্ধি, জলপড়া, হলুদবাণ, সরষেবাণ, ডাইনিখেকো প্রভৃতি মন্ত্র রয়েছে। অসুখবিসুখে বিশেষ করে জ্বর, গলাফুলা, শিশুদের শরীর খারাপ, প্লীহা ইত্যাদিতে তেলপড়া, সিন্দুরপড়া, নিমের পাতা পড়া, ঝাঁটার কাঠি পড়া প্রভৃতি মন্ত্র প্রচলিত রয়েছে। এই প্রসঙ্গে এখানে একটি মন্ত্রের উল্লেখ করা হল—

জলপড়া মন্ত্রঃ

জল জল জলেশ্বরী গঙ্গা ভাগীরথী

ভগীরথ গঙ্গা মর্তেতে সারথী

হস্তেতে করিয়া জল দিলাম উমুকের গায়ে

উমুকের ঘর ছাড়; দোর ছাড়, বেহালি স্বামীর কোল ছাড়।

আমার এই জল পড়া শিগ্‌গির লাগ

কার দোহাই? দেবী মা বনবিবির দোহাই লাগ..[১০৫]

বিভিন্ন লোকাচার ও লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের লোকজীবনের মূল ছন্দ। লোকসংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্রতকথা। এই ব্রতকথা মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ব্রত হল একধরণের নিয়ম-নীতি, তাছাড়া মৎস্যজীবীদের কাছে এই ব্রত, সংযম ও প্রার্থনা এই আচারের মধ্য দিয়ে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে নির্মিত শুদ্ধ একটি অনুষ্ঠান। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় এই ধরণের প্রথা বা অনুষ্ঠান সুদূর প্রাচীন সময়কাল থেকে চলে আসছে। সুন্দরবন অঞ্চলে প্রচলিত ব্রতগুলি হল— শীতলাব্রত, মাকালব্রত, শিবব্রত, ষষ্ঠীব্রত, আটেশ্বর ব্রত প্রভৃতি। এই ব্রত পালন ও উদযাপনের মধ্যেও মৎস্যজীবীদের নানান সংস্কার রয়েছে। পাথরপ্রতিমা ব্লকের বনশ্যামনগর গ্রামের মীন সংগ্রাহক কাকলি গিরির কাছ থেকে জানা যায়— এখানকার অনেক মহিলা তাদের স্বামী, পুত্র ও কন্যার মঙ্গল কামনায় শীতলাব্রত পালন করে। তার জন্য তারা পুজোর দিন সারাদিন উপোস করে সন্ধ্যায় পুজো দেয়, আবার অনেকের মানত থাকলে দণ্ডি কাটে। এরপর তারা মাথায় ও দুইহাতে মাটির সরা বসিয়ে তার মধ্যে আগুন ধরিয়ে হোমযোজ্ঞে অংশ নেয়।[১০৬] এই ভাবে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে লৌকিক জীবনচর্যার বাস্তব বিশ্বাস এখানকার লোকসংস্কৃতিকে একটা আলাদা মাত্রা দান করে। এই মাঙ্গলিক ব্রত প্রসঙ্গে নবনীতা বসু তাঁর ‘সংস্কৃতির অঙ্গনে সুন্দরবনে প্রচলিত ব্রত-পার্বন’ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন— “ব্রতের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ছড়া, কথা, গান, পালাগান, পাঁচালিগান ইত্যাদি। যারা ব্রত পালন করে তাদের বলা হয় ব্রতী (ব্রতিনী বা ব্রতচারীও বলা হয়)। পুরুষ ও নারী উভয়েই ব্রত পালন করে থাকে। তবে নারীরাই এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে। তাদের মনের কামনা-বাসনার রূপ চিত্রিত হয় ব্রতের ছড়ার মধ্যে। বাংলার ব্রতে কথাগুলির স্থানও গুরুত্বপূর্ণ। বাঙালির মন কল্পনা প্রিয়। কল্পনার জালে কথা গুলি বুনলেও এর মধ্য দিয়ে

সমাজ জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের চিত্র প্রকাশিত হয়। এগুলি আবার নৈতিক শিক্ষারও বাহক। সাধারণত ব্রতকথা ব্রতপালনের শেষে পাঠ করা হয়। নিকানো উঠোনে আল্পনা এঁকে প্রদীপ-ধূপ জ্বালিয়ে পবিত্র বস্ত্র পরিধান করে হাতে দূর্বা ও ফুল নিয়ে ভক্তি, তৃপ্তি ও সারল্য সহকারে নিষ্ঠাভরে ব্রতীরা ব্রতকথা শোনে। উদ্দেশ্য সমস্ত বরাভয় থেকে জগৎ সংসারকে রক্ষা ও তার মঙ্গল সাধন।”[১০৭]

দিন যাপনের অর্থনীতির সঙ্গে নিম্নবর্গের ভাষাগত একটি কাঠামো গড়ে ওঠে, যা সেখানকার সমাজ ও সংস্কৃতির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক বলা যেতে পারে। এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্য এখানকার মানুষকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে, এছাড়াও তাদের মধ্যে এলাকা ভিত্তিক একটা গোষ্ঠী কাঠামোর সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাই তাদের সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনার ক্ষেত্রে ভাষা বিশেষ ভাবে গুরুত্ব রাখে। সেই ভাষাগত কাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১। আমি সেটিনু আইলি অর্থাৎ, আমি সেখান থেকে এলাম।

২। কি পূজা হইতল অর্থাৎ, কি পূজা হয়েছিল।

৩। সে গাড়িয়া ধারে বুসিয়া আছে অর্থাৎ, সে পুকুর পাড়ে বসে আছে।

৪। সেঘরনু আইসা দাদু দরকে যাইছে অর্থাৎ, সেঘর থেকে এসে দাদুর বাড়ি গেছে।

৫। সে গাঙ ধারে জাল দ্যাটে অর্থাৎ, সে নদীর ধারে জাল দিচ্ছে। এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নবর্গের সমাজ সংস্কৃতি নির্মাণে ইতিহাস চর্চার ধারায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিশেষ। লোকসংস্কৃতির প্রথম পর্বই হল ভাষা। লোকজন যে ভাষায় কথা বলে সেটাই লোকভাষা। সুন্দরবনে যেহেতু বিভিন্ন জায়গার থেকে ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করছে, সেহেতু তাদের কথ্যভাষাও ভিন্ন

প্রকৃতির। ভাষার এই তারতম্য তাদেরকে সম্প্রদায়গত ভাবে পরিচিত হতে সাহায্য করে। যেমন- লেখ্য ভাষা-‘ছেলে’। কথ্যভাষা- পৌণ্ড্রদের-‘ছেলে’, মেদিনীপুরের-‘মদ্দটকা’, আদিবাসীদের-‘বাটা ছুয়া’, নমঃশূদ্রদের-‘হোলা’, মুসলমানদের-‘পোলা’।[১০৮] সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মধ্যে এই ধরণের বহু ভাষা মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে, যা তাদের সমাজ-সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এগুলির মধ্যে দিয়ে দিয়ে কথ্যভাষার বৈচিত্র্য যেমন বৃদ্ধি হয়েছে, তেমনই অন্যান্য অঞ্চলের ভাষার তুলনায় সুন্দরবনের কথ্যভাষার স্বাতন্ত্র্যও তৈরি হয়েছে বলা যেতে পারে। সুন্দরী বৃক্ষের নামেই গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের নাম সুন্দরবন; সুন্দরবনে বসবাসকারীগণ হল সুন্দরবনবাসী, সেক্ষেত্রে এই সুন্দরবনের ভাষা হল সুন্দরীভাষা। এই ভাষাতেই মৎস্যজীবীরা তাদের ঐতিহ্যগত সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে চলেছে। প্রসঙ্গক্রমে দুই মৎস্যজীবীর কথোপকথনের একটা ব্যবহারিক পর্যবেক্ষণ নিম্নে আলোচনা করা হল[১০৯]—

ঝন্টু দাস- এগনে জালে যাবু? (এবার নৌকাতে মাছ ধরতে যাবি?)

গণেশ বাড়ুই- না, যাবানি। (না, যাব না।)

ঝন্টু দাস- কেনিরে, এগনে তোনকের কি বেশি মাছ হয়নি? (এবার তোদের কি বেশি মাছ ধরা পড়েনি?)

গণেশ বাড়ুই- নদীতে বেশি ঢেউ থেইলা, নিচে যাইতে পারিনি। (নদীতে বেশি ঢেউ ছিল, গভীর সমুদ্রে যেতে পারিনি।

মৎস্যজীবীদের দৈনন্দিন এই জীবনযাপনের ভাষাই তাদের মাতৃভাষা। এই ভাষাই তাদের আঞ্চলিকতার স্বাতন্ত্র্যতা বজায় রাখে।

পরিশেষে এই আলোচনা করে ইতি টানা যেতে পারে যে, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সমাজ-সংস্কৃতিতে লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে লোক-চিকিৎসার বিশেষ অবদান দেখা যায়। এখানে পীর, ফকির ও ওঝারা মৎস্যজীবীদের প্রধান নিয়ন্ত্রক বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আধুনিক চিকিৎসাকে উপেক্ষা করে তারা ধুলোপড়া, জলপড়া, তেলপড়া, শেকড়বাকড়, মন্ত্র ইত্যাদির প্রতি বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।[১১০] লোকচিকিৎসায় ক্ষত, সাপের কামড়, চোখের অসুখ, দাঁতের যন্ত্রণা, চর্মরোগ, জ্বর, মাথাব্যাথা, স্নায়ুরোগ ইত্যাদি নিরাময়ে সুন্দরবনে পীরগাজীর ভূমিকা প্রশংসনীয়।[১১১] তাছাড়া গুনিনের প্রতিও এদের অগাধ আস্থা দেখা যায়। গুনিন নানারকম মন্ত্র ও টোটকা জানে, যেকারণে বিপদে পড়লে মানুষদেরকে এদের কাছে যেতে দেখা যায়। বিপদে আপদে এরাই মৎস্যজীবীদের ভরসা। প্রাচীন শাস্ত্রে লোকঔষধ-লোকচিকিৎসা-লোকচিকিৎসক প্রভৃতি শব্দগুলির প্রত্যক্ষ ব্যবহার না থাকলেও বর্তমানের ইতিহাস চর্চায়, প্রাসঙ্গিকতার প্রয়োগ-বৈচিত্র্যে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। যদিও ভয়-নিরাপত্তাহীনতার কারণে দেবতাদের সম্মান করা হয়, তাহলে অসংখ্য পীর, ফকির, ওঝা ও গুনিনদের উল্লেখ করতে পারি যারা লোক ওষুধের সাহায্যে তাদের নিরাময় ক্ষমতার দ্বারা সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে দেবত্ব ও সম্মান অর্জন করেছে। ঐতিহ্যগত ঔষধ হল বিভিন্ন সংস্কৃতির আদিবাসী তত্ত্ব বিশ্বাস এবং অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে জ্ঞানের দক্ষতা এবং অনুশীলনের সমষ্টি যা স্বাস্থ্যের রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতার প্রতিরোধ নির্ণয়ের উন্নতি বা চিকিৎসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে বা ব্যবহার করা নাও যেতে পারে।[১১২] সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা তাদের নানান সমস্যা নিরসনে, বিপদ-আপদ দূরীকরণের জন্য ওঝা-গুনিনের শরণাপন্ন হয়। অতীত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত যে বিষয়গুলির সমস্যা সমাধানের জন্য ওঝা-গুনিন ডাকা হত সেগুলি

হল— রোগ নিরাময়, ক্ষত চিকিৎসা, পাগলের চিকিৎসা, সর্পদংশনের প্রতিকার, জন্মনিরোধ ও জন্মনিয়ন্ত্রণ, বন্ধ্যাত্ব, চুরি, বাস্তুশুদ্ধি, নতুন গৃহনির্মাণ, মউলে-বাউলে-কাঠুরে-শিকারিদের বিপদ-আপদ, দৈব অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ঘটনার প্রতিকার, ভূত-প্রেত, দুষ্টআত্মা, অপদেবতা ও দুষ্টশক্তি বিতাড়ন।[১১৩] গুনিনরা তাদের ব্যবহৃত মন্ত্রশক্তির সাথে বিভিন্ন উপাদানও ব্যবহার করে থাকে। যেমন— ভূতে পাওয়া রোগীকে হলুদ পুড়িয়ে নাকে ধরা হয় এবং ঝাঁটা দিয়ে প্রহার করা হয়। সাপে কাটা রোগীকে কাঁচা দুধ, শ্বেত আকন্দর আঠা, কলমি শাকের রস ইত্যাদি খওয়ানো হয়।[১১৪] সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা যে সবসময় ওঝা, গুনিন ও বদ্যির শরণাপন্ন হয়ে থাকে তা কিন্তু নয়। রোগনিরাময়ের জন্য মৎস্যজীবীরা বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে। সবসময় লোনা জলের মধ্যে থাকতে থাকতে দেহের নানান জায়গায় ক্ষত ও দগদগে ঘা হয়, এর থেকে মুক্তি পেতে তখন তারা নিমের পাতা, ফিটকিরি ও হলুদ একসঙ্গে বেটে ক্ষতস্থানে ব্যবহার করে।[১১৫]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে দীর্ঘ ৭৬ বছর পেরিয়ে এসেও এই একবিংশ শতাব্দীর সুন্দরবনে প্রান্তিক মানুষের জীবন চর্যায় সেভাবে শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। সুন্দরবনের ভৌগোলিক অবস্থার কারণে এই অঞ্চলের নিম্নবর্গীয় মানুষেরা মৎস্যচাষ ও মাছ ধরাকে প্রধান পেশা হিসেবে গণ্য করেছিল। পেশাগত কারণে দেশভাগের পূর্বে শিক্ষার দিক থেকে মৎস্যজীবী সমাজ পিছিয়ে ছিল। তাছাড়া নিম্নবর্গীয় মৎস্যজীবী সমাজের ধারণাই ছিল শিক্ষা কেবলমাত্র উচ্চবর্ণের মানুষদের জন্য। শিক্ষার উন্নতি নির্ভর করে সামাজিক কাঠামো, মানসিকতা ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। তবে স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়।

Rate of Development of Literacy Rate among Certain Fishermen Castes of West Bengal

Caste	1961	1971	1981	1991
General	29.58	33.20	40.94	57.69
Sc	13.58	17.80	24.37	42.21
Bagdi	8.74	10.79	13.96	30.02
Rajbanshi	14.75	17.56	24.65	40.72
Namashudra	21.03	26.86	36.87	56.18
Poundra	26.68	27.31	36.49	56.05
Jelia Kaibartya	17.95	20.47	30.18	49.31
Jhalo Malo	14.50	19.18	25.51	42.52
Doai	6.23	17.32	22.55	37.12
Bind	6.57	10.86	20.76	20.27
Keot	13.81	16.56	23.21	41.76
Patni	16.19	18.93	25.44	49.40
Tiyar	8.06	20.40	25.33	45.16
Gonri	5.64	18.61	25.21	37.87

Source: Census of India, 1961, 1971, 1981, 1991

উল্লিখিত তালিকাতে স্বাধীনোত্তর পর্বে ১৯৬১-১৯৯১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষার হারকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জাতিগত দিক থেকে মৎস্যজীবীরা অনেক পিছিয়ে ছিল। যদিও বাগদি, বিন্দ, তিয়র, কেওট, প্রভৃতিদের তুলনায় রাজবংশী, নমঃশূদ্র, পৌন্ড্র, মালো ও জেলে কৈবর্তদের শিক্ষার হার অনেকটা এগিয়ে। ১৯৬১-১৯৯১ সাল পর্যন্ত সাধারণের শিক্ষার হার যে হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, সেভাবে মৎস্যজীবীদের শিক্ষার হার সাধারণের স্তরে উন্নীত হতে

পারেনি। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের বর্তমান প্রজন্ম শিক্ষার সুযোগ পেলেও উচ্চশিক্ষার দিকে এগোনোর প্রচেষ্টা সেভাবে দেখা যায় না। তবে ২০১১ জনগণনার তথ্যের মূল্যায়নে দেখা যায় সুন্দরবনের বর্তমান শিক্ষার হার বেড়ে ৬৪.৩০ শতাংশ হয়েছে।[১১৬]

আধুনিক সভ্যতার ছোঁয়া সুন্দরবনের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। মৎস্যজীবীদের সমাজ-সংস্কৃতিতে এর প্রভাব পড়েছে। সংস্কৃতি হল একটা গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের বেঁচে থাকার মূল মন্ত্র। সুন্দরবনের সকল মৎস্যজীবী মানুষজন তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাটিকে বজায় রেখে তাদের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। সুন্দরবনের বিভিন্ন উৎসবে মৎস্যজীবী মানুষের সম্মিলিত উপস্থিতি তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে সাহায্য করে। কিন্তু সেক্ষেত্রে দেখা যায় এই আধুনিক সভ্যতার প্রভাব নবীন প্রজন্মকে প্রথাগত আচার থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের মধ্যে প্রচলিত শীতলার জাগরণ গান, মনসার ভাসান গান, নৌকার গান, জঙ্গলের গান প্রভৃতি হয়তো আগামী দিনে ইতিহাস চর্চার বিষয় হয়ে যাবে।

সূত্রনির্দেশ

১। Frederick Eden Pargiter, A Revenue History of the Sundarbans, (from 1765-1870), vol-I (Alipore: Bengal Government Press, 1934.), Pp-2-5.

২। Sutapa Chatterjee Sarkar, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals (New Delhi: Orient Blackswam, 2010), P-56.

৩। Frederick Eden Pargiter, প্রাগুক্ত, পৃ-৩।

৪। Ibid, P-2.

৫। Ibid, P-2.

৬। Ibid, P-2.

৭। Ibid, P-29.

৮। স্বপনকুমার মণ্ডল, আঠারোভাটির ইতিকথা (কলকাতাঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০২১), পৃ-৩৯।

৯। Frederick Eden Pargiter, প্রাগুক্ত, পৃ-২৯।

১০। Frederick Eden Pargiter, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৩।

১১। অতুল চন্দ্র রায় এবং প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস (কলকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরী, ২০০৭), পৃ-৩৫৫।

১২। Frederick Eden Pargiter, প্রাগুক্ত, পৃ-৬।

১৩। L. S. S. O’Malley, Bengal District Gazetteers- 24-Parganas (Calcutta: Government of West Bengal, 1998), P-231.

১৪। Ibid, Pp-231-232.

১৫। Frederick Eden Pargiter, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪।

১৬। Frederick Eden Pargiter, প্রাগুক্ত, পৃ-৭০।

১৭। গোকুল চন্দ্র দাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত (কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১), পৃ- ১৪৭।

১৮। স্বপনকুমার মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৩৬-৩৭।

১৯। সাগর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ চব্বিশ-পরগণা ও প্রত্নতত্ত্ব একটি রূপরেখা, তারাপদ ঘোষ, (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা (কলকাতাঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬), পৃ-২৩।

২০। Imperial Gazetteer of India: Provincial Series, Bengal, Vol-I (Calcutta: Superentendent of Government Printing, 1909), P-357. এই বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য- L. S. S. O’Malley, Bengal District Gazetteers- 24-Parganas (Calcutta: Government of West Bengal, 1998), P-57.

২১। কমল চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত (কলিকাতাঃ মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭), পৃ-৮।

২২। তদেব, পৃ-১।

২৩। স্বপনকুমার মণ্ডল, সুন্দরবনের জমিদারদের সাকিন ঠিকানা, স্বপনকুমার মণ্ডল (সম্পা.), দক্ষিণের সাঁকো পত্রিকা, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক ত্রৈমাসিক, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, নোয়াপাড়া, সুকান্ত সরণি, সোনারপুর, ২০১৬, পৃ-২৩। এই বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্যঃ- স্বপনকুমার মণ্ডল, আঠারোভাটির ইতিকথা (কলকাতাঃ অনন্যা প্রকাশনী, ২০২১), পৃ-১২৩।

২৪। Frederick Eden Pargiter, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৬৩-৬৪।

২৫। স্বপনকুমার মণ্ডল, আঠারোভাটির ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃ-৬০।

২৬। L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers- 24-Parganas (Calcutta: Government of West Bengal, 1998), P-234.

২৭। সন্তোষ কুমার বর্মন, আদি সুন্দরবনের ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি, লোনা মাটির মিঠে কথা, কলকাতা, ২০১৩, পৃ-১৪।

২৮। স্বপনকুমার মণ্ডল, আঠারোভাটির ইতিকথা, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-১০২, ১২৮।

২৯। অশোক কুমার পাত্র, প্রতিমা কথা কয় (বারুইপুরঃ চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স পাব্লিকেশন, ২০২১), পৃ-১১।

৩০। কুমুদরঞ্জন নস্কর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলে সংখ্যা (কলকাতাঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬), পৃপৃ- ৪১৩-৪১৪।

৩১। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্টক্যানিং (কলকাতাঃ লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭), পৃ-৫৬।

৩২। স্বপনকুমার মণ্ডল, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৬।

৩৩। L. S. S. O'Malley, প্রাগুক্ত, পৃপৃ- ২২৩-২২৫।

৩৪। গোকুলচন্দ্র দাস, ঔপনিবেশিক আমলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ভূমিব্যবস্থার বিকাশ, তারাপদ ঘোষ, (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-১২৭।

৩৫। তুষার কাঞ্জিলাল, সুন্দরবনের নদীবাঁধের সমস্যা, দেবপ্রসাদ জানা, (সম্পা.), শ্রীখণ্ড সুন্দরবন (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ-১২৯।

৩৬। কমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-১০,

৩৭। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন (কলকাতাঃ লোক, ২০১৩), পৃ-১৩।

৩৮। এ এফ এম আব্দুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), সুন্দরবন অতীত ও বর্তমান (ঢাকাঃ আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১৪), পৃ-১।

৩৯। কুমুদরঞ্জন নস্কর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, তারাপদ ঘোষ, (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৮।

৪০। গোকুল চন্দ্র দাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৯।

৪১। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস (কলকাতাঃ পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, ২০১৭), পৃ-৩৫।

৪২। Imperial Gazetteer of India: Provincial Series, Bengal, Vol-I (Calcutta: Superentendent of Government Printing, 1909), P-371.

৪৩। কমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৫।

৪৪। কানাইলাল সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬।

৪৫। কমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৬।

৪৬। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (একখণ্ডে), (গড়িয়াঃ মাস এন্টার্টেন্মেন্ট্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০), পৃ-৬৯৫।

৪৭। Joya Chatterjee, The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-1967 (New Delhi: Cambridge University Press, 2007), P-112.

৪৮। Biswajit Chatterjee and Debi Chatterjee (eds): Dalit Lives and Dalit Visions in Eastern India (Kolkata: Centre for Rural Resource, 2007), P-109.

৪৯। Census of India, 1951, Annex Building, Alipore, Kolkata.

৫০। Census of India, 1951, Annex Building, Alipore, Kolkata.

৫১। Barun De, West Bengal District Gazetteers-South 24 Parganas, Government of West Bengal, March, 1994.

৫২। Report of Fisheries Department, District Magistrate, South 24 Parganas, Office of B. D. O, Patharpratima.

৫৩। যুগান্তর, ১৬ই মে, ১৯৬৪, পৃ-৩।

৫৪। সুভাষ মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪।

৫৫। ডাঃ গৌতম কুমার দাস, সুন্দরবনের জলবায়ু, প্রকৃতি ও পরিসংখ্যান, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.) নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র ,তৃতীয় সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০০৩), পৃ-৪

৫৬। W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal-Districts of the 24 Parganas and Sundarbans, Vol.I (London: Trubner & Co, 1875), P-303.

৫৭। Ibid, Pp-304-308.

৫৮। সুভাষ মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৭।

৫৯। Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal, www.sundarbanaffairswb.in/home, Last visited- 07/02/2022.

৬০। কুমুদরঞ্জন নস্কর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, তারাপদ ঘোষ, (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-৪০৭।

৬১। বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতাঃ ছোঁয়া, ২০২০), পৃ-৮৬০।

৬২। কমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৩৯০-৩৯১।

৬৩। তদেব, পৃ-৩৯৩।

৬৪। গৌতম কুমার দাস, কথা সুন্দরবন (কলকাতাঃ সোপান, ২০১৮), পৃ-৫।

৬৫। B. C. Sharma, Lower Sundarban: Role of Fisheries in Its Sustainable Development (Calcutta: The Asiatic Society, 1994), P-13.

৬৬। Anuradha Banerjee, Environment Population and Human Settlements of Sundarban Delta (New Delhi: Concept Publishing Company, 1998), P-74.

৬৭। ডাঃ গৌতম কুমার দাস, সুন্দরবনের জলবায়ু, প্রকৃতি ও পরিসংখ্যান, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), বিমলেন্দু হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ-৩।

৬৮। সুকুমার সিং, প্রাগুক্ত, পৃ-৭২৩।

৬৯। ডাঃ গৌতম কুমার দাস, সুন্দরবনের জলবায়ু, প্রকৃতি ও পরিসংখ্যান, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-৫।

৭০। কমল চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৩৯৫-৩৯৬।

৭১। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৫।

৭২। পূর্ণেন্দু ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৮৬-৮৭।

৭৩। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত কথা, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, বিংশ সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০১৭), পৃ-৫৬।

৭৪। Rup Kumar Barman, Fisheries and Fishermen: A Socio-economic History of Fiseries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-colonial West Bengal (Delhi: Abhijeet Publications, 2008), P-13.

৭৫। W. W. Hunter, প্রাগুক্ত, পৃ-৩১৭।

৭৬। তদেব, পৃ-৩১৭।

৭৭। L. S. S. O’Malley, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮।

৭৮। W. W. Hunter, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৩১৭-৩১৯।

৭৯। কুমুদরঞ্জন নস্কর, সুন্দরবন প্রকৃতি পরিচিতি ও সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, দেবপ্রসাদ জানা, (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-১৫৯।

৮০। জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, জনগণনায় ভারতীয় সুন্দরবন, বরেন্দু মণ্ডল, (সম্পা.), দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতাঃ ছোঁয়া, ২০২০), পৃ- ৮৬০।

৮১। Bikash Raychaudhuri, The Moon and Net: Study of a Transient Community of Fishermen at Jambudwip (Calcutta: Anthropological Survey of India, 1980), P-112.

৮২। Haraprasad Chattopadhyaya, The Mystery of the Sundarbans (Calcutta: A Mukherjee & Co PVT Ltd, 1999), P-143.

৮৩। অলক মণ্ডল, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি, নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা.), সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, একাদশ বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা, ২০১০, পৃ-২৫১।

৮৪। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা (কলিকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬), পৃ-৭।

৮৫। ধূর্জটি নস্কর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার লৌকিক দেবদেবী-বিবিগাজী-পীরপীরানী ও লোকসমাজ, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬, পৃ-২০৯।

৮৬। ধূর্জটি নস্কর, সুন্দরবনের গ্রামদেবতা ও সর্বজনীন মেলা— মহোৎসব, দেবপ্রসাদ জানা (সম্পা.), শ্রীখন্ড সুন্দরবন (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ-৪৮৮।

৮৭। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-১৪৯-১৫১।

৮৮। ডাঃ নির্মলেন্দু দাস, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি (কলকাতাঃ জ্ঞান প্রকাশন, ১৯৯৬), পৃপৃ-৫৮-৫৯।

৮৯। কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগণাঃ উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯), পৃ-৫১৫।

৯০। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-১-২।

৯১। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০০৬), পৃপৃ-৮৩,৯১।

৯২। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৯৫-৯৬।

৯৩। দেবব্রত নস্কর, নৌ ও সুন্দরবনের নৌসংস্কৃতি, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতাঃ ছোঁয়া, ২০২০), পৃ-৫৩১।

৯৪। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ২০০৮), পৃ-১০৩।

৯৫। সাক্ষাৎকার, নাম- ভোলানাথ চেড়, পিতা- ভক্তি চেড়, বয়স-৩৮, পেশা- কাঁকড়া শিকারি, গ্রাম- ফটিকপুর, থানা- কাকদ্বীপ, তারিখ- ২১/০৩/২০২২।

৯৬। সাক্ষাৎকার, নাম- পুণ্য দাস, পিতা- গৌরহরি দাস, বয়স-৫১, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- গোবর্ধনপুর, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, তারিখ- ০৩/০১/২০২২।

৯৭। সাক্ষাৎকার, নাম- গণেশ মণ্ডল, পিতা- সুশান্ত মণ্ডল, বয়স-৩৮, পেশা- দোন শিকারি, গ্রাম- উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, তারিখ- ১৬/০২/২০২২।

৯৮। সাক্ষাৎকার, নাম- মনোরঞ্জন শাসমল, পিতা- নিরঞ্জন শাসমল, বয়স- ৫০, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- কামদেবনগর, থানা-পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৫/০৪/২২।

৯৯। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-১০৫-১০৬।

১০০। সাক্ষাৎকার, নাম- নমিতা দোলুই, স্বামী- মহাদেব দোলুই, বয়স- ৪৭, পেশা- মাছ ও কাঁকড়া শিকারি, গ্রাম- গোবিন্দপুর আবাদ, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৮/০৯/২২।

১০১। Bikash Raychaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃ-১১৮।

১০২। Bikash Raychaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-১২০-১২১।

১০৩। Bikash Raychaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃ-১২৫।

১০৪। সূর্য্যেন্দু দে, মাছ জল মৎস্যজীবী (কলকাতাঃ গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, ১৪২৪), পৃ-১৮২।

১০৫। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪১।

১০৬। সাক্ষাৎকার, নাম- কাকলি গিরি, স্বামী- আশিস গিরি, বয়স- ৩৯, পেশা- মীন সংগ্রাহক, গ্রাম- বনশ্যামনগর, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৭/০৬/২০২১।

১০৭। নবনীতা বসু, সংস্কৃতির অঙ্গনে সুন্দরবনে প্রচলিত ব্রত-পার্বন, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি, নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা.), সমকালের জিয়নকাঠি, সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, একাদশ বর্ষ যুগ্ম সংখ্যা, ২০১০, পৃ-১৪০।

১০৮। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত কথা, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, বিংশ সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০১৭), পৃ-৫৮।

১০৯। সাক্ষাৎকার, নাম- ঝন্টু দাস, পিতা- নিতাই দাস, বয়স-৪১, পেশা- সামুদ্রিক মৎস্যজীবী, গ্রাম- উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল। নাম- গণেশ বাড়ুই, পিতা- নারায়ণ বাড়ুই, বয়স- ৪২, পেশা- সামুদ্রিক মৎস্যজীবী, গ্রাম- দাসপুর, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, তারিখ- ০৯/০৭/২২।

১১০। Mahua Sarkar, Social Systems, Science and the Indigenous Beliefs: A Case Study of the People of the Sundarbans in Contemporary West Bengal, Mahua Sarkar and Amit Bhattacharyya (Ed.), History and the Changing Horizon: Science, Environment and Social Systems (Kolkata: Setu Prakashani, 2014), P-122.

১১১। Ibid, P-123

১১২। Ibid, P-121

১১৩। বিমলেন্দু হালদার, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ওঝা-গুনিনঃ জীবন, জীবিকা ও মন্ত্র-সংস্কৃতি, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০১০), পৃপৃ-৫১-৫২।

১১৪। বিমলেন্দু হালদার, ওঝা-গুণিনের গুপ্তবিদ্যা ও অনিষ্টকারী মন্ত্রের প্রয়োগঃ সুন্দরবনের 'ভারা মন্ত্র' ও 'বোকোস মন্ত্র', বিমলেন্দু হালদার (সম্পা), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, তৃতীয় সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০০৮), পৃ-৮২।

১১৫। ডাঃ প্রদীপ মণ্ডল, লোকঔষধঃ ভেষজ ও গুনাগুন, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, অষ্টম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, ২০১১, পৃ-৪৯।

১১৬। Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal, www.sundarbanaffairswb.in, last visited -03/06/2022.

দ্বিতীয় অধ্যায়

সরকারি বিভিন্ন প্রকল্প ও মৎস্যজীবীদের অবস্থান

'মাছে-ভাতে বাঙালি'— এই প্রবাদের সত্যতা বাংলার শিল্প-সংস্কৃতি-কৃষ্টিতে যেমন রয়েছে তেমনই লোকগাথার অন্দরমহলেও সর্বদা বিরাজমান। শুধু একটু আঁশটে গন্ধ না হলে যে বাঙালিদের রোজকার খাওয়ার পর্বটি সঠিক ভাবে সম্পন্ন হয়না তা নয়, মাছ ছাড়া বাঙালি কোন আনন্দ অনুষ্ঠানের কথা ভাবতেই পারে না। পশ্চিমবঙ্গের নদী-নালা-খাল-বিল-জলাশয়, ভেড়ি/হ্যাচারি ও সমুদ্র থেকে উৎপাদিত মাছ সমাজবন্ধু মৎস্যজীবীরাই মৎস্যপ্রিয় মানুষের পাতে এনে দেয়। পশ্চিমবাংলায় মাছের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫৭র দশকে বাঙালি মৎস্য বিজ্ঞানী ডঃ হীরালাল চৌধুরী প্রণোদিত প্রজনন (Induced Breeding Methods) পদ্ধতির মাধ্যমে কৃত্রিম মৎস্য উৎপাদনে যুগান্তর আনেন, যা বাঙালির মাছের চাহিদা অনেকটা পূরণ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র জনসংখ্যার ২২,১২,০১৯ জন মৎস্যজীবী।[১] কেবলমাত্র সুন্দরবনে ৪,১৭,৯৭০ জন মৎস্যজীবী রয়েছে।[২] যারা কঠোর সংগ্রাম করে সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশে থেকে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করছে এবং নদী-ভেড়ি-সমুদ্র থেকে উৎপাদিত মৎস্য দিয়ে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলে-মৎস্যজীবী নিয়ে উন্নয়ন ভাবনা হলেও ১৯৭৩ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ গঠিত হওয়ার পর থেকে সুন্দরবনকে নিয়ে আলাদা করে ভাবনাচিন্তা শুরু হয়েছিল। এই উন্নয়নের পরিকাঠামোতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ প্রচেষ্টা দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব

দিয়ে থাকে। আলোচ্য অধ্যায়ে সুন্দরবনের উন্নয়নে সরকার ও সরকারি বিভিন্ন দপ্তর কিভাবে তাদের ইতিবাচক পদক্ষেপের দ্বারা সুন্দরবনের উন্নয়ন কাঠামো সুসংগঠিত করে ছিল সেই বিষয়ের উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হবে। দেখানোর চেষ্টা করা হবে ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবনযাপনে সরকারি প্রকল্পগুলি কতটা কার্যকরী ভূমিকা গড়ে তুলেছিল।

পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য সংকট প্রশমিত করার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কোন আইন ছিল না। সেক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য চাষের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। স্বাধীনতার পরপরই মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কোন পরিকল্পনা ছিল না, তখন রাজ্য সরকার উদ্বাস্তু এবং রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে বেশি চিন্তিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের আকস্মিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে তৈরি হওয়া খাদ্যের ঘাটতির বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব ছিল না, যেকারণে সরকার খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 'গ্রো মোর ফুড ক্যাম্পেন' (১৯৪৮-৪৯) নীতি গ্রহণ করে ছিল।[৩] পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৪৮-৫২ সালের মধ্যে এই নীতির মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করে ছিল— যেমন, (i) "Development of beel fishery (ii) Running of demonstration salt-water bheri, bhasabada fishery (iii) Exploitation of foreshore and offshore fisheries and Contai coast (iv) Distribution of capital goods among the needy fishermen (v) Development of tank fishery (vi) Unionwari tank fishery development (vii) Production of shark liver oil, fish meal, processed fish and utilization of other fish by-products (viii) Improvement of method of transport of fish from the

estuarine area to the market and (ix) Improvement of the tank fishery in the dry districts of the state."[8] ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সালের মধ্যে এই চার বছরে ১০,০০,০০০ মণ মাছের উৎপাদনের জন্য এই প্রকল্পে খরচ হয়েছিল ৮৫,৫৫,৭০০ টাকা।[৫] এই প্রকল্পে আশাপ্রদভাবে কোন ভালো ফলাফল পাওয়া যায়নি। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এই পরিকল্পনা অবাস্তব বলে মনে করা হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্প বাদ দেওয়া হয়েছিল। কেননা "scheme i, ii and iii were found unrealistic to increase the fish production and were eventually dropped. Scheme iv designed with a view to distribute capital goods to the needy fishermen was very much unsatisfactory. Out of total Rs. 13,25,000 of plan provision Rs. 49,440 had been utilized. Other schemes were also unsatisfactory and could not reach to target."[৬]

১৯৫২ সালে পরিকল্পিত অর্থনীতি সূচনার সাথে ভারতবর্ষ উন্নয়নের একটি নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সময়কালে ১৯৫১-৫২ থেকে ১৯৫৫-৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য উন্নয়নের জন্য ১৫৪.৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার সময়কালে মোট নয়টি স্কীম নেওয়া হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা, বিলে মাছ চাষের উন্নয়ন, ইউনিয়নওয়ারী ট্যাঙ্ক ফিশারি উন্নয়ন, ট্যাঙ্ক ফিশারি উন্নয়ন প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নতিতে ৬০.৭৭ লক্ষ, ২৭.১১ লক্ষ, ২২.৮০ লক্ষ এবং ২৫ লক্ষ টাকা উক্ত পরিকল্পনাগুলির জন্য ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল।[৭] দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে ১৯৫৬-৫৭ থেকে ১৯৬০-৬১ সালে মৎস্য উন্নয়নের জন্য ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনার আওতায় গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা এবং অভ্যন্তরীণ মৎস্য চাষের অবস্থার উন্নতির জন্য

ঋণের উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া এই পরিকল্পনায় দেশিয় মাছ ধরার কারুশিল্পের যান্ত্রিকীকরণের কথা আলোচিত হয়েছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫-৬৬ সময়কালে পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য চাষের জন্য ২০৪.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়। তৃতীয় পরিকল্পনার সময় ২৩ টি স্কীম নেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে ৯ টি স্কীম ছিল দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ধারাবাহিকতা। এই পরিকল্পনায় মৎস্যজীবীদের সমবায়, খামার ও সমবায় মৎস্য খামার প্রভৃতির প্রতি নজর দেওয়া হয়েছিল। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৬৯-৭০ থেকে ১৯৭৩-৭৪ সালে রাজ্যের মৎস্য সংকট নিরসনে ও মৎস্য চাষ উন্নয়নে ২৯৫.২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এই সময়ে বেশ কয়েকটি নতুন স্কীম গৃহীত হয়েছিল, যেমন— পরিত্যক্ত মৎস্য চাষের উন্নয়ন, মৎস্য চাষের নিবিড় উন্নয়ন, মৎস্য বীজ খামার স্থাপন, দরিদ্র মৎস্যজীবীদের সহায়তা দান এবং রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগম স্থাপন।[৮]

১৯৬০ এর দশকে কলকাতায় লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রত্যহ ৬,৮৫০ মণ মাছ লাগত।[৯] পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থান থেকে কলকাতায় মৎস্য আমদানি হত। ১৯৫৯ সালে কলকাতায় আসতো ২,৭৬,৫৭৩ মণ মাছ। ১৯৬০ সালে তা বেড়ে হয় ২,৯৬,২৫৬ মণ। ১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে এই মাছের পরিমাণ ছিল ২,৮৯,৬৯২ মণ। আবার ১৯৬৩ সালে সরবরাহ মাছের পরিমাণে কমে গিয়ে হয় ২,২৮,৩৬৫ মণ।[১০] মাছের যা চাহিদা তার তুলনায় আমদানি খুবই কম ছিল। এই অভাব পূরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজ উদ্যোগে ৭,৯৩৮ বিঘা জলাশয়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করেন। পরে আরও ১৪,৩৫০ বিঘা জলাশয়ে পূর্বোক্ত প্রকল্প সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। উন্নত ধরণের মৎস্য বীজ ও চারা পোনা উৎপাদনের

জন্য দার্জিলিং ব্যতীত রাজ্যের সমস্ত জেলায় উক্ত প্রকল্প চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। Development of Sundarban Areas- The Minister for Development and Planning চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে দুইটি প্রকল্প কার্যকরী করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। প্রথম পরিকল্পনাটি ছিল— প্রথম পর্যায়ে সুন্দরবন ব-দ্বীপ প্রকল্প। উক্ত প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ১২ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের রূপায়ণ সুনিশ্চিত হলে আনুমানিক ১২৫,০০০ একর চাষযোগ্য জমি ও ৭০৫০ একর মৎস্য চাষের জলাভূমি পাওয়া যাবে।[১১] দ্বিতীয় প্রকল্পটি ছিল— সাগরদ্বীপের খাঁড়ি বন্ধন। উক্ত প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, এই প্রকল্প রূপায়ণে ৬৪,৬৪০ একর চাষের জমি উপকৃত হবে।[১২] ১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নতি কল্পে ৪,৩২,৬৯,৩৬২ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।[১৩] এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে ১৯৬২-৬৬ সালে সুন্দরবনবাসীর নানা দিকের উন্নতি হয়েছিল। মোট অর্থ দিয়ে সেচ ও জলপথ খাতে ব্যয় হয়েছিল ৩,০৬,৫৩,০০০ টাকা, পশু চিকিৎসা খাতে ব্যয় হয়েছিল ১,৫২,৯২৪ টাকা, রাস্তা খাতে ব্যয় হয় ৭৪,২,০০০ টাকা এবং চিকিৎসা-স্বাস্থ্য ও কৃষি খাতে ব্যয় হয়েছিল ৪৪,৯৭,০০০ টাকা ও ২,৪৫,৪৩৮ টাকা।[১৪] পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে কলকাতাতে এই সময় গুলোতে মাছের চাহিদা বাড়তে শুরু করেছিল। তার অবশ্য অনেক কারণ ছিল। তবে অন্যতম এক কারণ হিসাবে বলা যায় ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে প্রচুর পরিমাণে উদ্বাস্তু সুন্দরবনে যেমন বসতি স্থাপন করেছিল, একই ভাবে কলকাতাতে তাদের বসতি নির্মাণ করেছিল। কলকাতার আশেপাশের বিভিন্ন কলোনিগুলিতে এই শরণার্থীরা ভিড় জমিয়েছিল। ফলে জনসংখ্যার এই চাপ কলকাতার মাছের চাহিদাকে বাড়িয়েছিল বলা যেতে পারে। যে কারণে সরকার মাছের আমদানির দিকে নজর দিয়েছিল। এই সময়ে মৎস্যজীবীদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ

সরকারের মৎস্য বিভাগ নতুন একটা প্রকল্প 'কোস্টাল মেকানাইজড ফিশিং স্কীম'এর কাজ শুরু করে ছিল।[১৫] উক্ত প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ হিসাবে বলা যায়, ১৯৬২ থেকে ১৯৬৩ সালে ব্যয় ১,৩৮,১০০ টাকা, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৪ সালে ব্যয় ১,৪০,৭৯৩ টাকা এবং ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৫ সালে ৩,৪১,২০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।[১৬] কোস্টাল মেকানাইজড ফিশিং স্কীম অনুযায়ী বৎসরে অর্থাৎ জুন-জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত প্রকল্পে তথ্যানুসন্ধান, মৎস্য ধরা ইত্যাদি কাজ করা হয়। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত মৎস্য ধরার কাজ বন্ধ থাকে কারণ সেই সময়ে সুন্দরবনের উপকূল অঞ্চল প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ কালবৈশাখী ঝড় সক্রিয় থাকে যে কারণে এই সময়ে নৌকা চলাচল অসম্ভব হয়ে পড়ে। এই সময় গুলোতে জাল তৈরি, নৌকা ও ইঞ্জিন মেরামত ইত্যাদির কাজগুলো ডাঙায় করা হয়। সেকারণে এই পরিস্থিতি মেনে মৎস্য উৎপাদনে সরকার স্কীমের কাজ করে। উক্ত স্কীমে আর্থিক বৎসরগুলোতে যে পরিমাণ মৎস্য উৎপাদিত হত– ১৯৬২ থেকে ১৯৬৩ সালে ৫,৬৬৩ কেজি, ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৪ সালে মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়ে হয় ১১,৫৯৩ কেজি, ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে পূর্ব বছরগুলোর তুলনায় বেড়ে গিয়ে হয়েছিল ২২,০৬৭ কেজি। এই মাছ বাজার দরে স্থানীয় ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হত।[১৭] উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে ক্রেতা ও বিক্রেতা সবার যাতে কোন প্রকার অর্থের দিকে বিশাল একটা ব্যবধান তৈরি না হয় তার ব্যবস্থা করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য সরবরাহ ন্যায্য মূল্য সর্বত্র অব্যাহত ও সুনিশ্চিত রাখার উদ্দেশ্যে বিভাগ ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিশ ডিলারস লাইসেন্স অর্ডার নামে একটি আদেশ জারি করে। ১৯৬৩ সালের ৮ই জুলাই, এক্সট্রা অর্ডিনারী ক্যালকাটা গেজেটে এর ৯২৫ পৃষ্ঠায় অর্ডারটি প্রকাশিত হয়েছে। এই আদেশ অনুসারে পাইকারি ও সকল খুচরা মৎস্য ব্যবসায়ীদেরকে সরকার থেকে লাইসেন্স সংগ্রহ করার কথা বলা

হয়েছে। এছাড়া দৈনন্দিন ক্রয় ও বিক্রয় সম্পর্কে নির্ধারিত ফর্মে হিসাব রাখার কথাও বলা হয়েছে। তাছাড়া ব্যবসায়ীদের মৎস্য ক্রয় সম্পর্কে সরকারের নিকট নির্ধারিত ফর্মে পাক্ষিক বিবরণ দাখিল করতে হবে বলে জানানো হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা খুচরা ও পাইকারি দরের মধ্যে যে ব্যবধান সরকারের পক্ষে তার পরিমাণ ও কারণ জানা সম্ভব হবে। আশা করা যায় এই ব্যবস্থায় অত্যাধিক মুনাফা প্রতিরোধ করা যাবে। এই আইনের মাধ্যমে মৎস্য সরবরাহের দুর্গতি সম্পূর্ণ রোধ করা সম্ভব না হলেও ভবিষ্যতে মূল্য নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে বলে সরকারিভাবে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছিল।[১৮] প্রকৃতপক্ষে এই পরিকল্পনাগুলো সরাসরি ভাবে মৎস্যজীবীদের উপর প্রভাব বিস্তার না করলেও পরোক্ষ ভাবে উন্নতির দিকে নিয়ে গিয়েছিল বলা যেতে পারে। উল্লিখিত এই সরকারি প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হয়েছিল মৎস্যজীবীদের সুবিধার কথা ভেবে সরকারের জেটি নির্মাণের কাজ। সরকারি উদ্যোগে নামাখানা ও ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায় একটি করে জেটি নির্মাণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। এছাড়া ১৯৬০-এর দশকে শুঁটকি মাছ, ফিস মিল ইত্যাদি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জ এলাকায় সরকারি উদ্যোগে মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে একটি কেন্দ্র খোলা হয়েছিল।[১৯]

সুন্দরবনের সচেতনতার প্রথম বহিঃপ্রকাশ দেখা যায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মধ্যে এবং তিনি ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে সুন্দরবন সফরে আসেন। পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এর সরকার প্রথম বারের মত সুন্দরবনকে নিয়ে পৃথক একটা বিভাগ গঠন করেন। সুন্দরবনের উন্নয়নে তখন থেকেই নানা পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছিল, যার প্রভাব মৎস্যজীবীদেরকেও উপকৃত করেছিল। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ১৯৭০ এর দশকে ‘10 years Development Programme’ এর ভিত্তিতে ‘A Pilot Project for

Comprehensive Development of a Rural Region in West Bengal' এর মাধ্যমে সুন্দরবনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ এক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। এই প্রস্তাবের শ্রেণীবিভাগ হল— "The strategy of development therefore should be so delineated as to cover all these areas of action and growth. These areas may be classified as: Remove basic development constraints, i.e. flood hazard and saline intrusion by adequate control measures. Massive programme for agricultural produc- tivity and crop-diversification. Utilisation of production potential of commercial crops. Organised and efficient utilisation of natural resources of the region, viz., fisheries and forest. Scenic beauty of natural landscape, sanctuaries, etc. for promotion of tourism. Development of focal points of the region which would act as growth-poles in the region support- ing economic and social development programmes for the region. These growth-poles would initiate in an organised way industrial- urbanisation of the region. Provide adequate infrastructure to support the development programmes, viz., construction of arterial transportation linkages, cover the exist- ing gaps and improve the operational efficiency of existing network and supply of power to the centres of growth on priority basis. Provide basic utilities, viz., health, education, etc. Education programmes should be related to specific requirements of the region. Organisation of suitable institutions

which would be capable of implementing massive and comprehensive development programmes."[২০] এই প্রস্তাবের মাধ্যমে মৎস্য ও বনজ সম্পদের সংগঠিত উৎপাদন বাড়িয়ে এই অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা মানুষদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বৃদ্ধিতে সহায়তা প্রদান করার প্রচেষ্টা হয়েছিল। উক্ত পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে ফ্লাড কন্ট্রোল ও ড্রেনেজে ব্যয় করা হয়েছিল ৩৭,৭৫,৯২,০০০ টাকা, কৃষির উন্নয়নে ব্যয় করা হয়েছিল ৫,২৪,০০,০০০ টাকা, মৎস্য চাষে ব্যয় করা হয়েছিল ৬,৭৯,০০,০০০ টাকা এবং পশুপালনে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ১১,৩৬,০০০ টাকা, তাছাড়া বনের উন্নয়নে ও জম্বুদ্বীপে বোট তৈরি শিল্পের জন্য ২,৮২,৫০,০০০ টাকা ও ৩০,০০,০০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।[২১] কৃষির পরেই সুন্দরবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সম্পদ হল মৎস্য। এই মৎস্য সীমান্তের বাইরেও সংযোগ স্থাপনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। উক্ত তথ্যে উল্লিখিত হয়েছে তৎকালীন সময়ে কলকাতা ছিল দেশের সবচেয়ে বড় মাছের বাজার সেখানে মাছের চাহিদা ছিল সর্বোচ্চ, বছরে ১,০০,০০০ টন মাছের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু সেখানে সরবরাহ হত মাত্র ২৫,০০০ থেকে ৭৫,০০০ টন মাছ।[২২] সুন্দরবন থেকে ঐ সময়ে বছরে ৬,০০০ টন মাছ কলকাতার বাজারে আসতো।[২৩] এই সব দিক পর্যালোচনা করে এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা আলোচিত হয়েছিল। তবে ভারত সরকারের ফিশারিস দপ্তরের সাবেক যুগ্ম কমিশনার জি এন মিত্র তাঁর 'Development of Fisheries in The Sundarbans and The Bay of Bengal' প্রতিবেদনে তিনি সুন্দরবনের এই মৎস্য উৎপাদন বিষয়ে মূল্যবান তথ্য ও পরামর্শ দিয়েছেন।[২৪] এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়েছিল সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যারাকপুর থেকে সুন্দরবনের উপর করা সমীক্ষার তথ্য থেকে। সেই সমীক্ষার তথ্যে উল্লিখিত হয়েছে সুন্দরবনের প্রতি একর ভেড়ি থেকে বার্ষিক গড়ে

৪৮০ কেজি করে মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।[২৫] খামারে চাষ করার জন্য মাছের বীজের উপরও জরিপ করা হয়েছিল। জানা যায় মোহনা থেকে মৎস্য খামারে মজুত করার জন্যও পর্যাপ্ত পরিমাণে মাছের বীজ পাওয়া যাবে। তাছাড়া সুন্দরবনের মোহনা থেকে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত সময়ে বছর ২,০০০ টন মাছ উৎপাদনেরও নিশ্চয়তা আছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২৬] তথ্যে আরও উল্লেখ করা হয়েছে মোহনায় মাছ ধরার ক্ষেত্রে মাছ ধরার সরঞ্জাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে থাকে। বর্ষাকালে প্রথাগত নৌকা ও জাল দিয়ে মাছ ধরা খুবই সমস্যা বহুল যে কারণে এই এলাকায় মৎস্য উৎপাদন ভালো হবে যদি আধুনিক পদ্ধতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয়। মূলত এই প্রকল্পতে 'Two pilot schemes have been drawn up in G N Mitra report on promotion of fish culture and catch in the region. One is Organasation of Fish Farms in reclaimed areas. And the other is Modernnisation of Fishing Activities in Estuarine Waters."[২৭] প্রথমটির ক্ষেত্রে মোট সুন্দরবনের ২৫,০০০ একর জায়গায় এই প্রকল্পে ৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা এবং অন্যটির ক্ষেত্রে ১ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় ধার্য করা হয়েছিল। সুন্দরবনের পুনরুদ্ধারকৃত এলাকায় মৎস্য খামারের সংগঠনের জন্য রাজ্য সরকার এমন কয়েকটি অস্থায়ী স্থান পেয়েছিল যেখানে নিবিড় সংস্কৃতি (intensive culture) লাভজনক হবে। যেমন নামখানা ব্লকে ভাসান খাল ও বলির খাল, মথুরাপুর ব্লকে বদর খাল, ভাঙ্গর ব্লকে মথুরাপুর ইরিগেশন খাল ও বদির বিল এবং কাকদ্বীপ ব্লকে বড় সাতানি ও ছোট সাতানি অঞ্চলগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। স্টেট ফিশিং ফারমিং কর্পোরেশন নামখানা ব্লকের ফ্রেজারগঞ্জের মহারাজগঞ্জ অঞ্চলে ৬০০ একর স্থানে মৎস্য চাষের প্রকল্প গ্রহণ করে। তবে এখানে কার্প জাতীয় মাছের উৎপাদনে জোর দেওয়া হয়েছিল।

ব্যারাকপুরের সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট বকখালি এলাকার হেনরি আইল্যান্ডে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫০০ একর জায়গায় নোনা জলের মাছের খামার গড়ে তোলারও পরিকল্পনা করে।[২৮] এছাড়া ডেল্টা প্রজেক্টের অধীন মিষ্টি জলে মাছ চাষের ফেজ-১ এলাকায় ২৭ লক্ষ টাকা প্রকল্প খাতে ব্যয় করার কথা ঘোষিত হয়। অর্থাৎ সর্বমোট ৬ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকা প্রকল্পের বাস্তবায়নে ব্যয় ধার্য করা হয়।[২৯]

কেবলমাত্র মাছের উৎপাদন প্রকল্প নয়, এই মাছের সংরক্ষণের জন্য বরফ কলের কথাও প্রকল্পে উল্লিখিত হয়েছে, সেই পরিকল্পনা মত সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জ, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, নাজাট এলাকায় এই বরফ কলের নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয় বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।[৩০] উক্ত প্রকল্পের অধীনে সুন্দরবনের ১,৬০০ বর্গ মাইল বন এলাকার উন্নয়নের পরিকল্পনাও গৃহীত হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে সুন্দরবনের ৩৫,০০০ মানুষ বনের থেকে মধু-কাঠ ও মাছ সংগ্রহ করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। সুন্দরবনের গরাণ ও গেঁওয়া কাঠ থেকে পেপার ও সজ্জা শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এই কারণে সুন্দরবনের এই দুই বৃক্ষের রোপণের বিষয়ও আলোচিত হয়। তাছাড়া প্রাকৃতিক পরিবেশগত অবস্থার উন্নতি এবং শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের জন্যও বনজ সম্পদের বৃদ্ধি করা প্রযোজন। ১০০০ একর এলাকায় গরাণ ও গেঁওয়া বনসৃজনে ২,৫০,০০০ টাকা ব্যয় ধার্য হয়। প্রকল্পের রূপায়নে প্রতি একর জমি থেকে ৩ থেকে ৮ কুইন্ট্যাল গরাণ ও গেঁওয়া উৎপাদনের সম্ভবনা রয়েছে বলে তথ্যে উল্লিখিত হয়েছে।[৩১] এই পরিকল্পনার মধ্যে দিয়ে দুই ধরণের কাজ হয়েছিল। প্রথমত- প্রান্তিক বাঁধের রক্ষণাবেক্ষণ জনিত সমস্যা লাঘব করা যাবে। দ্বিতীয়ত- বেড়িবাঁধের মজবুতিকরণ এবং একটা অর্থকরী ফসল প্রদান। এই সমস্যা সমাধানের উপায় হিসাবে নারকেল গাছ লাগানোর পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। উক্ত প্রজেক্টের তথ্য

থেকে জানা যায় ৩৬,০০০ একর জায়গায় নারকেল গাছ লাগানোর কথা বলা হয়, যার খরচ ধরা হয়েছিল প্রতি একর ৮০০ টাকা হিসাবে ২,৫০,০০০ টাকা।[৩২] এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, ক্যানিং, বকখালি প্রভৃতি এলাকার সার্বিক উন্নয়নের বিষয়গুলিকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

১৯৭০ এর দশকে কে সি সাহা তাঁর 'Fisheries of West Bengal' রিপোর্টে মাছ সংরক্ষণ, কোঅপারেটিভ, মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক অবস্থা, তৎকালীন সময়ের সমস্যা ও উৎস প্রভৃতি প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। ফিশারি ও মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়নকল্পে ১৯৭২ সালে শান্তিকুমার দাশগুপ্তের নেতৃত্বে 'Master Plan Committee' গঠনের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার অন্তর্দেশীয় জলাশয়গুলির অবস্থা নিরূপণ ও উপযুক্ত স্কীম গঠন করে উৎপাদন নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। উক্ত কমিটির সুপারিশগুলি মাধ্যমে প্রতিটি জেলায় ফিশ ফার্মার্স ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, ভিলেজ ফিশ ফার্মিং ইউনিট, মিশ্র ফার্ম, বিল ফিশারি ডেভলপমেন্ট কর্পোরেশন গঠন প্রভৃতি সুনিশ্চিত হয়েছিল। মৎস্যজীবীদের উন্নয়ন ও মাছের উৎপাদন বাড়ানো ছিল কমিটির যথার্থ চিন্তাভাবনা।[৩৩] এই কমিটি প্রাথমিক ভাবে মৎস্য চাষের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য বিভিন্ন উপগোষ্ঠী গঠন করে, তথ্য সংগ্রহ করে, মৎস্য ও মৎস্য উৎপাদনের সার্বিক উন্নয়নের কিছু সুপারিশ ১৯৭৫ সালে পেশ করে। এর প্রধান সুপারিশগুলি হল— প্রথমতঃ রাজ্যের সমস্ত স্বাদু জলের পুকুর এবং ট্যাঙ্কগুলিকে মাছ চাষের অধীনে আনা এবং এগুলির উন্নয়নমূলক কাজের জন্য মৎস্য চাষিদেরকে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে অর্থের বন্দোবস্ত করা। দ্বিতীয়তঃ মৎস্য চাষের জন্য ঋণ সুবিধা এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য কমিটি ও রাজ্যের প্রতিটি জেলায় FFDA (Fish Farmers Development Agency) অর্থাৎ মাছ চাষি উন্নয়ন সংস্থা প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করে। তাছাড়া মৎস্য চাষে আগ্রহী ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণের

ব্যবস্থা করা ও সমস্ত জেলার সমস্ত গ্রামের ট্যাঙ্কে নিবিড় মৎস্য চাষে উৎসাহিত করা। বেকার যুবক ও মৎস্যচাষিদের মধ্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ হিসেবে লাভজনক পেশা হিসেবে মাছ চাষকে জনপ্রিয় করে তোলা। তৃতীয়তঃ রাজ্যের বিল, বাওড়ে মৎস্য পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বা রাজ্য মৎস্য উন্নয়ন নিগমের অধীনে একটি 'বিল মৎস্য উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এই কমিটি মতামত দিয়েছিল। নোনা ঘেরির উন্নয়নের জন্য রাজ্য মৎস্য অধিদপ্তর সুন্দরবনের খাঁড়ি ও মোহনায় বাঁধ, স্লুইস গেট নির্মাণের সুপারিশ করেছিল। মৎস্য উৎপাদনের সম্ভাবনা আছে এই সমস্ত খামারগুলিতে গ্রাস কার্প, সিলভার কার্প, কমন কার্প প্রভৃতি উৎপাদনের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করেছিল। এই কমিটি সুপারিশ করে রাজ্য সরকারের উচিত নিম্ন সুন্দরবন অঞ্চলে মাছ উৎপাদনের জন্য যান্ত্রিক বোট, আইস প্ল্যান্ট, হিমঘর, ল্যান্ডিং জেটি প্রভৃতির পরিকাঠামো তৈরি করে মাছের অবতরণ এবং বিপণনের সুপারশগুলি সুরক্ষিত করা। তাছাড়া মাছ ধরার অভিজ্ঞতা আছে এমন কঠোর পরিশ্রমী এবং সমুদ্রে পাড়ি দিতে পারা সক্ষম যুবকদের মোহনা, উপকূল এবং গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার প্রশিক্ষণের জন্য বেছে নিয়ে সমুদ্রগামী ট্রলার পরিচালনায় ব্যবহার করা। মাছ ধরার যন্ত্রচালিত নৌকা কেনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে মৎস্যজীবীদের ঋণের ব্যবস্থা করার বিষয়েও এই কমিটি সুপারিশ করে।[৩৪]

পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫-৭৬ থেকে ১৯৭৮-৭৯ সালে মৎস্য উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু প্রকল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এই প্রকল্পের অধীনে নামখানায় একটি ফিশ ল্যান্ডিং জেটি, মৎস্য বীজ চাষ ব্যবস্থাপনার অধীনে বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে পরিবর্তন ঘটেছিল। ১৯৭৭ সালে রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষমতায় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উক্ত সরকারের থেকে রাজ্যের কৃষিশ্রমিক ও ভাগচাষীরা

সুবিধা অর্জন করতে পারলেও জেলে মৎস্যজীবী এবং ফিশারিগুলি কিন্তু অনেকটা পিছিয়ে ছিল।[৩৫] ১৯৮০ সালে এই রাজ্যে মৎস্য চাষিদের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য কর্পোরেশন লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই কর্পোরেশন নামখানার ফ্রেজারগঞ্জের শঙ্করপুরে মৎস্যজীবীদের জন্য ছোট মৎস্য বন্দরের কাজ সফল ভাবে সম্পন্ন করেছিল।[৩৬] তাছাড়া উক্ত সরকারের প্রচেষ্টায় মিষ্টি জলের পুকুর খনন, অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে পুকুর খনন করে মাছ চাষে উৎসাহ দান, জ্বালানী কাঠের বিকল্প হিসাবে সোলার কুকার সরবরাহ করে মৎস্যজীবী মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেছিলেন।

সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ (Sundarban Development Board) ১৯৮৪-৮৫ সালে সুন্দরবনের ঝড়খালিতে একটি মৎস্য খামার গড়ে তোলে। নানা জটিলতা কাটিয়ে এই খামারের কাজ শুরু হয়েছিল। “Under the IFDA assisted Sundarban Development Project, Sundarban Development Board of the Development and Planning department had set up a brackish water fish firm in Jharkhali island in Basanti block in 1986-87.”[৩৭] ঝড়খালির মোট ৫০ হেক্টর জমির মধ্যে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ১২ হেক্টর জমিতে এই মৎস্য খামার গড়ে তুলেছে। যদিও পর্ষদ আরও একটি ১৫০ হেক্টর এলাকায় একই ভাবে মৎস্য খামার গড়ে তুলেছে, কিন্তু পরিচালনার জন্য একটি সমবায় সমিতিকে হস্তান্তর করেছে।[৩৮] ঝড়খালি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি এই মৎস্য খামার পরিচালনা করে। সুন্দরবন পর্ষদ মূলত দুটি ধাপে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করে। “Sundarban Development Board took over possession of .550 ha. Of land at Jharkhali, P.S- Basanti for carrying out pisciculture in the area under IFDA (Integrated Fisheries Development

Authoruity) assisted progremme. Two Fishery projects have already been taken up in Phase-I and Phase-II. Phase-I is directly managed by Sundarban Development Board and Phase-II has been handed over to a Co-operative Society."[৩৯] সরাসরি ভাবে এই প্রকল্পের দায়িত্ব গ্রহণে যথেষ্ট সমস্যা পেতে হয়েছিল সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদকে। যে কারণে ফেজ-II মৎস্য খামার শুরু করতে পর্ষদ সমবায় সমিতিকে এই প্রকল্পে যুক্ত করার কথা ভেবে ছিল। তবে একথা সত্য যে তৎকালীন সরকার কো-অপারেটিভ এর মধ্য দিয়ে কাজ করতে পছন্দ করতো, যেকারণে সরাসরি না করে উক্ত পদ্ধতি মেনে কাজ করেছিল। এই খামারকে কেন্দ্র করে ১০১ মৎস্যজীবী পরিবার তৎকালীন সময়ে জীবিকা নির্বাহ করতো।[৪০] ঝড়খালি মৎস্য খামার পরিচর্যার বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের প্রজেক্ট ডিরেক্টর T. K. Sinha বলেন— "Sundarban Development Board has developd Fish Farm at Jharkhali. As outline in the S. A. R. Fish Farm is supposed to be handed over in favour of Fishermen Co-operative Society. For this purpose after completing the process of field level enquiry beneficiaries society in the name and style Jharkhali Fishermen Co-oparative Society has recently been formed. On 16-05-86 in a meeting in the chamber of Minister of State in Charge, S. A. where the then special secretary development and planning department was also present it was decided that second phase of the Jharkhali Fish Farm would be handed over in favour of the Jharkhali Fishermen Co-operative Society for maintenance and supervision for the year

1986-87 if the society so approaches. We have received a copy of the resolution adopted in the meeting of the Jharkhali Fishermen Co-oparative Society held on 19-05-1986 through assistant project director of fishery Jharkhali Fish farm, and it has been finally decieded that phase-II part of the Jharkhali Fish Farm would be handed over in favour of the society for maintenance and supervision for the year 1986-87."[৪১] গত চার বছরে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিদের মজুরি ও কাজের বোনাস বাবদ দেওয়া হয়েছে ১৯৮৮-৮৯ সালে ১,০৩,৪০৪.৯০ টাকা ও ৫৫,০৪৮.০০ টাকা, ১৯৮৯-৯০ সালে ২,২৫,৬২৬.২৮ টাকা ও ৩৩,২৫৬.০০ টাকা, ১৯৯০-৯১ সালে ২,১২,২০০.০০ টাকা ও ২,৫২,০০০.০০ টাকা এবং ১৯৯১-৯২ সালে ২,১৯,৫২৭.১১ টাকা ও ৩,১২,৭০০.০০ টাকা।[৪২] সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ২০০১ সাল থেকে এই প্রকল্পে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে মাছ চাষে উৎসাহী হয়। কেননা পর্ষদ যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প চালাতে ইচ্ছুক ছিল না। সেই মত ২০০১ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত একটি স্বল্পমেয়াদী প্রকল্প তৈরি করে মাছ চাষের একটা সম্ভাব্য খসড়া প্রস্তুত করে ফিশারী দপ্তর থেকে পরিচালনা করার প্রচেষ্টা নিয়েছিল।[৪৩] সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ঝড়খালিকে কেন্দ্র করে যে নোনা জলের মাছ চাষের খামার করেছিল, সেই খামারের শুরু থেকে মাছ চাষের কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে বিগত ২৪ বছরের মধ্যে ৯ বছর খামারটি লোকসানের মধ্য দিয়ে গেছে। তার অবশ্য নানাবিধ কারণ রয়েছে। বর্তমানে এই খামারটি ৮ জন নৈমিত্তিক শ্রমিকের সহায়তায় ও সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের একজন কর্মকর্তার দ্বারা পরিচালনাধীন রয়েছে। ঝড়খালি মৎস্য খামার কেন্দ্রের ১৯৮৪ থেকে ২০০৮ পর্যন্ত উৎপাদন, ব্যয় ও আয়ের একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হল।

	বছর	খরচ (টাকা)	চিংড়ি, মাছ ও কাঁকড়া উৎপাদন (কেজি)	আয় (টাকা)
১।	১৯৮৪-৮৫	২১,০০০.০০	১৫৫৮.৮৫০	৩৭,৭৮০.৭৫
২।	১৯৮৫-৮৬	৩৮,০০০.০০	৬৯৭.৩২০	২৩,৭৮০.৭৫
৩।	১৯৮৬-৮৭	৩৫,০০০.০০	৬৮২.১০০	১৬,৬৮৯.০০
৪।	১৯৮৭-৮৮	১০,০০০.০০	৬১০.৮৭০	৯,৫২৩.০০
৫।	১৯৮৮-৮৯	৪২,৯৪৪.০০	১৬৪৫.৯৫০	৭৫,৩৬০.০০
৬।	১৯৮৯-৯০	৪০,০০০.০০	১৬২৬.০০০	১,০৮,২৭৪.২৩
৭।	১৯৯০-৯১	৬০,০০০.০০	২৭০৬.১৯৫	১,২০,০২৩.৪০
৮।	১৯৯১-৯২	৯০,০০০.০০	২৭০৮.৩০০	২,৪৬,২৮৯.৯৬
৯।	১৯৯২-৯৩	১,০৫,০০০.০০	৩৪৯০.০০০	৩,৬৪,২৬০.৫৫
১০।	১৯৯৩-৯৪	১,৮৯,৯২৪.০০	২৬৯১.৭৫	৩,৫৩,২৯৬.৯০
১১।	১৯৯৪-৯৫	২,৪৫,০০০.০০	২৭৬.৩৭৫	৩,৪৮,২৮৫.০৫
১২।	১৯৯৫-৯৬	২,৯৯,৯৪৭.০০	১৭৯১.৭০	৪,০১,৫৭৬.৫০
১৩।	১৯৯৬-৯৭	৩,৩৮,০০০.০০	৭৬৪.১০	১,০৯,০৩১.০০
১৪।	১৯৯৭-৯৮	৩,৩৭,৩০০.০০	৫৪২০.৮০	৩,৪২,১০৬.৫০
১৫।	১৯৯৮-৯৯	৩,৩৯,০০০.০০	২২৩৬.৬২৫	৩,৫২,৬৪৩.০০
১৬।	১৯৯৯-২০০০	২,৭১,০০০.০০	২১৯২.২০০	৩,০০,৫৬৪.৬৫
১৭।	২০০০-০১	৩,৬০,০০০.০০	২১২৯.৬২০	৩,৭২,৭৪২.৩০
১৮।	২০০১-০২	৩,৪৩,০০০.০০	৫১৮.০৫০	৯৩,১২৫.২০
১৯।	২০০২-০৩	৩,৯০,০০০.০০	২২৪১.২০০	৩,৬৮,০০৪.৮০
২০।	২০০৩-০৪	১,৪৬,১০৮.০০	৬৮২.২০	১,১৮,৮৮৫.০০
২১।	২০০৪-০৫	১,৬৪,৪৭২.০০	৯২৫.৬৫	১,৫১,১০৩.০০
২২।	২০০৫-০৬	৩,৪৫,০০৩.০০	২১৬৫.৭	১,৮৫,৬৪২.০০
২৩।	২০০৬-০৭	১,৬০,০০০.০০	২৬৬৯.৫	৩,৩৬,৪৮৬.০০
২৪।	২০০৭-০৮	৪,৩২,৫০২.০০	১২১৪.৯৫	১,০৬,৭০৭.০০

সূত্রঃ Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No - SDB/Fish, 1S-15/2007 (P-1),

Year wise Budget Allowedment of Expenditure of Fund of Fisheries Division

year	Allowedment of scheme			Financial achievement in lakh			Physical target no of benificeries		Physical achievement no of benificeries	
	A	B	Total	A	B	Total	A	B	A	B
2015-16	350.75	26.09	376.84	337.71	26.09	363.8	9250	1350	9250	1350
2016-17	800.82	0	800.82	791.42	0	791.42	15000	0	15000	0
2017-18	1014.24	2,75	1016.99	1002.77	2.75	1005.52	20000	1350	24000	150
2018-19	1168.06	24.3	1192.36	185.78	17.62	1203.4	23540	1350	23540	1000
2019-20	1165.18	23.49	1188.67	1158.75	23.31	1182.06	23000	13500	23000	1000
2020-21	1229.08	0	1229.08	1224.03	0	1224.03	27060	0	27060	0
2021-22	1425	0	1425	1422.9	0	1422.9	30,000	0	30,000	0
2022-23	1446	0	1446	1446	0	1446	60,000	0	60,000	0
	8599.13	76.63	8675.76	8569.36	69.77	8639.13	207850	5400	207850	3500

সূত্রঃ Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No - SDB/FISH/1S-14/06/Pt-111,

উল্লিখিত তালিকাতে ২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ সালের মধ্যে সমগ্র সুন্দরবনের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মৎস্য দপ্তর সুনির্দিষ্ট ভাবে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল তা তুলে ধরা হয়েছে। তবে এই সরকারি প্রকল্পে প্রতি বছর সমান ভাবে অর্থ ব্যয় করা হয়ে ওঠেনি, তবে এই প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে উপভোক্তাদের উন্নয়নে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে সক্ষম হয়েছিল।

Beneficiary Benifited During the Financial year From 2011-12 to 2022-23 at Sundarban (South and North 24 Parganas)

		Schemes	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	Total
NORTH	1	Distribution of fish fingerlings lime and fish feed	0	1421	1895	2526	2921	4767	5600	6645	6448	7710	8610	17200	65763
	2	Agrifisheries training to the marginal fish farmers	426	0	0	640	426	0	0	400	400	0	0	0	2292
		Total	426	1421	1895	3166	3347	4767	5600	7045	6848	7710	8610	17220	68055
SOUTH	1	Distribution of fish fingerlings lime and fish feed	0	3079	3805	5474	6329	10233	14400	16895	16552	19350	21390	42780	160287
	2	Agrifisheries training to the marginal fish farmers	924	0	750	110	924	0	150	600	950	0	0	0	4408
		Total	924	3079	4555	5584	7253	10233	14550	17495	17502	19350	21390	42780	164695

		Grand total 1+1	0	4500	5700	8000	9250	15000	20000	23540	2300	27060	30000	60000	205350
		Grand total 2+2	1350	0	750	750	1350	0	150	1000	1350	0	0	0	6700
		Total for 2 districts	1350	4500	6450	8750	10600	15000	2150	24540	24350	27060	30000	60000	232750

সূত্রঃ Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No- SDB/FISH/1S-14/06/Pt-111,

উল্লিখিত তালিকাতে দেখানো হয়েছে ২০১১-১২ থেকে ২০২২-২৩ সময়কালের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৯ টি ব্লকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ প্রতি বছর নির্দিষ্ট হারে মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে ফিশ ফিঙ্গারলিং লাইম, ফিশ ফিড বিতরণ ও প্রান্তিক মৎস্যচাষিদের প্রশিক্ষণের জন্য যে প্রকল্প গ্রহণ করেছিল। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অগণিত পুকুর, ডোবা, খাল, বিল, বাওর, নদী ও মোহনায় প্রাপ্ত প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। তাসত্ত্বেও এখানকার মাছের উৎপাদন আশাপ্রদ নয়। যদি এই সব বদ্ধ জলাশয়গুলিতে সঠিক ভাবে মাছের চাষ করা যায় তবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে উৎপাদন তিন-চারগুণ বাড়ানো সম্ভব। যে কারণে পরিকল্পিতভাবে সরকার সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রয়াস নিয়েছে।

মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষীদের সেবায় মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমুখী প্রকল্প

মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা (F.F.D.A.) মাধ্যমে ব্যাঙ্কঋণ ও অনুদানের সুযোগ-১৯৮১-৮২

এই প্রকল্পে সব ধরনের মৎস্যচাষী মাছ চাষ, পুকুর সংস্কার ও মাছ চাষ, নতুন পুকুর কাটা ও গলদা চিংড়ির চাষ, পোনামাছের সঙ্গে গলদা চিংড়ির চাষ ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ও অনুদানের সুযোগ নিতে পারে। প্রয়োজনীয় ফর্ম ব্লকে মৎস্য বিভাগে পাওয়া যায়।[৪৪]

মৎস্যজীবীদের জন্য সচিত্র পরিচয় পত্র দেওয়ার প্রকল্প- ১৯৯১-৯২

মৎস্যজীবীদেরকে এই প্রকল্পের অধীনে এনে পরিচয় পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ১৯৯১-৯২ সাল থেকে মৎস্যজীবীদেরকে পরিচয় পত্র দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল। ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে ৩০,২৮৩ জন মৎস্যজীবীকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণাতে ১০,১৪১ জন, ২০১৬-১৭ সালে ১২,০৬৪ জন মৎস্যজীবীদেরকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়।[৪৫] যে সব ব্যাক্তি মাছধরা বা বিক্রয় কাজে নিযুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করেন তিনি এই পরিচয়পত্র পেতে পারেন। নিজস্ব দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান/পুর কমিশনার কর্তৃক প্রত্যয়িত) সহ আবেদন পত্র ভালোভাবে পূরণ করে প্রধানের সুপারিশসহ ব্লকে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের কাছে জমা দিতে হবে। আবেদন পত্র নেওয়া ও পরিচয়পত্র পাওয়ার জন্য মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের কাছে ব্লকেই যেতে হবে। পরিচয়পত্রে মৎস্যজীবী উল্লেখ থাকার ফলে মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন সহায়তা লাভে সুবিধা হয়। ভোর রাত্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে কার্ডধারীদের বিপদের ঝুঁকি কমে যায়। কোন দুর্ঘটনা ঘটলে

মৎস্যজীবীদের জন্য বীমা প্রকল্প পেতে সহজ হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০২০ সালের 'দুয়ারে সরকার প্রকল্প'র মধ্য দিয়ে মৎস্যজীবীদেরকে ডিজিটাল পরিচয় পত্র প্রদানের প্রকল্প চালু করেছে।[৪৬]

মৎস্য চাষিদের প্রশিক্ষণ

মৎস্য চাষিদের জন্য মৎস্য দপ্তর থেকে তিন ধরণের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মৎস্য চাষের প্রকল্পভুক্ত মৎস্য চাষিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। (ক) ব্লক স্তরে প্রকল্প অনুসারে ৩/৪/১০ দিনের প্রশিক্ষণের সুযোগ আছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য দিন প্রতি হিসাবে প্রশিক্ষণ ভাতা দেওয়া হয়। (খ) ব্লক স্তরে সফল হলে প্রশিক্ষণ প্রার্থীদের জেলা স্তরে ৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশিক্ষণ ভাতাও দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। (গ) জেলা স্তরে প্রশিক্ষণে সফল মৎস্য চাষি রাজ্য স্তরে ভাতাসহ প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে পারে। National Fisheries Development Board সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা এলাকায় ২০১১ সালে ৪০ জন এবং সুন্দরবনের অন্যান্য এলাকায় মোট ২৫৪ জন মৎস্যজীবীকে শুঁটকি মাছ প্রস্তুতকরণ, আইসিং অফ ফিশ প্রস্তুত, বিভিন্ন ধরনের ফিশ পাঁপড় ও ফিশ চপ প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।[৪৭]

সেচ জলাধারে মৎস্য সঞ্চার প্রকল্প

সেচ জলাধারগুলিতে মৎস্য ভান্ডার সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও মৎস্যজীবীদের জীবিকা সুনিশ্চিত করেতে সেচ জলাধারগুলিতে মৎস্য প্রকল্প চালু করা হয়েছে।[৪৮]

মৎস্যজীবীদের জন্য বার্ধক্যভাতা প্রকল্প-১৯৯১-৯২

৬০ বছর বা তার ঊর্ধ্বের বৃদ্ধ ও অশক্ত মৎস্যজীবীদের মাসিক ১০০০ টাকা ভাতা দেওয়া হয়। ২০১১ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর, রায়দীঘি প্রভৃতি এলাকা থেকে নথিভুক্ত ১,৯৭,৭৮১ জন মৎস্যজীবী সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত রয়েছে।[৪৯] ২০১৬ থেকে ২০১৭ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণায় ১,৫৮৮ জন মৎস্যজীবী এই সুবিধা পেয়েছে।[৫০] ২০১৯ থেকে ২০২১ সালে পাথরপ্রতিমা ব্লকের ৪২ জন, কাকদ্বীপ ব্লকে ১৩৭ জন, সাগর ব্লকে ৬৭ জন ও নামখানা ব্লকে ১৫০ জন মৎস্যজীবী মাসিক ১০০০ টাকা করে পেনশনের সুবিধা পেয়ে থাকে। এই প্রকল্পে প্রতিবন্ধী উপভোক্তার বয়সসীমা নূন্যতম ৫৫ বছর। এই প্রকল্পে উপভোক্তার মৃত্যু হলে তার স্ত্রী স্থলাভিষিক্ত হন। এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদনপত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সুপারিশ নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিকাশ স্থায়ী সমিতির কাছে জমা দিতে হবে। জেলা কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পেলে স্থানীয় ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলতে বলা হয় ও যথাসময়ে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়।[৫১]

মৎস্যজীবীদের দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্প-১৯৮৪-৮৫

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা দূর করার জন্য দুর্ঘটনাজনিত বীমা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৮৪ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সময়কালে কর্মরত অবস্থায় কোন মৎস্যজীবীর প্রাণহানি হলে তার পরিবারকে ১ লক্ষ টাকা এবং স্থায়ীভাবে কর্ম অক্ষম হলে তাকে ৫০ হাজার টাকা চেকের মাধ্যমে দেওয়া হবে।[৫২] ২০২১ সালে এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে ২ লক্ষ

টাকা করা হয়েছে, এবং বলা হয়েছে ১৮ থেকে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কোন মৎস্যজীবীর স্বাভাবিক মৃত্যু বা দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুতে তাদের অসহায় পরিবারের হাতে এই পরিমাণ অর্থ দেওয়া হবে।[৫৩] এর জন্য মৎস্যজীবীদের কোন প্রিমিয়াম দিতে হয় না। এ ধরণের কোন দুর্ঘটনা ঘটলে প্রথমে স্থানীয় থানায় জানাতে হবে, মৃত্যু হলে মৃত্যু সার্টিফিকেট ও পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে এবং জেলায় মৎস্যদপ্তর থেকে আবেদনপত্র সংগ্রহ করে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের সুপারিশসহ ব্লকে/জেলা মৎস্যদপ্তরে জমা দিতে হবে। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, মৌসুনি, বকখালি প্রভৃতি এলাকা থেকে হাজার হাজার মৎস্যজীবী সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। প্রতিনিয়ত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে, বিপদের আশঙ্কা তাদের নিত্যসঙ্গী। গভীর সমুদ্রে থাকার সময়ে ফিশিং হারবারগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে ২০০৪-০৫ সাল থেকে মৎস্যজীবীদেরকে ওয়্যারলেস সেট মৎস্য দপ্তর থেকে প্রদান করা হয়েছে।[৫৪]

মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে জাল ও হাঁড়ি বিতরণ

বিলে মাছ চাষের সাথে হাঁস, মুরগী জাতীয় প্রাণীর সুসংহত চাষের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে উপযুক্ত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিগুলিকে প্রাণী পালনের ঘর, নৌকাসহ জাল ও হাঁড়ি প্রদান করা হয়। ২০১৩-১৪ সালে সাগর ব্লকে দরিদ্র মৎস্যজীবীদেরকে ১৪ টি জাল, ১৮ টি হাঁড়ি দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে নামখানা ব্লকে ৫৬ টি পরিবারকে এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৭-১৮ সালে নামখানা ও সাগর ব্লকে ১০০ টি বাইসাইকেল ও হাঁড়ি বিতরণ করা হয়েছে। ২০২১ সালে সুন্দরবনের সাগর ব্লকে ১৫ টি বেন্টি জাল (একটি বিশেষ ধরণের মাছ ধরার জাল) দেওয়া হয়েছে।[৫৫]

মৎস্যজীবীদের মাছ চাষের সরঞ্জাম ও চারাপোনা বিতরণ

প্রতি আর্থিক বছরে প্রতিটি ব্লকে কিছু সংখ্যক মাছ চাষিকে এই প্রকল্পে মাছ চাষের সরঞ্জাম ও চারাপোনা বিতরণ করা হয়েছে। ১৯৮৬ সালে ঝড়খালি মৎস্য সমবায় সমিতিকে মাছ চাষের উপকরণের জন্য ৩৩,৬২৫ টাকা সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ অনুদান হিসেবে দিয়েছিল।[৫৬] ২০১১-১২ সালে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে বেশি পরিমাণ মাছ ক্রেতাদের ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য মৎস্য দপ্তর 'মৎস্যযান' প্রকল্পের মাধ্যমে মাছ বিক্রির জন্য নির্দিষ্ট তিন চাকার সাইকেল ভ্যান, অডিও সিস্টেম, মাছ কাটা ও ওজন করার সরঞ্জাম, ৭ লিটার বাক্সসহ এককালীন ৫৫,০০০ টাকা ভ্রাম্যমান মাছ বিক্রেতাদের মধ্যে অনুদান দিয়ে থাকে।[৫৭] সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ ২০১২ সালে ন্যাজাট ও ঝড়খালিতে মাছ চাষের জন্য ৪৮,৪০০ টাকা এবং ২০১২-১৩ সালে হাড়োয়া, মিনাখাঁ, মথুরাপুর, হাসনাবাদ, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, ক্যানিং, বাসন্তী, কুলতলি, জয়নগর প্রভৃতি মোট ২৭ টি গ্রোথ সেন্টারের প্রতিটিতে ৫০০ পিস করে ফিশ ও ফিড ফিশ প্রদান করা হয়েছে।[৫৮] মৎস্যজীবীদের সুবিধার্থে ২০১৫-১৬ সালে নামখানা ও সাগর ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ২০ টি, ২০১৭-১৮ সালে ৪০ টি মোটর সাইকেল ও বরফের বাক্স দেওয়া হয়েছিল।[৫৯] ২০১৭-১৮ সালে আরও ১০৩ টি বাইসাইকেল ও ইনসুলেটেড বাক্স দেওয়া হয়েছিল। ২০১৫-১৬ সালে নামখানার ফ্রেজারগঞ্জ ও সাগরের মৌসুনি এলাকায় ৫৪ টি সোলার লাইট, ৭ টি শুঁটকি বেড এবং ২০১৬-১৭ সালে ২৪ টি শুঁটকি বেড মৎস্যজীবীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল।[৬০] সুন্দরবনের মিনাখাঁ, সন্দেশখালি-১, সন্দেশখালি-২, হাসনাবাদ, হিঙ্গলগঞ্জ এলাকায় ২০১১ থকে ২০২১ সালের মধ্যে মীন সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্য দিয়ে মোট ৩৬৩ টি বাইসাইকেল ও হাঁড়ি প্রদান করা

হয়েছিল।[৬১] ২০২১ সালে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ কাকদ্বীপ, ক্যানিং ও ন্যাজাট এলাকায় ৬০,০০০ উপভোক্তাকে ১০-১২ সেমির ফিশ ফিংগারলিং বিতরণ করেছে। তাছাড়া ২০২১ অর্থবর্ষে সুন্দরবনের উন্নয়নে ১৪,৪৬,৩৭,৫০০ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে।[৬২]

সরকারি খাস জলাশয় ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের অধীনস্থ জলাশয় লিজ প্রদান

সংশোধিত পশ্চিমবঙ্গ ভূমি ও ভূমিসংস্কার ম্যানুয়েল অনুযায়ী ১২ই নভেম্বর ২০১২ এর পর সরকারি খাস ও বিভিন্ন দপ্তরের জলাশয়গুলি মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী/স্বনির্ভর গোষ্ঠী-দের মধ্যে টেন্ডার প্রথায় লিজ প্রদান করা হচ্ছে। প্রথমবার টেন্ডারে কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী/স্বনির্ভর গোষ্ঠী অংশগ্রহণ না করলে দ্বিতীয়বার টেন্ডারে সাধারণ মৎস্যজীবীরা অংশ নিতে পারবে। কোন জলাশয়ের অর্ধেকের বেশি খাস হলে জলাশয়ের মালিকরা স্থানীয় মৎস্য চাষিদের নিয়ে একটি মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠন করে তিন বছরের জন্য লিজ নিতে পারেন।[৬৩]

জলাশয়ের মাটি ও জল পরীক্ষা

বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষের মাধ্যমে অধিক ফলন পেতে হলে পুকুর/জলাশয়ের মাটি পরীক্ষা করানো একান্ত প্রয়োজন। জেলার বেশিরভাগ ব্লকের মৎস্য বিভাগে এবং জেলা মৎস্য দপ্তরের অফিসে মাটি ও জল পরীক্ষা করানোর ব্যবস্থা আছে। দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী চাষিরা, মৎস্যজীবী সমবায়গুলো এবং এস. জি. এস. ওয়াই. এর অধীন স্বনির্ভর দলগুলি বিনামূল্যে নিজেদের পুকুরের জল ও মাটি পরীক্ষা করাতে পারেন। কীভাবে মাটি ও জল নিয়ে আসবে সে বিষয়ে আগে ব্লকে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।[৬৪]

মৎস্যজীবীদের জন্য গৃহ নির্মাণ প্রকল্প

মৎস্যজীবীদের আবাসগৃহ নির্মাণ অনেকদিন ধরেই চলছে। মৎস্যদপ্তরের অন্যতম প্রকল্প ‘হাউজিং স্কীম ফর ফিশারমেন’। এই প্রকল্পে মৎস্য দপ্তর গৃহহীন মৎস্যজীবীদের আবাসগৃহ সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বানিয়ে দেয়। ১৯৬৩ সাল থেকে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতি বছর কম-বেশি ৫০০ জন দরিদ্র মৎস্যজীবীর পাকা বাসস্থানের বন্দোবস্ত করে আসছে। এই প্রকল্পের দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্য আছে। যেখানে মৎস্যজীবীদের আধিক্য বেশি সেখানে সবাইকে কাছাকাছি এলাকার মধ্যে ৫০ বা ১০০ টি আদর্শ আবাসগৃহ নির্মাণ করে আদর্শ মৎস্যজীবী গ্রাম তৈরি করা হয়েছে।[৬৫] “The Housing Programme is being implemented by the Department of Fisheries, Government of West Bengal under the Rural Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP). The programme envisages construction of low coast houses with ‘INDIRA AWAAS YOJANA’. The department of fisheries has come forward to utilize theis programme for the benefit of the homeless Scheduled caste/Scheduled tribe fishermen.”[৬৬] আবার যে এলাকায় মৎস্যজীবীদের সংখ্যা কম, সেখানে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মৎস্যজীবীদের জন্য কোথাও ৫ টি আবার কোথাও ১০ টি আবাস গৃহ করে দেওয়া হয়েছে। ২০০৯ থেকে ২০১০ সালে রাজ্যে ‘AMARABATI’ ও ২০১১ থেকে ২০১২ সালে ‘GEETANJALI’ প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের জন্য আবাস গৃহ নির্মাণের কাজ হয়েছে। ২০১১ সালের আগে পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৬৭,০০০ টাকা থেকে ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা নিজস্ব পাকা বাড়ি পেয়ে থাকে, গৃহ

নির্মাণের জন্য ১,৬৭,৩০০ টাকা আর্থিক অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে।[৬৭] গৃহ নির্মাণের পাশাপাশি মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকায় মৎস্যজীবীদের স্বার্থে পাকা রাস্তা ও পানীয় জলের নলকূপ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ সালে নামখানা ও সাগর ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩ টি, ২০১৬-১৭ সালে ৬ টি, ২০১৭-১৮ সালে ৩৪ টি নলকূপ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া ২০১৫-১৬ সালে ৬ টি ও ২০১৬-১৭ সালে ১ টি কমিউনিটি টয়লেট মৎস্য দপ্তর থেকে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জন্য প্রদান করা হয়েছিল।[৬৮]

জলাশয়ের তথ্য তালিকা সংগ্রহ

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের সক্রিয় প্রচেষ্টায় দূরসংবেদ প্রযুক্তির মাধ্যমে উপগ্রহ চিত্রের সাহায্যে জেলার সমস্ত ব্লকে ৫ কাঠা ও তদুর্দ্ধ জলাশয়গুলির মানচিত্র তৈরি ও সরেজমিনে সমীক্ষার কাজ চলছে। তথ্য সংগ্রহের পর সেগুলির সাহায্যে একটি তথ্য ভান্ডার তৈরি করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হবে।[৬৯]

স্বল্পমেয়াদী ঋণ প্রকল্প (S.T.C.P. – District Wise Short Term Credit Programme) ২০০৪-০৫

বিগত প্রায় দুই দশকের কিছু বেশি সময় ধরে মৎস্য দপ্তরের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প রাজ্যের সমস্ত ব্লক ও জেলে স্তরে রূপায়িত হয়ে আসছে। সঠিক পদক্ষেপের মাধ্যমে সমস্ত জলসম্পদকে প্রয়োজন ও প্রয়োগ ভিত্তিক বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নিবিড় ও সুসংহত মাছ চাষের আওতায় আনা ও সুস্থ পরিবেশ বজায় রেখে তাকে সুশৃঙ্খল ও স্বাস্থ্যসম্মতভাবে অর্থকরী করে তোলা প্রয়োজন ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কল্যাণে।[৭০]

এই ভাবনাকে সম্পূর্ণরূপে ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে সম্প্রতি গোটা রাজ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে ও NABARD এর সহযোগিতায় মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী সমবায়, মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী, ও স্বয়ম্বর গোষ্ঠীদের আর্থিক সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে "স্বল্প মেয়াদি ঋণ" এর এক নতুন পরিকল্পনার মোড়কে ২৯ টি প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে—যা সর্বস্তরে মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।[৭১] এই ঋণ উৎসাহী মৎস্যচাষিরা ১৫ দিন থেকে এক মাসের মধ্যে হাতে পেতে পারেন এবং তা এক বছরের মধ্যে ব্যাঙ্ক বা যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পেয়েছেন সেখানে শোধ করতে হবে। একই চাষি পরের বছরও এই ঋণ পেতে পারে।[৭২]

এই প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত বিষয় ঋণ অর্থাৎ NABARD- Need-Based and location based project- এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে- ছোট অগভীর পুকুরে মাছের বীজ—ধানি/চারা পোনা উৎপাদন করা, বড়ো পুকুরে খাবার মাছ (Table Fish) এবং মাছের সাথে হাঁস/মুরগি/শুকর ইত্যাদির সমন্বয়ের চাষ, মাছের বীজ পরিবহন। এই প্রকল্পে ৩৬ টি ঋণ অনুমোদিত করেছে NABARD। এই প্রকল্পে যে কোনও মাছচাষি ছোট/বড় সব ধরণের জলাশয়ে ডিমপোনা, ধানীপোনা, বড় পোনা মাছের সঙ্গে মাগুর, পাঙাস মাছ চাষ, মাগুরের চারা তৈরি, মাছ ব্যবসা ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যাঙ্ক ঋণ পাওয়া যায়। কিছু প্রকল্পে অনুদানের সুযোগ আছে। প্রয়োজনীয় ফর্ম ব্লকে মৎস্য বিভাগে পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এই প্রকল্পটি বীমার দ্বারাও সুরক্ষিত। মৎস্যজীবীরা এই প্রকল্প নেওয়ার পরে National Insurance/ New India Assurance Ltd এই কোম্পানি Insurance Coverage-এর জন্য প্রকল্পের দুই শতাংশ FFDA (Fish Fermer's Development Agency) এবং Non-FFDA-র আওতাভুক্ত মৎস্য চাষিদের কাছ থেকে প্রকল্পের

২.৫ শতাংশ BFDA (Brackish Water Farmers Development Agency) এবং Non-BFDA আওতাভুক্ত মৎস্যচাষিদের নিকট থেকে অতিরিক্ত ১ শতাংশ Flood Prone Area-র জন্য প্রিমিয়াম হিসেবে ধার্য করা হয়েছে।[৭৩]

রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (R.K.V.Y.)-২০১১-১২

মাছ চাষের উন্নয়ন ও মৎস্যচাষিদের কল্যাণে এই জেলায় এই যোজনায় বেশ কয়েকটি প্রকল্প চলছে। ১) বাড়ী সংলগ্ন জলাশয়ে উন্নত প্রথায় মাছ চাষের উপকরণ, মাছের চারাপোনা ও সরঞ্জাম বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। ২) MGNREGS প্রকল্পে সংস্কার করা বা জলাশয়গুলিতে মাছ চাষের উপকরণ ও মাছের চারা দেওয়া হয়। ৩) মৎস্য চাষি দিবস/ জলাভূমি দিবস উদযাপন করা হয়। ৪) কিছু সংখ্যক মৎস্যজীবীদের মাছ বিক্রয়ের জন্য ভ্রাম্যমান মৎস্যযান দেওয়া হয়। ৫) রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনার অন্তর্গত 'খিড়কির পুকুরে মাছ চাষ' প্রকল্পে নূন্যতম ২ বিঘা পুকুরে লুপ্তপ্রায় কই, মাগুর, শিঙ্গি, ফলুই প্রভৃতি মাছের চাষ বাড়ানোর লক্ষ্যে মিনিকিট বিতরণ প্রক্রিয়া ২০১১-১২ সাল থেকে চলে আসছে। উন্নত মাছের চারা তৈরির লক্ষ্যে হ্যাচারী ভিত্তিক 'প্রজননক্ষম বড়ো মাছের পরিচর্যা' প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে নূন্যতম ২৫ শতক পুকুরে প্রজননক্ষম মাছের বৃদ্ধি ও সুস্থ প্রজননের জন্য মিনিকিট অনুদান দেওয়া হয়ে থাকে।[৭৪]

জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদের (N.F.D.B.) সহায়তায় মৎস্য চাষীদের ঋণ ও অনুদান প্রকল্প

এই NFDB (National Fisheries Development Board) প্রকল্পে সব ধরণের মৎস্যচাষি মাছ চাষ, পুকুর সংস্কার ও মছ চাষ, নতুন পুকুর কাটা ও গলদা চিংড়ির চাষ, পোনামাছের সঙ্গে

গলদা চিংড়ির চাষ ইত্যাদি প্রকল্পে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ ও অনুদানের সুযোগ নিতে পারেন। প্রয়োজনীয় ফর্ম ব্লকে মৎস্য বিভাগে পাওয়া যায়।[৭৫]

মৎস্যজীবীদের পরিকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা

মৎস্যজীবী অধ্যুষিত এলাকায় রাস্তা ঘাটের উন্নয়নের জন্য কাঁচা রাস্তাগুলিকে মোরাম রাস্তা, পাকা রাস্তা করা ও কালভার্ট দেওয়া হয়। পানীয় জলের জন্য নলকূপ খন করা হয় এবং মৎস্যজীবীদের সভা করার জন্য কমিউনিটি হল তৈরি করে দেওয়া হয়।[৭৬]

মৎস্যজীবীদের আদর্শ গ্রাম

মৎস্যজীবী অধ্যুষিত গ্রামে গুচ্ছাকারে ২০ টি থেকে ৬০ টি পর্যন্ত গরীব মৎস্যজীবীদের এক জায়গায় আবাস গৃহ তৈরি করে দেওয়া হয়। ১৯৮৫ সাল থেকে ন্যাজাট, সন্দেশখালি, ক্যানিং, কুলতলি, বাসন্তী, গোসাবা, সাগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, মথুরাপুর, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি অঞ্চলে ‘INDIRA AWAAS YOJANA’ এর মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম গড়ে তোলা হয়েছিল। ১৯৮৫-৮৬ সালে ১১০০ টি, ১৯৮৬-৮৭ সালে ৬০০ টি ও ১৯৮৭-৮৮ সালে ৮০০ টি গৃহ নির্মাণ হয়েছিল।[৭৭]

প্রাথমিক মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন (PFCS- Primary Fishermen Co-operative Society) ২০০২

দরিদ্র মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। কমপক্ষে ১০ জন সদস্য মাথা পিছু ১ একর জলকর নিয়ে মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি গঠন করতে পারবে। জলকর সদস্যদের নিজের বা দীর্ঘমেয়াদী (১০ বছর) লিজ হতে পারে। সরকারি খাস, পঞ্চায়েত বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের জলাশয় অন্তর্ভুক্ত

করতে হলে 'সমিতিতে নথিভুক্তির পর জলাশয় দেওয়া হবে' এই মর্মে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট দাখিল করতে হবে। সমিতি যে এলাকা নিয়ে গঠিত হবে সদস্যদের সেই এলাকার বাসিন্দা হতে হবে। সাধারণত ৩০ থেকে ৫০ জন সদস্য এবং ৩০ থেকে ৫০ একর বা তার বেশি জলকর নিয়ে গঠিত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি হলে ভালো।[৭৮]

মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী (Fish Production Group) গঠন

উন্নত পদ্ধতিতে গ্রামীণ জলজ সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান এবং মাছ চাষের বিভিন্ন সামাজিক বাধা ও অসুবিধা দূর করার জন্য মৎস্য উৎপাদন গোষ্ঠী গঠন করা যেতে পারে। কমপক্ষে ৩০ বিঘা জলকর (সদস্যদের নিজস্ব বা লিজপ্রাপ্ত) এবং ৮ থেকে ১২ জন (সর্বাধিক ২০ জন) মৎস্যচাষিকে নিয়ে মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠন করা যায়। একই গ্রামে/এলাকায় এক বা একাধিক গোষ্ঠী গঠন করতে কোন বাধা নেই। যে কোন আয়ের মৎস্যচাষি এই গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারবে। মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠী গঠনের অন্য প্রয়োজনীয় ফর্ম জেলা মৎস্য দপ্তরে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।[৭৯]

সামাজিক মৎস্যচাষ প্রকল্প

২০১২-১৩ সাল থেকে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রকল্পে সরকারি ও নিজস্ব পতিত জলায় মাছ চাষ করার সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মিনিকিট প্রদান করা হয়ে থাকে। নূন্যতম ১ বিঘা পুকুরে অনুদান সর্বস্ব মাছের চারা, মাছের খাবার, চুন ইত্যাদি বিতরণ করে উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। এই প্রকল্পের কাজ নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে বর্তমান সময় পর্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকার মৎস্যজীবীদেরকে সয়াহতা প্রদান করে চলেছে।[৮০]

মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রাপ্তব্য প্রকল্প

রঙিন মাছের সমবায় তৈরি ও চাষ, ভ্যালু এ্যাডেড মৎস্য জাতীয় খাদ্য সামগ্রী তৈরি, শুঁটকি মাছ তৈরি ইত্যাদির জন্য স্থানীয় ব্লক অফিসে মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিকের অফিসে যোগাযোগ করে মহিলারা এই সুবিধা পেয়ে থাকেন। তফশিলি জাতি, উপজাতি বা মহিলা উপভোক্তারা বঙ্গ মৎস্য যোজনার মাধ্যমে মোট প্রকল্প খরচের ৬০ শতাংশ সরকারি প্রাপ্তব্য সহায়তা পাবে। সাধারণ শ্রেণীভুক্ত মহিলা উপভোক্তারা এই প্রকল্পের অধীনে মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৪০ শতাংশ সরকারি সহায়তা পাবে।[৮১]

বিপর্যয় মোকাবিলা সহায়তা প্রকল্প

বিপর্যয়ের সময় সাধারণ প্রশাসনের সহায়তায় মৎস্য দপ্তর মৎস্যজীবীদের উদ্ধারকার্যে সহায়তা করে থাকে। বিপর্যয় পরবর্তী পর্যায়ে জলাশয় পরিশোধনের জন্য চুন, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট প্রদান করা হয়। ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদের দেওয়া হয় নৌকা, জাল ও হাঁড়ি। ২০০৯ সালের আয়লা ঝড়ের পর পাথরপ্রতিমা ব্লকে ক্ষতিগ্রস্তদেরকে বিঘা প্রতি ৫/৬ হাজার টাকা, কাকদ্বীপ ব্লকে ১ হেক্টর জমিতে ৩৫/৩৬ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে।[৮২] ২০২১ সালে ইয়াস ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যজীবীদেরকে বড় পুকুরের জন্য ৪,০০০ টাকা, ছোট পুকুরের জন্য ১,০০০ টাকা এবং যে সমস্ত মৎস্যজীবীদের নৌকার ক্ষতির পরিমাণ কম তাদেরকে ৫,০০০ টাকা, পূর্ণ ক্ষতির জন্য ১০,০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মথুরাপুর, কুলপি ইত্যাদি এলাকায় বাগদা চিংড়ির মীন, ভেনামি চিংড়ি, পার্সে, ভাঙনের চারা এবং ২,৬০০ টাকা করে জাল ও হাঁড়ির জন্য প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া সুন্দরবনের প্রতি ব্লকে কম বেশি এরেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে।[৮৩] ২০২১ সালের আমফান ঝড়ের পরবর্তী সময়ে

পাথরপ্রতিমা ব্লকে ১২ টি সাইকেল ও ১৫ টি ইনসুলেটেড বাক্স দেওয়া হয়েছে। মৎস্যজীবী ভেড়ির মালিকদেরকে ৪৭,০০০ মীন ও কাঁকড়ার চারা দেওয়া হয়েছে।[৮৪]

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে বলা যায় যে সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের উন্নয়নে সরকারী বিভিন্ন প্রকল্পের অবদান অনস্বীকার্য। মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর, সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, অরণ্য ভবন প্রভৃতি দপ্তরগুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের দরিদ্র মৎস্যজীবীদের নিকট সরকারি এই প্রকল্পগুলো তাদের নতুন দিশা দেখাচ্ছে। এই দপ্তরগুলো তাদের উন্নয়নমূলক কাজের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিস্থিতিকে পরিবর্তন করে মৎস্যজীবী মানুষদেরকে আশার আলো দেখাচ্ছে।

সূত্রনির্দেশ

১। Madhumita Mukherjee, Fishers, Fishery and Gear in Sunderban Wetlands, Dr. Madhumita Mukherjee (Ed.), Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours, Government of West Bengal, 2007, P-115.

২। Report of Fisheries Department as desired by the District Magistrate, South 24 Parganas, Fishermen Population as on 01.01.2022, West Bengal Fisheries Department, Patharpratima.

৩। Rup Kumar Barman, Fiseries and Fishermen: A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal (Delhi: Abhijeet Publications, 2008), Pp-89-90.

৪। Government of West Bengal: Report of the Master Plan Committee, Vol-II, Pp-68-69.

৫। Ibid, P-66.

৬। Rup Kumar Barman, Fiseries and Fishermen: A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal, Ibid, P-90

৭। Ibid, P-90.

৮। Ibid, Pp-91-93.

৯। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Thirty-Nine Session, July-October, 1964, P-1027.

১০। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Thirty-Nine Session, July-October, 1964, P-1027.

১১। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-One Session, November-January, 1965-66, P-102.

১২। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-One Session, November-January, 1965-66, P-102.

১৩। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-One Session, November-January, 1965-66, P-103.

১৪। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-One Session, November-January, 1965-66, P-103.

১৫। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-One Session, November-January, 1965-66, P-642.

১৬। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-One Session, November-January, 1965-66, P-642.

১৭। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-One Session, November-January, 1965-66, P-642.

১৮। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Thirty-Six Session, July-September, 1963, P-455.

১৯। Assembly Proceedings Official Report, West Bengal Legislative Assembly, Forty-Two Session, December-March, 1966, P-269.

২০। Sundarban Region Interim Development Plan, A Pilot Project for Conprehensive Development of Rural Region in West Bengal, 10 Years Development Programme, Sundarban Development Board, Development & Planning Department, Government of West Bengal, P-7.

২১। Ibid, P-8.

২২। Ibid, P-18.

২৩। Ibid, P-18.

২৪। Ibid, P-18.

২৫। Ibid, P-18.

২৬। Ibid, P-18.

২৭। Ibid, P-18.

২৮। Sundarban Region Interim Development Plan, A Pilot Project for Conprehensive Development of Rural Region in West Bengal, 10 Years Development Programme, Sundarban Development Board, Development & Planning Department, Government of West Bengal, P-19.

২৯। Ibid, P-19.

৩০। Ibid, P-19.

৩১। Ibid, P-19.

৩২। Ibid, P-19.

৩৩। সূর্য্যেন্দু দে, মাছ, জল মৎস্যজীবী (১ম) (উত্তর চব্বিশ পরগনাঃ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, ১৪২৪), পৃ-৫৩।

৩৪। Rup Kumar Barman, Fiseries and Fishermen: A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal, Ibid, Pp-96-100.

৩৫। Ibid, P-83.

৩৬। Ibid, P-102.

৩৭। Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No-SDB/FISH- 35/85, No Page Number.

৩৮। Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No-SDB/FISH- 35/85, No Page Number.

৩৯। Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No-SDB/FISH- 35/85, No Page Number.

৪০। Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No-SDB/FISH- 35/85, No Page Number.

৪১। Sundarban Development Board, Government of West Bengal, File No-SDB/FISH- 35/85, No Page Number.

৪২। Administrative Report of Sundarban Development Board, Mayukh Bhavan, Kolkata.

৪৩। Ibid.

৪৪। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৪৫। Hand Book of Fisheries Statistics 2016-17, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Kolkata, September-2017.

৪৬। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৪৭। Administrative Report of Sundarban Development Board, Mayukh Bhavan, Kolkata.

৪৮। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৪৯। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Marine Fisheries Department, Government of West Bengal, Diamond Harbour, South 24 Parganas.

৫০। Hand Book of Fisheries Statistics 2016-17, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Kolkata, September-2017.

৫১। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Marine Fisheries Department, Government of West Bengal, Patharpratima, South 24 Parganas.

৫২। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৫৩। Ibid.

৫৪। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Marine Fisheries Department, Government of West Bengal, Diamond Harbour, South 24 Parganas.

৫৫। Ibid.

৫৬। Administrative Report of Sundarban Development Board, Mayukh Bhavan, Kolkata.

৫৭। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৫৮। Administrative Report of Sundarban Development Board, Mayukh Bhavan, Kolkata.

৫৯। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Marine Fisheries Department, Government of West Bengal, Diamond Harbour, South 24 Parganas.

৬০। Ibid.

৬১। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৬২। Administrative Report of Sundarban Development Board, Mayukh Bhavan, Kolkata.

৬৩। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৬৪। Ibid.

৬৫। Ibid.

৬৬। Ibid.

৬৭। Ibid.

৬৮। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Marine Fisheries Department, Government of West Bengal, Diamond Harbour, South 24 Parganas.

৬৯। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৭০। Ibid.

৭১। Ibid.

৭২। Ibid.

৭৩। Ibid.

৭৪। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, Uttar 24 Parganas.

৭৫। Ibid.

৭৬। Ibid.

৭৭। Ibid.

৭৮। Ibid.

৭৯। Ibid.

৮০। Ibid.

৮১। Ibid.

৮২। Report of the Development Scheme for Fisheries and Fishermen, Department of Fisheries, Marine Fisheries Department, Government of West Bengal, Patharpratima, South 24 Parganas.

৮৩। Ibid.

৮৪। Ibid.

তৃতীয় অধ্যায়

স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবন চিত্র

"তিনটি নৌকা ভাটার টানে তরতর করে নেমে এল, পুবের কেষ্টপুরের খাল-গেট পেরিয়ে, নানা বিলের পাশ কাটিয়ে। তিনটি বাছাড়ি নৌকা। এল পুব থেকে। দুটি এল পুরোখোঁড়গাছি থেকে। আরো আসছে পেছনে পেছনে। তেঁতুলিয়া, সারাপুল, পুরোখোঁড়গাছি, ফতুল্লোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর, তাবৎ পুব-উত্তর আর পুব-দক্ষিণ ঠেঙিয়ে আসছে যাবৎ মৎস্যজীবীরা। জেলে, কৈবর্ত, নিকিরী, চুনুরী, মালো- সবাই আসছে। ওদিককার রাজবংশীরাও কালে কালে মাটি হারিয়ে মৎস্যজীবী হয়েছে। তারাও আসছে। তাড়িয়ে নিয়ে আসছে দখনে বাওড়। যাকে বলে সমুদ্রের ঝড়"।[১]

সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষদের জীবিকার তাগিদে যে জীবন চিত্র অঙ্কিত করা যায়, তার পুরোটাই জুড়ে রয়েছে সংগ্রামী মানসিকতার একটা স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। কেননা প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের মৎস্যজীবীসহ, সুন্দরবনবাসী প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক জীবনের সুস্থ পরিবেশকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাসত্ত্বেও নদী নির্ভর এই মানুষেরা বিকল্প কিছু কাজের অনুসন্ধান থেকে বিরত থেকেও তাদের আর্থসামাজিক জীবনকে সহজ করে গড়ে তুলতে মাছের গন্ধকে ভালোবেসে মৎস্যকেন্দ্রিক জীবনচর্যায় মন্দ্রিত হয়েছে। মৎস্যজীবীদের নিজেদের বক্তব্যের মধ্যেই রয়েছে যে সারা বছর ধরে কৃষিকাজ করে ফসল উৎপাদন করা একটা সময়ের ব্যাপার, যে কারণে খুব সহজে ও দ্রুততার সাথে হাতে অর্থ আসার পথ হল মাছ। সেই মাছ ভেড়িতে, পুকুরে কিংবা নদী-সমুদ্রেই হোক, মাছশিকারে গেলেই হাতে অর্থ আসবেই।[২] এই বিশ্বাস ও ভরসাকে সঙ্গী করে সুন্দরবনে মৎস্যজীবীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠেছে এবং অর্থোপার্জনের এই পথও তাদেরকে আর বেশি করে পরিশ্রমী হতে সাহায্য করেছে। এখন প্রশ্ন হল যে সুন্দরবনের সাবেকি মৎস্যজীবী কারা? এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কিছুটা হয়তো সহজ কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উত্তর দেওয়াটা

অনেকটা কঠিন। কেননা সুন্দরবনের যে ইতিহাস চর্চিত হয় অথবা গবেষকেরা যে ইতিহাস চর্চা করেন সেখানে তথ্যের অপ্রতুলতার কারণে সুন্দরবনের অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করাটা সেভাবে হয়ে ওঠেনি। সেক্ষেত্রে আমাদের কাছে ব্রিটিশ পূর্ব সুন্দরবনের ধারাবাহিক ইতিহাসের বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে পরবর্তী ১৭৭০ সালের পরের ইতিহাস বেশি পরিমাণে প্রাধান্য পেয়ে থাকে, যার ধারাবাহিক প্রগতি সমসাময়িক সময়কাল পর্যন্ত। তবে এসত্য প্রমাণিত যে সরকারি ভাবে জঙ্গল সংস্কার করার জন্যে ধারাবাহিক ভাবে যে মানুষদেরকে সুন্দরবনে নিয়ে আসা হয়েছিল, তাদের মূল পেশা শুরু হয়েছিল আবাদি জমিতে কৃষিকাজ দিয়ে। এদেশীয় ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যই ছিল সুন্দরবন থেকে রাজস্ব আদায় করা। সেই রাজস্ব উৎপাদিত হত কৃষিকাজের মধ্য দিয়ে। কৃষিকাজ ব্যতীত অন্য পেশা থেকে জীবিকা অর্জনের প্রচেষ্টা কিন্তু সুন্দরবনে ধারাবাহিক ভাবে ছিল। এল এস এস ও'ম্যালি তাঁর লেখা 'Bengal District Gazetteers 24 Parganas' গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন যে ৬৩,০০০ মানুষ এই মাছধরাকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহের কাজে নিযুক্ত রয়েছে।[৩] ("Fishing is an industry of considerable importance, furnishing, according to the census figure, 63,000 persons with a means of livelihood.") তাছাড়া ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার তাঁর লেখা 'A Statistical Account of Bengal District of the 24 Parganas and Sundarbans' গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন সুন্দরবনে নদীগুলিতে মাছ উৎপাদনের ব্যাপারে সরকার উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং ৭৭০ একর জায়গা মৎস্য চাষের জন্য বরাদ্দ করেছিলেন।[৪] ("In 1866, Government put up to auction the rights of the fisheries in all the Sundarban rivers......about 2335 acres, of which 770 acres were leased out as fisheries.") সেইঅর্থে ব্রিটিশ শাসকদের সময়কালেও সুন্দরবনের

মানুষ কৃষিকাজের পাশাপাশি অন্য পেশা হিসেবে মাছ সংগ্রহের মধ্যে দিয়েও জীবিকা নির্বাহ করত এক শ্রেণীর মানুষ। ঔপনিবেশিক সময়কালে এরা জেলে নামে পরিচিত। বর্তমানে জেলেদেরকে রুচিসম্মত ভাবে মৎস্যজীবী নামে অভিহিত করা হয়েছে।[৫] সেক্ষেত্রে বলা যেতে পারে এই জেলেরাই হল সাবেকি মৎস্যজীবী। এরা মূলত মৎস্য কেন্দ্রিক জীবিকার মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত করে। এই জেলে সম্প্রদায় মূলত নদীর পাশে অথবা মৎস্যক্ষেত্রের কাছাকাছি বসবাস করে।[৬] এই জেলে সম্প্রদায়ের জেলিয়া কৈবর্ত, মালো অথবা ঝালোমালো, তিয়র, বাগদি, বিন্দ, নমঃশূদ্র, রাজবংশী, পৌণ্ড্র প্রভৃতি জাতির মানুষের কাছে মাছধরাই ছিল পেশা।[৭] অধ্যাপক রূপ কুমার বর্মণ তাঁর লেখা 'Fisheries and Fishermen' গ্রন্থে পেশা ভিত্তিক কিছু মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, তালিকাটি নিম্নরূপ-

জাতি	পেশা
বাগদি	কৃষিকাজ, মাছধরা ও তার সরঞ্জাম তৈরি
বিন্দ	মাছধরা, মাটির কাজ
ঘাসি	মাছধরা, কৃষিকাজ
জেলিয়া জেলিয়া কৈবর্ত	মাছধরা, মাছ বিক্রিকরা ও মাছধরার সরঞ্জাম তৈরি করা
ঝালোমালো	মাছধরা, মাছ বিক্রিকরা ও মাছধরার সরঞ্জাম তৈরি করা
তিয়র	মাছধরা, মাছ বিক্রিকরা ও নৌকা চালানো
রাজবংশী	মাছধরা সহায়ক পেশা
নমঃশূদ্র	মাছধরা সহায়ক পেশা
পৌণ্ড্র	মাছধরা সহায়ক পেশা
(মুসলিম) মহালদার, নিকারী, বাজারি	মাছধরা ও মাছ বিক্রিকরা
গণরী	মাছধরা, মাছ বিক্রিকরা, কৃষিকাজ
দোয়াই	মাছধরা ও মাদুর তৈরি করা

সূত্রঃ- Rup Kumar Barman, Fisheries and Fishermen: A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal (Delhi: Abhijeet Publications, 2008), Pp-14-15.

সুন্দরবনের এই মৎস্যজীবীদের সম্পর্কে অধ্যায়টি লেখার সময়ে অনুভব করেছি যে সাল-তারিখ অনুসারে এদের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়, কারণ হল যথার্থ উপাদানের অপ্রতুলতা। তবুও এদের ইতিহাস লেখার চেষ্টা করছি অনেকটা সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতিতে।

১৭৭০ সাল থেকে সুন্দরবনের আবাদভূমির সম্প্রসারণের কারণে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে এসেছে এবং সেই সূত্র ধরে বিংশ শতকের শেষের দশক পর্যন্ত সমগ্র সুন্দরবনে জনসম্পদের আগমন অব্যাহত ছিল। ১৯৫১ সালের জনগণনার পরিসংখ্যানগত তথ্যে দেখা গেছে সুন্দরবনের জনসংখ্যা ১১,৫৯,৫৫৯ জন ছিল।[৮] ১৯৬১ সালের জনগণনার তথ্যে দেখা যায় সুন্দরবনের জনসংখ্যা হয়েছিল ১৪,৪৬,২৮২ জন, ১৯৭১ সালে জনসংখ্যা বেড়ে গিয়ে সুন্দরবনের জনসংখ্যা হয়েছিল ১৮,০০,০০০ জন।[৯] ১৯৬১-১৯৭১ সালে সুন্দরবনে মোট জনসংখ্যার মধ্যে ৪২,১৪০ জন বাগদি, ৪,৩৯৭ জন জেলিয়া কৈবর্ত, ৬২,৬০৩ জন নমঃশূদ্র, ৩,৬২,০৮০ জন পৌণ্ড্র, ২৬,২১৪ জন রাজবংশী, ৩,৫৭৩ জন তিয়র, ৭৮৬ জন সুণরী।[১০] রূপ কুমার বর্মণ মহাশয়ের দেওয়া তথ্যে মৎস্যজীবীদের যে তালিকা দেওয়া হয়েছে, উল্লিখিত ১৯৬১-১৯৭১ সালের সুন্দরবনের জনসমাজের যে তথ্য তুলে ধরা হয়েছে উভয় দিক পর্যালোচনা করে বলা যেতে পারে সুন্দরবনের সমাজব্যবস্থাতে মৎস্যজীবীদের মৎস্যকেন্দ্রিক জীবন চর্যার একটা ধারাবাহিকতা ছিল এবং বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত তা বিরাজমান রয়েছে।

সুন্দরবনের বসবাসকারী মালো ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের জেলে মানুষেরা মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করে। সুন্দরবনের সাতজেলিয়া, গোসাবা, ঝড়খালি, কচুখালি, হাসনাবাদ, হাড়োয়া, রায়দীঘি প্রভৃতি এলাকাতে বসতি বিস্তার করে রয়েছে।[১১] এদের আদিবাসভূমি উত্তরবঙ্গ। বাংলার বারো ভূঁঞ্যার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের সেনাবাহিনীতে রাজবংশীরা কাজ করত। তারাই এখানে স্থায়ী

বাসিন্দা হয়ে থেকে গেছে।[১২] সুন্দরবনে মালোরা এসেছে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা থেকে।[১৩] ঔপনিবেশিক পূর্ব ও ঔপনিবেশিক সময় থেকে মালোরা মাছধরাকে কেন্দ্র করে তাদের জীবিকা পরিচালিত করে আসছে, যদিও এদের কিছু মানুষ কৃষিকাজও করে থাকে।[১৪] মৎস্যজীবী কৈবর্তদের প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩/৪/১২)। তাদের প্রধান জীবিকা ছিল নৌ-চালানো ও মৎস্য শিকার।[১৫] ভারতীয় ইতিহাসে অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে বাংলায় পাল ও সেন যুগের শাসনকালে এই কৈবর্ত সম্প্রদায়ের উল্লেখযোগ্য অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। এদের দুটি ভাগের মধ্যে জেলিয়া কৈবর্ত সম্প্রদায় মাছধরার সঙ্গে যুক্ত।[১৬] মৎস্যজীবী আর এক জাতি ব্যগ্রক্ষত্রিয় অর্থাৎ বাগদি। এরা কর্মঠ ও সাহসী। এদের আদিবাসভূমি ভারতের তামিলনাডুতে। এই জাতির কোন একটি শাখা রাঢ় অঞ্চলে চলে আসে এবং পরবর্তী সময়ে সুন্দরবনে এসে বসতি বিস্তার করে। বাগদিরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত যথা- তেঁতুলিয়া, দুলে, জেলে, তিবর ও মেটে বাগদি।[১৭] সুন্দরবনের মথুরাপুর, ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা, সন্দেশখালি, জয়নগর, কুলতলি, নামখানা, গোসাবা, সাগর, হাসনাবাদ প্রভৃতি জায়গায় বাগদিরা আছে।[১৮] কৈবর্তদের কোন একটি অংশের জীবিকা মৎস্যশিকার।[১৯] ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতে মাছধরা ব্যাপারটকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কখনই দেখা হত না, যদিও 'ভাতে-মাছে' উদর পূর্ণ করার প্রবণতা ও লোভ দুটোই রয়েছে বাঙালির তথা ভারতীয়দের। এই মৎস্য নির্ভর জীবিকা কেবলমাত্র সুন্দরবনের জেলে সম্প্রদায় নয়, বর্তমানে সব ধর্মের ও সম্প্রদায়ের মানুষই তাদের জীবিকা হিসেবে মৎস্য নির্ভর হয়ে পড়েছে। সুন্দরবনের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ এই জীবিকার ওপর নির্ভরশীল।[২০] প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে প্রচুর উদ্বাস্তু মানুষ সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল। এই শরণার্থীদের আগমন ১৯৪৭ সালের পরে হলেও, ১৯৪৬ সালের নোয়াখালীর দাঙ্গার

পর থেকে এরা নিজেদের ভিটেমাটি ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানের চট্টগ্রাম, বরিশাল, নোয়াখালী প্রভৃতি জেলা থেকে চলে এসে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে পুনর্বাসন পেয়েছিল। পরে নানা প্রতিবন্ধকতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে এই সর্বহারা মানুষগুলো সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, মরিচঝাঁপি, সাগর প্রভৃতি এলাকাগুলিতে বসতি বিস্তার শুরু করেছিল। পুনর্বাসনের সুবাদে জীবিকার তাগিদে এরা বিভিন্ন ধরণের পেশাকে অবলম্বন করে জীবন চালিত করেছিল। কিন্তু এই ধরণের পেশায় তাদের সন্তুষ্টি না থাকায় এরা মূলত মাছ সংগ্রহকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিল। বিকাশ রায়চৌধুরী তাঁর The Moon and Net গ্রন্থে লিখেছেন—"When they came over to India they were, no doubt handicapped for some time and had to take to a number of Non-caste ocupations for bare subsistance. But that was only a temporary phase. They were always on the look out for an opportunity for starting their traditional occupation."[২১]

সুন্দরবনের নদী-নালা-খাল-বিল ও নদীর মোহনায় বেশ কিছু মাছ পাওয়া যেত যা দৈনন্দিন জীবনের খাদ্যতালিকাভুক্ত ও অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- ইলিশ (টেনুওলোজা ইলিশা), খয়রা জাতীয় মাছের বিভিন্ন রকমের প্রজাতি (অ্যানোডনটোসটমা চাকুন্ডা, অ্যানোডনটোসটমা থাইল্যান্ডডিই, গনিয়েলোজা মানমিনা) ঢেলা ইলিশ (ইলিশ ইলংগ্যাটা), বিভিন্ন প্রজাতির ফেঁসামাছ (রাকুন্ডা রুস্সোলিত্রনে, কাইলিয়া রামকরাতি, কাইলিয়া রেনল্ডি, সেটিপিন্না ফাসা, সেটিপিন্না টাটি), ভিন্ন প্রজাতির ট্যাংরা (মিস্টাস গুলিও, মিস্টাস ক্যাভাসিয়াস), কানমাগুর (প্লোটোসাস ক্যানিয়াস), পাঙালমাছ (পাঙ্গাসিয়াস পাঙ্গাসিয়াস) চেনোসমাছ (চেনোস চেনোস), নিহেড়ে বা ভোম্‌লামাছ (হারপোডোন নিহেরিয়াস), ভেটকিমাছ (ল্যাটিস ক্যালকেরিফার), ভিন্ন

প্রজাতির চাঁদামাছ (চান্দানামা প্যারামবেসিস, ব্যাকুলিস; প্যারামবেসিস রাঙ্গা), কাটকই (টেরাপন জারবুরা), নড়েভোলা (অটেলিথোইডিস বাইউবিটাস), লালভোলা (পামা পামা), পায়রাতালি (এট্রোপ্লাস সুরাটেনসিস), পারসে (লিজা পারসিয়া), রাম পারসে (লিজা মাইক্রোলেপিস), খরশুলা (রাইনোমিউজিল করসুলা), চ্যাটাপারসে (ভালামিউজিল ক্যান্নসিয়াস), গুরজালি (ইলিউথেরোনেমা টেট্রাডকটাইলাম), শেলে (পলিডাকটাইলাস ইন্ডিকাস), তপসে (পলিনেমাস প্যারডিসিয়াস), বেলেমাছের ভিন্ন প্রজাতি (গ্লাসোগোবিয়াস গিউরিস, ব্রাকি গাবিয়াস নানুস, গবিওপটেরাস চুনো), ডাকুমাছ (পেরিওপথ্যালমোডান ক্লেকাসেস্‌রি, পেরিও থ্যালমাস কোলরেউটোরি), পাতা মাছ বা বাঁশপাতা (লেপ্টুরাকান্থাস পান্টুলাই, লেপ্টুরাকানথাস গ্যাংগেটিকাস), ইত্যাদি। আরও অন্যান্য যে সব মৎস্য প্রজাতি পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে বিভিন্ন চিংড়ি (পিনিয়াস মোনোডন), যেমন চাপড়া চিংড়ি (পিনিয়াস ইন্ডিকাস), মোচা চিংড়ি (ম্যাক্রোব্রাকিয়াম রুডি), গলদা চিংড়ি (ম্যাকোব্রাকিয়াম রোজেনবারগাই), চামনে চিংড়ি (মেটাপিনিয়াস ব্রেভিকরনিস), লাল চিংড়ি (প্যারাপিনিয়াস স্কালপোটিলিস), টেকো চিংড়ি (প্যারাপিনিওপসিস স্টাইলিফেরা), ফুল চিংড়ি (এসেটিস ইন্ডিকাস), সমুদ্র কাঁকড়া (স্কাইলা সেরেটা), চিতি কাঁকড়া (পরটোনাস পেলাডিকাস), লাল কাঁকড়া (উক্কা অ্যাকুটা), মরুলী মাছ (রাইনোব্যাটোস অন্নানডালিই) এবং বৃহৎ মৎস্য প্রজাতি হাঙর (চিল্লোসকাইল্লাম গ্রিসেয়াম), করাত হাঙর (প্রিস্টিস মাইক্রোডোন) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া উল্লেখযোগ্য বেশ কিছু মিষ্টি জলের মাছ হল মেজরকার্প জাতীয়- রুই (লেবিও রোহিতা), কাত্‌লা (কাত্‌লা কাত্‌লা), মৃগেল (সিরহিনাস মৃগেলা), বাটা (লেবিও বাটা), সিলভার কার্প (হাইপোপ্‌ থ্যালমিক্‌থিস্‌ মলিট্রিক্স্‌), গ্রাস কার্প (টিনোফ্যারিংগোডন আইডেলা), বিগহেডকার্প, কমনকার্প (সাইপ্রিনাস কার্পিও), তেলাপিয়া। জিওল প্রজাতির কই (অ্যানাবাস্‌ টেস্‌টিউডিনিয়াস), মাগুর

(ক্ল্যারিয়াস ব্যাট্রাকাস্), শিঙ্গি (হেটারোপ্‌নিউস্টিস্ ফোসিলিস)।[২২] তাছাড়া মানির কার্প প্রজাতির মৌরালা, চাঁদা, শোল, ট্যাংরা প্রভৃতি।[২৩] যদিও সুন্দরবনের পরিবেশের বাস্তুতান্ত্রিক অবনমনে বহু প্রজাতির মৎস্য অবলুপ্ত হতে শুরু করেছে। রাক্ষসখালি, গোবিন্দপুর, পাথরপ্রতিমার মৎস্যজীবী মহাদেব দোলুই-এর বক্তব্য ‘আগে নদীতে প্রচুর ধরণের মাছ পেতাম, কিন্তু এখন সেগুলো আর দেখি না। বোধহয় সমুদ্রের দিকে সব চলে গেছে। ছোটো নৌকা নিয়ে ওদিকে যেতেও পারি না। বাড়ির পাশের নদী আমাদের ভরসা’।[২৪]

বিংশ শতক জুড়ে সুন্দরবন জঙ্গল পরিষ্কার করার সময় নামখানা, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, সাগর প্রভৃতি দ্বীপগুলিতে প্রচুর মানুষ এসে বসবাস করতে শুরু করেছিল। বিশেষ করে মেদিনীপুরের থেকে এসে তারা সুন্দরবনের এই দ্বীপগুলিতে জমিদারদের থেকে অনুমতি নিয়ে বসতি গড়ে তুলতে শুরু করে। ১৯৩০ এর দশকেও মাছকে কেন্দ্র করে জীবিকার প্রাধান্য দেখা যায়নি। পাথরপ্রতিমার জি-প্লট দ্বীপের অধিবাসী নব্বই ঊর্দ্ধ ভুবন পাত্রর বক্তব্য— ‘আমার বয়স তখন ৭ বছর। বাবা ও মা, আমাদের পাঁচ ভাইবোনদেরকে সঙ্গে করে মেদিনীপুরের জমিদার বাবুর নায়েব সাগরদ্বীপের রুদ্রনগরে নিয়ে আসে। সেখানে আমাদের অবস্থা ভালো ছিল না। তখন এক বছর পরে আমারা জি-প্লটের গোবর্ধনপুরে চলে আসি। নায়েব আমাদেরকে অনেকটা জমি দিয়েছিলেন। আমার মনে আছে, সেখানে একটা বড় পুকুর ছিল। প্রচুর মাছ দেখে বাবা আর মা জাল দিয়ে মাছ ধরতে নেমে গেল। সেই থেকেই মাছধরার প্রতি আমাদের পরিবারের একটা নেশা আরও জোরদার হল, কৃষিকাজও করতাম। কিন্তু টাকার জন্য মাছধরাই পেশাতে পরিণত হয়েছিল’।[২৫] বর্তমানে যে ফিশিং নিয়ে এত চর্চা বিংশ শতকের প্রথমার্ধে কিন্তু এত আলোচনা ছিল না। এই মাছধরা ও বিক্রি করার সঙ্গে সমাজের নিম্নবর্গীয় দরিদ্র শ্রেণীর মানুষেরা যুক্ত ছিল এবং

আছে। তারা ছিল মূলত অস্পৃশ্য। সুন্দরবনের পিয়ালী নদী, পাঠানখালি নদী, মাতলা খাল, মণি নদী, জগদ্দল নদী, বারাতলা বা মুড়িগঙ্গা প্রভৃতি নদীতে যেমন মাছ ধরা হত, তেমনই খাল-বিল-ঝিল, ডোবা, পুকুর ও ভেড়িতে থেকেও মাছ সংগ্রহ করা হত। প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যেত। প্রথমদিকে সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গায় মৎস্যজীবী জেলে মানুষেরা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে ঘুরে মাছ বিক্রি করত। এখনও শহরের বিভিন্ন অলি-গলিতে সাইকেলের পেছনে ও তিন চাকার ভ্যানে মাছের হাঁড়ি নিয়ে সকাল থেকে মাছ বিক্রেতাদের যেমন দেখা যায়, সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে মৎস্যজীবী মানুষেরা মাথায় করে অথবা দুজনে মিলে বাঁশের অথবা শক্ত দণ্ডের মধ্যে দড়িতে ঝুড়ি ঝুলিয়ে একসময় এইভাবেই মাছ বিক্রয় করত। পরবর্তীকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে চাহিদা বাড়ে এবং বাজার গড়ে ওঠে। যেখানে মাছ কেনা বেচার কাজ হত। ১৯৫০ এর দশকে সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপগুলিতে যাতায়াত সহজ হলে মাছ বিক্রয়কে কেন্দ্র করে বড়ো বড়ো বাজার তৈরি হয়েছিল। এক্ষেত্রে হিঙ্গলগঞ্জ, ছোটোমোল্লাখালি, দুর্গাদোয়ানি, গোলাবাড়ি, কুলতলি, হাসনাবাদ, ক্যানিং, ন্যাজাট, ধামাখালি, মালঞ্চ, পাথরপ্রতিমা, নামখানার নারায়নপুর ও বকখালি, কাকদ্বীপের নিশ্চিন্তপুর, উকিলের হাট ও অক্ষয়নগর, সাগরদ্বীপের চেমাগুড়ি, এছাড়া ফ্রেজারগঞ্জ ও রায়দীঘি উল্লেখযোগ্য।[২৬] এই জায়গা গুলি সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে মাছ বিক্রির বড়ো বড়ো বন্দর বা গঞ্জ বলে চিহ্নিত।

সুন্দরবন হল মৎস্য আহরণের স্বর্ণখনি। সুন্দরবনের নদীগুলিতে চব্বিশ ঘন্টায় দুবার করে জোয়ারভাঁটার খেলা চলে। লবণাক্ত জলের সঙ্গে উত্তর দিক থেকে বাহিত মিষ্টি জলের মিশ্রন ও মাছের উপযোগী অনুখাদ্যের ব্যাপক উপস্থিতির জন্য সুন্দরবনের জোয়ার প্লাবিত নদী-খাঁড়িগুলি নানান প্রজাতির সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও বিচরণের এক আদর্শ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে।

সুন্দরবনের জলজ ফসল বলে পরিচিত বিভিন্ন জাতের মাছে এই নদী-খাঁড়ি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া বর্ষাকালের প্রথম ভাগে যখন এই অঞ্চলের নদী-খাঁড়িতে জলের লবণাক্ততা কমে যায় তখন পূবালি বাতাসে পথ চিনে দূর সমুদ্রের থেকে ডিম পাড়তে ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ ঢুকে মোহনার মুখ দিয়ে নদীতে আসে। এই সময় প্রচুর ইলিশ ধরা পড়ে উপকূলীয় সমুদ্রের মোহনা অঞ্চলে।[২৭] ১৯১০ সালে প্রকাশিত বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের রাজস্ব বিভাগের প্রধান সেক্রেটারির কাছে পাঠানো রিপোর্টে কে জি গুপ্তা উল্লেখ করেছেন- "কার্যতঃ অক্টোবর মাসে বন্যা কমিয়া গেলে মাছ ধরা আরম্ভ হয়। নভেম্বর হইতে মার্চ মাস পর্যন্ত কাজ খুব চলে এবং ডিসেম্বর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মৎস্য ধৃত হয়। কেবল যে প্রধানা নদীতে, যাহাতে বৎসরের সকল সময়ে এমন কি খুব গ্রীষ্মের সময়েও স্রোত থাকে, মৎস্য ধৃত হয় তাহা নহে। বর্ষা শেষ হইয়া গেলে যে সকল কোল ও বউড় বা ধাব (Kols, bours or dhabs) হয় তাহাতেও একমুখ বদ্ধ নদীসহ সংযুক্ত খালসমূহেও মাছ ধরা হয়। বস্তুত শেষোক্ত দুই স্থানেই অধিক পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যায়। বর্ষাকালে এবং কখনও কখনও নভেম্বর মাস পর্যন্ত সমস্ত বড় বড় নদীতে বহুল পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা হয়"।[২৮] সাধারণত সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা মূলত তিনভাবে মাছ সংগ্রহের চেষ্টা করে। প্রথমত- নৌকা সহযোগে নদীতে মাছ ধরা। দ্বিতীয়ত- পুকুর বা ভেড়িতে মাছ চাষ। তৃতীয়ত- বাগদা মীন সংগ্রহ।[২৯] মূলত এই তিনটি পদ্ধতিই মৎস্যজীবীদের কাছে আয়ের পথ। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ১৩টি ও উত্তর ২৪ পরগণার ৬টি মোট ১৯টি ব্লকের প্রায় ৫ লক্ষ মৎস্যজীবী সুন্দরবনের নদী-নালা ও জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহের মাধ্যমে তাদের জীবিকার সংস্থান করে চলেছে।[৩০] সার্বিকভাবে বলা যেতে পারে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা অন্তর্দেশীয় মৎস্য সংগ্রহ (Inland Fishing) ও সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহ (Marine Fishing) এই দুই ভাবে মৎস্যনির্ভর অর্থনীতিতে

যুক্ত রয়েছে।[৩১] জনগণনার পরিসংখ্যান তথ্যে দেখা গেছে ১৯৯১ সালে সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ৩১,৫৪,৮৯০ জন,[৩২] এই সংখ্যা ২০১১ সালের বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৪,২৬,২৫৯ জন।[৩৩] জনসখ্যার এই বৃদ্ধি সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর যেমন একটা চাপ সৃষ্টি করেছিল মাছের চাহিদার ওপর এর ইতিবাচক একটা প্রভাব পড়েছিল।

সুন্দরবনের নদী খাঁড়ি বা নদী-মোহনায় মাছ ধরার জন্য সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় বিভিন্ন ধরণের বিভিন্ন ফাঁসের জাল ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রচলিত এই জালের নাম খুবই বিচিত্র ধরণের। লোকালয়ে মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত হয় বেন্টিজাল বা বেহেন্দি জাল। নদীর চরায় মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করা হয় খ্যাপলা জাল। নৌকার সাহায্যে ব্যবহার করা হয় গয়সা জাল। এছাড়া কলভেসালি জাল, পাটা জাল, ইলিশ ধরা জাল প্রভৃতির সহযোগে মৎস্যজীবীরা সুন্দরবনের নদী-মোহনা ও সমুদ্রে মাছ ধরে।[৩৪] আর এক ঘন ফাঁসের সুতোর জাল মৎস্যজীবীরা ব্যবহার করে যাকে চরজাল বা বেড়ি জাল বলা হতো। এই জাল ছিল লম্বায় প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ গজ, চওড়ায় ৮ থেকে ১০-১২ হাত। সার ভাঁটার সময় নদীর কিনারাতে জল থাকে না। সেই সময় ৭০-৯০ টা খুঁটি সমতল জায়গা ধরে পুঁতে দেওয়া হত। জাল গোটানো অবস্থায় নিচে পড়ে থাকত। জোয়ারের সময় নিচ থেকে তুলে খুঁটির উপরে বেঁধে দেওয়া হত। ভাঁটায় নদীর জল নেমে গেলে বিভিন্ন ধরণের মাছ যেমন- ভেটকি, বোয়াল, ভোলা, চিংড়ি, ট্যাংরা, চুনোপুঁটিসহ প্রায় ৯-১০ মণ মাছ ও প্রচুর কাঁকড়া পাওয়া যেত। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে বড় বড় মাছগুলি সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা থেকে কলকাতার বাজারে চলে আসতো। জেলে বাগদিরা তাদের বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করে পুকুর বা দীঘির জলের বর্ণ দেখে জেনে যেত কি পরিমাণ মাছ থাকতে পারে এখানে, সেই মতো চুক্তি করে খাল বিলের থেকে মাছ সংগ্রহ করে জীবিকা চালাত। আর

এক ধরণের জাল রয়েছে, যেটা চূনামারা নামে পরিচিত। এই জাল ব্যবহার করত জেলেরা মাছ ধরার জন্য। পুকুর-জলাশয়, বা নদীতে ব্যবহার করে চুনোপুঁটি, চিংড়ি মাছ ধরত। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে আরও বিভিন্ন ধরণের জালের প্রচলন রয়েছে মাছ সংগ্রহের জন্য। আরও এক ধরণের মাছ সংগ্রহের প্রচেষ্টা দেখা যায় নদীতে, তা দোন ফিশিং নামে পরিচিত। এই দোনের সাহায্যে নদী বাঁধের উপর থেকে দীর্ঘ শক্ত সরু দড়ি ব্যবহার করে, দড়ির শেষ প্রান্তে ছিপ লাগিয়ে ছোঁড়া হত এই ভাবেও মাছ ধরা যেত। দোনের ব্যবহার যদিও বেশি দেখা যায় নৌকাতে। অর্থাৎ ৭০০ থেকে ৭৫০ ফুটের শক্ত লম্বা সরু দড়িতে ২০০ থেকে ২৫০ এর অধিক সংখ্যক দোন লাগিয়ে, তাতে ছিপ দিয়ে নৌকাতে করে নদীর মাঝে বা সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরা হয়। এসব ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে পরিবারের লোকজনদের নিয়ে মাছ সংগ্রহের কাজ হত। এই দোনে ভোলা, ভেটকি, এছাড়া আরও বড় বড় নানান জাতের মাছ উঠে আসতো, এছাড়া বিভিন্ন জাতের ছোট বড় কাঁকড়াও ধরা পড়ে।[৩৫] মৎস্যজীবীদের দ্বারা ব্যবহৃত মাছধরা জালের বিশদ বিবরণ নিম্নে আলোচিত হলঃ

জালের স্থানীয় নাম	আকৃতি(Shape)	আকার (Size) দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ (ফুট)	কি ধরনের মাছ ধরা হয়/কোন জলে ব্যবহৃত হয়
বেসাল জাল	তেকোণা	২৫-৩৫, ১৮-২০	বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মাছ
ভাসা জাল	শঙ্কু আকৃতি	১৫, ১০-১৫	চিংড়ি, মোহনা আর তীরের যে অংশে ভাটার সময় জল থাকে না সেখানে ব্যবহৃত হয়।
বিহুন্দী জাল	শঙ্কু আকৃতি	৭৫-১৫০, ৭৫-১৫০	চিংড়ি, উপকূলের ছোট ছোট মাছ, ফ্যাঁসা, তপসে, পাতিয়া, ভোলা।
কুমার জাল	আয়তাকার	৫০-৬০, ১৮-২০	বিভিন্ন ধরনের ছোট ছোট মাছ।
চরপাতা জাল	ঐ	২০-৬০, ৮-১০	পার্সে, ভেটকি, ইলিশ (ভাটার সময়ে যেখানে জল থাকে না সেখানে ব্যবহৃত হয়।
খলপাতা জাল	ঐ	৪০-৫০, ১২	পার্সে, ভেটকি, ভাঙন ইত্যাদি (সুন্দরবনের মোহনায় ব্যবহৃত হয়)

ঘটু জাল	ঐ	১০০-১৫০, ৩-৪	ছোট পোনা, পুঁটি, ফলুই, ল্যাটা, জিওল ইত্যাদি (মিষ্টি জলে)
বেলহারি জাল	ঐ	৬০-৭৫, ২০-২৫	সব ধরনের মাছ/ নদী জাতীয় জলে
ছবি জাল	গোলাকার	১২-১৮, ..	পোনা, শাল, শোল, ইত্যাদি/ মিষ্টি জলে
পাঁচকাঠি জাল	শঙ্কু আকৃতি	৪৫-৬০, ৩০-৪০	ট্যাপরা, পাতিয়া, ভোলা, চিংড়ি ইত্যাদি (উপকূলে ব্যবহৃত হয়)
চরঘেরা জাল	আয়তাকার	৩০০-৮০০, ১৫-২৫	পার্সে, খয়রা, ভোলা ইত্যাদি/ উপকূলে ব্যবহার হয়।
মুরালঘাঁটি জাল	ঐ	১৫০-২০০, ৫-৭	মৌরলা, চিংড়ি, ছোট মাছ (অন্তর্দেশীয় জলাশয়ে)
সিক্তি জাল	তেকোণা	১০-১২, ১২-১৫	অন্তর্দেশীয় জলের ছোট ছোট মাছ (খাল, বিল, পুকুর)
তার জাল	আয়তাকার	৩০-৩৫, ১৮-২০	ছোট ও মাঝারি মাছ/ সুন্দরবনের মোহনা ও খাঁড়িতে ব্যবহৃত হয়।
চাঁদি জাল	ঐ	১০০০, ১০-১২	ইলিশ/ উপকূল মোহনা এলাকায় ব্যবহৃত হয়।
সাংলা জাল	ডিম্বাকার	২০-২৫, ১৫	ইলিশ/ মূলত মোহনা, নদী উপকূলে ব্যবহৃত হয়।
সেলিফিস জাল	আয়তকার	১২-১৫, ১৫-২০	সেলি মাছ/ মোহনা ও উপকূল এলাকায় ব্যবহৃত হয়।
কোণা জাল	শঙ্কু আকৃতি	৫০-১০০, ৫০-৬০	ইলিশ/ উপকূল মোহনা এলাকায় ব্যবহৃত হয়।
ছটা জাল	ডিম্বাকার	৩০-৩৬, ২০	ইলিশ, পোনা/ মোহনা ও উপকূলে ব্যবহৃত হয়।
ঘোগু জাল	ঐ	১৮-২০, ২০-২২	মোহনা এলাকায় মাছের ডিম ধরা হয়।
সার্জি জাল	আয়তাকার	৪০-৪৫, ১৫-১৮	সকল ধরনের ছোট ছোট মাছ।
সরণি জাল	ঐ	৭৫-৯০, ১২-১৫	খয়রা, ভোলা/ উপকূলে ব্যবহৃত হয়।
ফাঁদি গুঁতি	ঐ	২০০-৩০০, ১০-১২	বড় মাছের জন্য বিশাল এলাকায় ব্যবহৃত হয়।
বিন জাল	বর্গাকার	৪০-৫০, ৪৮-৫৪	বড় মাছের জন্য/ মোহনা ও উপকূলে ব্যবহৃত হয়।
ফাঁস জাল	আয়তাকার	৫০, ৯	ভেটকি/ মোহনায় ব্যবহৃত হয়।
সারাং জাল	ঐ	৩০-৩৬, ২০-২৪	পোনা, বোয়াল ইত্যাদি/ উপকূলে ব্যবহৃত হয়।
বেড় জাল	ঐ	১৫-২০, ২০-২৫	(উপকূল ও ফিশারি) সব ধরনের মাছের জন্য ব্যবহৃত হয়
কচাল জাল	ঐ	৪০-৬০, ২০-৩০	ভেটকি, পাঙাস, ইলিশ/ মোহনা ও উপকূলে ব্যবহৃত হয়।
জাংলা জাল	ঐ	৪০-৫০, ২০-৩০	ইলিশ, গুরজাওয়ালি ইত্যাদি/ সুন্দরবনের উপকূলে কার্যকরী।
ঠেলা জাল	তেকোণা	১০-১২, ৫-৬	ছোট ছোট বিবিধ মাছ/ খাল-বিল এলাকায় কার্যকরী।
জগত বেড়	আয়তাকার	৫০০০, ১০-৩০	সব ধরনের মাছ/ বিল, মোহনা ও উপকূলে ব্যবহৃত হয়।
চরটানা জাল	ঐ	১০০-১২৫, ৮-১০	ভেটকি, পাঙাস ইত্যাদি/ মোহনা ও উপকূলে ব্যবহৃত হয়।

বাইচ জাল	ঐ	৬০-৭০, ১০-১৫	পোনা ও অন্যান্য বড় মাছ/ অন্তর্দেশীয় জলে কার্যকরী।
মাইয়া জাল	ঐ	১০-১৫, ১২-১৬	খাল-নদীতে বিশেষত কাদার মাছ ধরতে ব্যবহৃত হয়।
চৌঘরা জাল	বর্গাকার	১০-১২, ১০-১২	অন্তর্দেশীয় জলে মূলত ছোট ছোট মাছ ধরতে ব্যবহৃত হয়।
পাতা জাল	আয়তাকার	৪০-৫০, ৩০-৩৫	অন্তর্দেশীয় জলে মূলত ছোট মাছ ও কাদার মাছ ধরতে ব্যবহৃত হয়।
চাত জাল	ঐ	২৫-৩০, ৪-৫	জলাশয়ে, মূলত ছোট মাছ ও মাছেদের ছানা ধরতে ব্যবহৃত হয়।
খেপলা জাল	গোলাকার	১২-১৬, ...	জলাশয়ে, মূলত ছোট ও মাঝারি মাপের মাছ ধরতে ব্যবহৃত হয়।
তেঁদু জাল	ঐ	২৪-৩০, ...	অন্তর্দেশীয় জলে বড় মাছ ধরতে ব্যবহৃত হয়।
বাছাড়ি জাল	ঐ	৩০-৪০, ...	পাঙাস ও অন্যান্য ক্যাটফিস / সুন্দরবনের উপকূলে কার্যকরী।

Source: K C Saha, Fisheries of West Bengal (Alipore: West Bengal Government Press, 1970), Pp-110-112.

মৎস্যজীবীরা তাদের মাছ ধরে আশেপাশের মৎস্যকেন্দ্র ও খুঁটিতে এবং স্থানীয় বাজারে বিক্রি করে বিভিন্ন খাতে খরচের পরে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তা ভাগ/বাটোয়ারা পদ্ধতিতে তারা মোট উপার্জন থেকে সমস্ত ব্যয় বাদ দেয়। তারপরে তারা সাধারণ তহবিল হিসাবে বিবেচনা করা মোট উপার্জন থেকে জাল এবং নৌকা মেরামতের ব্যয় কেটে নেয়। সমস্ত খরচ বাদ দেওয়ার পরে, অবশিষ্ট অর্থ মোট যে ক'জন আছে তা সংখ্যা দ্বারা ভাগ করা হয়। ১০ দিনের ট্রিপে যে অর্থ উপার্জন হয় তার একটা হিসেবের পরিসংখ্যান নিম্নে উল্লেখ করা হল[৩৬]—

১০ দিনের বেহেন্দি জালের ট্রিপে আপাতত মোট উপার্জন অর্থ ৫,০০০ টাকা X ১০দিন= ৫০,০০০ টাকা।

১০ দিনের বেহেন্দি জালে মোট খরচ ১৪,৪০০ টাকা

সুতরাং, মোট সঞ্চয় ৫০,০০০ - ১৪,৪০০= ৩৫,৬০০ টাকা

মোট সঞ্চয়/যে ক'জন ভাগীদার= এক এক জনের অংশ

মৎস্যজীবীরা মাছ সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরণের নৌকা ব্যবহার করে থাকে। নৌকা ছাড়া যেমন সুন্দরবনের একটা দ্বীপ থেকে আর একটা দ্বীপে যাওয়া সম্ভব নয়, তেমন নৌকা ভিন্ন নদী-খাল ও সমুদ্রে মাছ ধরার উপায় নেই মৎস্যজীবীদের কাছে। দেখা গেছে নৌকা গুলিও বেশ চমৎকার। সুন্দরবনে নৌকার দুই ধরণের প্রয়োগ দেখা যায়। দেশি নৌকা (Country Boat) অর্থাৎ দাঁড়-হাল দ্বারা চালিত নৌকা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি যন্ত্রচালিত নৌকা (Makanised Boat)।

মাতলা নদীর পূর্ব দিকে দেশি নৌকার ব্যবহার দেখা যায়। কেননা এখানকার নদী গুলির গভীরতা কম এবং এখানে যন্ত্রচালিত নৌকায় ব্যবহৃত জাল ফেলার পরিসর এখানে নেই বললেই চলে। ১৯৭৩ সালের সংরক্ষণ আইনে সুন্দরবনের ব্যাঘ্রপ্রকল্প এলাকায় যন্ত্রচালিত নৌকা ব্যবহারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। মাতলা নদীর পশ্চিম দিকে অর্থাৎ পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর ও রায়দীঘি এলাকাতে যন্ত্রচালিত নৌকা বেশি ব্যবহার করতে দেখা যায় মৎস্যজীবীদের।[৩৭] গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য যন্ত্রচালিত নৌকা ভিন্ন কার্যকরী অত্যাধুনিক বিদেশী নৌকার আনাগোনা নেই। দেশি ডিঙ্গি নৌকা, যাতে ৪০-৫০ মণ পর্যন্ত মাছ ধরে পেট মোটা নদীর ঢেউতে বেশি না দোলে এই নৌকা মৎস্যজীবীদের প্রিয়। কেবলমাত্র মাছ নয়, জঙ্গলের খালের ভেতরে ভালো করে প্রবেশ করতে পারে তাঁর জন্য এই ডিঙ্গি নৌকা খুবই গুরুত্বপুর্ণ। এই ধরণের নৌকা দিয়ে জঙ্গলের থেকে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করা, মধু সংগ্রহ করা ও কাঁকড়া ধরার জন্য ব্যবহার করে থাকে মউলে-বাউলে ও মৎস্যজীবীরা। দেশি নৌকা নানান মাপের হয়। কোন কোন নৌকা ২৯-৩২ হাত লম্বা, আবার কোন নৌকা ৩৫-৪০ হাত লম্বা হয়। বড় নৌকা গুলি ১০০-১৫০ মণ পর্যন্ত মাছ বহন করতে সক্ষম ছিল। বর্তমানে সুন্দরবন এলাকায় নৌকার যে বিবরণ দেখা

যায় তার থেকে নৌকার কিছু গড়ন ভিত্তিক নাম পাওয়া যায় যেমন- ঘুঘু (ছোট ডিঙ্গি), বেতনাই (গোলপাতা বা জ্বালানী কাঠ বোঝাই করার নৌকা), ছিপ, পানসি, বালয়, ভাউলে, কিস্তি, ভড়, বজরা ইত্যাদি।[৩৮] নদী-খাল-খাঁড়িতে মাছ ধরার নৌকা কেনার জন্য মৎস্যজীবীদের সুন্দরবন ছেড়ে রাজ্যের বাইরে যেতে হয় না। ক্যানিং, কুলতলি, কাকদ্বীপ, নামখানা, নুরপুর ও তাড়দহ এবং ডায়মন্ড হারবারে এই নৌকা তৈরির কেন্দ্র আছে।[৩৯] তাছাড়া সুন্দরবনের মিনাখাঁ, হাড়োয়া, হিঙ্গলগঞ্জ, সন্দেশখালি, হাসনাবাদ, ক্যানিং, বাসন্তী, ঝড়খালি, গোসাবা, রাঙাবেলিয়া, মোল্লাখালি, সাতজেলিয়া, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, সাগর, মইপিঠ, ঘুসিঘাটা, মঠবাড়ি, আমলাথেলি, সাহেবখালি, যোগেশগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলে বহু লোকশিল্পীরা ছোট বড় নানান ধরনের নৌকা তৈরি করে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। নৌকা তৈরির জন্য নৌ-শিল্পীরা খিরিশ, অর্জুন, বাবলা, শাল, গর্জন প্রভৃতি গাছের কাঠ ছাড়াও সুন্দরী, ধুন্দল, তরা, গরান, গেঁওয়া, বানি ইত্যাদি কাঠ ব্যবহার করে থাকে। এই অঞ্চলের বাগদি, জালিয়া, রাজবংশী, ছুতোর, তিয়র, চাঁড়াল, পৌণ্ড্র, মালো, মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ নৌকা নির্মাণ কাজ করে থাকে।[৪০]

খুবই সহজে মৎস্যজীবীরা এই নৌকা পেয়ে থাকে। সবাই এই নৌকা কেনার সামর্থ্য দেখাতে পারে না। অধিকাংশ সময়ে বড় লোকেদের কাছ থেকে বন্ধকি সুদে টাকা ধার নিয়ে অথবা কিস্তিতে টাকা পরিশোধের মাধ্যমে মৎস্যজীবীরা নৌকা নিয়ে আসতো। বর্তমানে দেশি ও যন্ত্রচালিত নৌকা এবং জাল দুটোই ব্যাঙ্কের থেকে পাওয়ার অনেক সুবিধা তৈরি হয়েছে মৎস্যজীবীদের কাছে।[৪১] বর্তমানে এই পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে ঠিকই, পূর্বে কিন্তু মৎস্যজীবীদেরকে আড়তদার, ধনী মহাজনদের কাছ থেকে নৌকা সংক্রান্ত সরঞ্জামের পরিষেবা নিয়ে তবেই নদীতে যেতে হত। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ‘পদ্মা নদীর মাঝি’ উপন্যাসে কুবেরের মতো

জেলেদের জীবন চিত্রের ছবি এঁকে এই সত্যই তুলে লিখেছেন "কুবের মাঝি মাছ ধরিতেছিল দেবীগঞ্জের মাইল দেড়েক উজানে। নৌকায় আরও দুজন লোক আছে, ধনঞ্জয় এবং গণেশ। নৌকাটি বেশি বড় নয়। এই নৌকাটি ধনঞ্জয়ের সম্পত্তি, জালটাও তারই। প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের, বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। নৌকা এবং জালের মালিক বলিয়া ধনঞ্জয় কম পরিশ্রম করে। আগাগোড়া সে শুধু নৌকার হাল ধরিয়া বসিয়া থাকে"।[৪২]

কুবেরের মতো সুন্দরবনের বহু জেলে মৎস্যজীবীদের একই অবস্থা দেখা যায়। জীবনের বেশির ভাগ সময়টা তাদের নদী-নৌকা করে কেটে যায়। অমিতাভ ঘোষ তাঁর 'ভাটির দেশ' উপন্যাসে জেলেদের এভাবেই বর্ণনা দিয়েছেন— "ডিঙির ওপর মাছ ধরতে ব্যস্ত লোকটাকে এতদূর থেকে খুব একটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ও যে পাকা জেলে সেটা দিব্যি বোঝা যাচ্ছিল। থুতনি আর গালে সাদা ছোপ ছোপ— দূরবীন দিয়ে দেখে মনে হয় খোঁচা খোঁচা সাদা দাঁড়ি। মাথায় পাগড়ি মতো কিছু একটা জড়ানো, কিন্তু সারা গা খালি; শুধু কোমরে একটুকরো কাপড় মালকোঁচার মতো করে বাঁধা। শরীরটা কঙ্কালসার ক্ষয়াটে মতো, নোনা হাওয়া আর রোদ্দুরে যেন দেহের সব চর্বি-মাংস খেয়ে গেছে— সারাজীবন জলে জলে কাটালে যেমন হয়।"[৪৩] এই জেলে মানুষদের কাছে নৌকাই হল মাছ ধরার অতি প্রয়োজনীয় একটা সরঞ্জাম। বিভিন্ন ধরনের নৌকা ব্যবহার করে মৎস্যজীবীরা নদী-সমুদ্রের মৎস্য সংগ্রহ করে থাকে। কে সি সাহা তাঁর 'Fisheries of West Bengal' গ্রন্থে নিম্নলিখিত বেশ কিছু নৌকার উল্লেখ করেছেন, যে গুলি মূলত মৎস্যজীবীরা ব্যবহার করে।

নৌকার ধরন	স্থানীয় নাম	আকার (দৈর্ঘ্য, প্রস্থ)	গভীরতা	চলাচলের স্থান
ডিঙি	জেলেডিঙি	২০-৪০, ৪-৮	১৫-৫ ফুট	নদী, মোহনা, সমূদ্র উপকূল
চণ্ডী	চন্ডীনৌকা	৬০-৮০, ৮-১২	৬-৮ ফুট	চাঁদি ও অন্যান্য বড় জাল ব্যবহারের জন্য মোহনা ও সমুদ্র অঞ্চল।
বাছাড়ি	বাছাড়ি নৌকা	১৫-৫০, ৩-৬	১.৫-২.৫ ফুট	সমুদ্র উপকূল, মোহনা এবং দূর সমুদ্র অঞ্চল।
পারকিয়া	কন্টাইজেলেডিঙি	১২-১৫, ৩-৫	১-২ ফুট	সমুদ্র উপকূল
উলুবেড়িয়া ধরন	দরিয়া ধরন	৩৫-৫৫, ৪-৬.৫	৩.৫-৬ ফুট	একমাত্র মাছধরা নৌকা দূর সমুদ্রে ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে পারে।
পটুয়া		১০-১৫, ২.৫-৩	৮”-১.৫ ফুট	অগভীর জলে কাজ করে
ছোটো		৩০-৪৫, ৮-১০	৩.৫-৪.৫ ফুট	মোহনা, নদী এবং দূর সমুদ্র অঞ্চল
চর		৩০-৩৫, ৬-৭	৩-৪ ফুট	নদী-খাল
পটমডিঙি		১১-১৯, ৩-৪	১-১.৫ ফুট	অগভীর এলাকা
সলতি		৩০-৪৫, ৬-৭	৩-৩.৫ ফুট	অপেক্ষাকৃত দূর সমুদ্র অঞ্চল
কোসা		২৪-৩৩, ৪-৭.৫	২-৩ ফুট	নদী
পানসি		২৫-২৭, ৬-৭.৫	২-৩ ফুট	নদী
বড় কাছাড়ি		৮৫-৯০, ৭.৫-১২	২-৪.৫ ফুট	নদী
কচল ডিঙি		২৫-৩০, ৪-৬	২-২.৫ ফুট	নদী বিল
বলাগড় ধরন		১৯-৩০, ৪-৬	১.৫-২ ফুট	নদী
বলানি		৩০-৫০, ৬-১১	২-৪ ফুট	অপেক্ষাকৃত দূর সমুদ্র অঞ্চল

সূত্রঃ K C Saha, Fisheries of West Bengal (Alipore: West Bengal Government Press, 1970), P-113

গভীর সমুদ্রে থেকে মাছ সংগ্রহের জন্য যন্ত্রচালিত নৌকার ব্যবহার দেখা যায় পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, রায়দীঘি, সাগর এই সব এলাকায়। মৎস্যজীবীদের কাছে এই যন্ত্রচালিত নৌকা গুলি ট্রলার (Troller) নামেই বেশি পরিচিত। গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার এই ট্রলার গুলি লম্বায় ৫৯ ফুট এবং চওড়ায় ১৬-১৮ ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে, এছাড়া এই সব ট্রলারে ১২০-১২৫ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন বসানো থাকে। এক একটা ট্রলারে ১০-১৫ জন পর্যন্ত মৎস্যজীবী তাদের সামগ্রী নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যেতে পারে।[৪৪] সামুদ্রিক মাছের বিভিন্ন প্রজাতি সারা বছর ধরলেও, বর্ষাকালে ধৃত ইলিশের চাহিদা কলকাতার বাজারে একটু বেশি থাকে। মাতলা নদীর পূর্ব পারের থেকে সংগ্রহ করা মৎস্য স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে ক্যানিং বাজার হয়ে কলকাতার বাজারে চলে

যায়।[৪৫] ১৯৫৩ সালে কাকদ্বীপ থেকে কলকাতা পর্যন্ত বাসরুট চালু হলে যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুবই সহজ হয়েছিলো। তাছাড়া এর পর থেকেই পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ ও নামখানা ব্লকের বিভিন্ন মৎস্যজীবীদের সংগ্রহ করা মৎস্য এই পথেই কলকাতা যেতে শুরু করেছিল।[৪৬] একথা সত্য যে মৎস্যজীবীরা সুন্দরবন থেকে উৎপাদিত মৎস্য বিদেশে রপ্তানি করে অনেক পরিমাণে বিদেশী অর্থ আমাদের রাজ্যে নিয়ে আসে যেটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোকে অনেকটা সমৃদ্ধি দিয়ে থাকে। ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টার সাহেবের বিবরণ অনুয়ায়ী "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে চব্বিশ পরগণা জেলার সমগ্র জনসংখ্যার ১৪ শতাংশ নদী-খাল-বিল থেকে মাছ ধরে বা নৌকা চালিয়ে জীবিকা অর্জন করত। এরা বাস করত নদী বা খাল তীরবর্তী গ্রামগুলিতে। তাঁর মতে হুগলী তীরবর্তী বজবজ, মণিরামপুর ও উড়িয়াপাতা পলতা, বিদ্যাধরী নদীর উপর তাড়দা, কুলটি গাঙের উপর কুলটিবিহারী, বালিয়াঘাটা খালের উপর চিংড়িঘাটা ও তিয়রপাড়া গ্রামগুলিতে মৎস্য ও নৌজীবীদের বাস ছিল। এই জলাশয়গুলি থেকে কি পরিমাণ মাছের উৎপাদন হত তা না জানা গেলেও, তবে এখান থেকে বছরে ৫৯৫ পাউন্ড রাজস্ব আদায় হত"।[৪৭] যার বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৫৭,০০০ হাজার টাকা। বর্তমানে বাণিজ্যিক ভাবে উৎপাদিত মৎস্যের পরিমাণ ও অর্থ সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে জীবিকার একটা জায়গা তৈরি করে দিয়েছে বলা যেতে পারে। মৎস্যজীবীরা বর্তমানে সারা বছর ধরেই নৌকায় থাকে এবং নদী ও সমুদ্রের মাছ ধরে নিয়ে এসে আড়তে অথবা বাজারে বিক্রি করে। সমীক্ষা করে দেখা গেছে ১৯৪৮-৪৯ সালে সুন্দরবন থেকে প্রতিদিন ৩০০ মণ করে মাছ চালান যেত কলকাতাতে।[৪৮] ১৯৭১-৭২ সমীক্ষায় দেখা গেছে প্রতি বছর ৬০০০ এর মতো নৌকা নিয়ে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা মাছ ধরতে যেত।[৪৯] হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন সুন্দরবনের নদী-সমুদ্র থেকে প্রায় ১২,০০০ মৎস্যজীবী বছরে ২,০০০

মেট্রিক টন মাছ সংগ্রহ ও শুকনো করত।[৫০] মৎস্যজীবীরা আগস্ট মাস থেকে মাছ ধরার কাজ শুরু করে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। এই সময়ের মধ্যে নভেম্বর, ডিসেম্বর ও জানুয়ারি মাসে সব থেকে বেশি পরিমাণে মাছ সংগ্রহ করে তারা।

সময়কাল	পরিমান
১৯৬০-৬১ সালে মাছ ধরা হয়েছে	২৫৬৬.৪৯ কুইন্ট্যাল
১৯৬১-৬২ সালে মাছ ধরা হয়েছে	৩২,৪৩৪.১১ কুইন্ট্যাল
১৯৬২-৬৩ সালে মাছ ধরা হয়েছে	৩০,০২৩.২৯ কুইন্ট্যাল

সুত্রঃ- ওয়েস্ট বেঙ্গল, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি কমিটি অন গভর্ণমেন্ট অ্যাসিউরেন্সেস, দি রিপোর্ট (১৯৭২-৭৭), পৃপৃ-৩-৪

উপরিউক্ত তালিকা থেকে আমার জানতে পারি **১৯৬০** থেকে **১৯৬৩** সাল পর্যন্ত মৎস্যজীবীরা তাদের উৎপাদিত মৎস্য পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষের মাছ প্রিয় মানুষদের কাছে তুলে দিয়ে তাদের চাহিদা পূরণের সহযোগিতা করেছে। **১৯৪৭** সালের স্বাধীনতা উত্তরকালে কলকাতার গুরুত্ব উত্তরোত্তর বাড়তে শুরু করেছিল। কাজের জায়গা হিসেবে কলকাতার জনসংখ্যাও বাড়তে শুরু করেছিল। যে কারণে মাছের চাহিদাও দিন দিন বাড়তে শুরু করেছিল। এই চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্য দপ্তর থেকে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে মাছের আমদানি বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া হয়েছিল। দেখা গেছে "**১৯৪৮** সাল থেকে **১৯৬৪** সাল পর্যন্ত কলকাতা ও হাওড়ার বাজারে মাছ সরবরাহের পরিসংখ্যান বিচার করলে দেখা যাবে যে কেবলমাত্র পশ্চিমবাংলার জলাশয়গুলি থেকে মাছ সরবরাহের গত **১৭** বছরে দ্বিগুণেরও বেশি বেড়ে গেছে। **১৯৫৬** সালে এই সরবরাহের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি ছিল। তখন কলকাতা ও হাওড়ার বাজারে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আনীত মাছের পরিমাণ ছিল **১৭৪,৪১৭** কুইন্ট্যাল। আর **১৯৪৮** সালে তার পরিমাণ **৪২,০৩৭** কুইন্ট্যাল।"[৫১] এই চাহিদা বৃদ্ধি সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আরও বেশি করে মৎস্যমুখী করে তুলেছিল বলা যেতে পারে।

বছর	পরিমান (মেট্রিক টন)
১৯৮৪-৮৫	২৬০৪৩.২
১৯৮৫-৮৬	২৩৯৪১.৭
১৯৮৬-৮৭	২২১৪৩.২
১৯৮৭-৮৮	৩১৫৯১.৮
১৯৮৮-৮৯	৪১৫২২.০
১৯৮৯-৯০	৩৩১৩৯.৬
১৯৯০-৯১	৪১৫৬৯.৪
১৯৯১-৯২	৩৭৪০৫.২
১৯৯২-৯৩	৩৬৯০০.০
১৯৯৩-৯৪	৩৪৫৭৮.৫
১৯৯৪-৯৫	২৪৪৭৬.৬
১৯৯৫-৯৬	৩৪২৮০.৪
১৯৯৬-৯৭	৫১১২৬.১

সূত্রঃ- সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব-পরিমন্ডল, (কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২), পৃ-১১১

উপরিউক্ত তালিকা থেকে আমরা **১৯৮৪** সাল থেকে **১৯৯৭** সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের নদী-জলাশয়, সমুদ্র থেকে মৎস্যজীবীদের দ্বারা উৎপাদিত মৎস্য উৎপাদনের ধারাবাহিক তথ্য পর্যালোচনা করে বলতে পারি যে স্থানীয় চাহিদা পূর্ণ করেও এই উৎপাদন রাজ্যের অর্থনীতিকে অনেকটা শক্ত করে তুলতে পেরেছিল। সুন্দরবনে মৎস্য সংগ্রহের আর এক ক্ষেত্র হল ফিশারি অর্থাৎ মৎস্য চাষের ক্ষেত্র। মৎস্যচাষ শিল্প সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মৎস্যচাষ শিল্পটি সুন্দরবনের প্রকৃতিতে বৈচিত্র্যময়, যার মধ্যে রয়েছে মোহনা ও উপকূলীয় মৎস্যসম্পদ। সুন্দরবনের নদীর নোনা জলের জল-সংস্কৃতির কৌশলে যেমন মৎস্যচাষ নির্ভর শিল্প গড়ে উঠেছে, একইভাবে একইজমিতে মাছ চাষের সাথে বিকল্প ধান চাষের অনুশীলন করে মৎস্যজীবীরা ধানসহ-মৎস্য সংস্কৃতির অভিনবত্বকে প্রতিষ্ঠিত করে, তারা তাদের আর্থ-সামাজিক জীবনের পথকে সহজ করে তুলেছে। সুন্দরবনের কৃষি জমিতে নদী থেকে

নোনা জল ঢুকিয়ে চিংড়ির চাষ করা প্রধান জীবিকা। ছোটবড় প্রায় ১৫০০ নোনাঘেরিতে মাছের চাষ করে মৎস্যজীবীরা।[৫২] সুন্দরবনে বছরের বিভিন্ন সময়ে মৎস্যজীবীদের জন্য মাছ চাষের ফিশারি তৈরি হয়েছে। ১৯৫৮ সালের সমীক্ষায় দেখা গেছে সুন্দরবনের হাড়োয়া থানার অধীনে ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সময়ে ২৪৬৯.৩১ একর জমিতে ৯২টি মাছের ভেড়ি তৈরি হয়েছিল।[৫৩] পরবর্তীকালে আরও ফিশারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৮৩ সালে সুন্দরবনের ১৯টি থানাতে ৬২১টি ফিশারি তৈরি করা হয়েছিল।[৫৪] অন্তর্দেশীয় মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের খাল-বিল-জলাশয়গুলিতে প্রাকৃতিক ভাবে উৎপাদিত জল খুবই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে বলে মনে করা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বাস্তুতন্ত্রের ভাসাম্যহীনতার কারণে এই জলাশয়গুলি ক্রমশ হারাতে শুরু করেছে। কৃষিকাজের জায়গাগুলি কৃষিকাজ না করে নদীর লোনা জল প্রবেশ করিয়ে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা করে চলেছে। সুন্দরবনের ৬০,০০০ একর ভালো চাষের জমি যেখানে চাষ বন্ধ করে দিয়ে মাছের ভেড়ি তৈরি করে মাছচাষ হচ্ছে।[৫৫] মৎস্য দপ্তর-পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে থাকা সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক বিপুল গায়েন মহাশয়ের বক্তব্য- “পাথরপ্রতিমা ব্লকের আওতায় ৯২টি মৌজা রয়েছে। প্রতিটি মৌজাই বিপজ্জনক, কেননা নদী ভাঙ্গন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় সবসময় এখানার ভৌগোলিক চেহারা পাল্টে দিচ্ছে। ফলে লোনাজলে কৃষিজমি চাষের অনুপযোগী হয়ে উঠেছে। মাছ চাষ ছাড়া এদের কাছে বিকল্প ভাবনা খুবই কম। কিছু মানুষ ব্যবসা করে, চাকরি করে, কিন্তু অধিকাংশের কাছে নদীই ভরসা। জলাশয়, খাল-বিলে ও ভেড়িতে মাছ চাষ করে টাকা উপার্জন করে জীবন চালায়। কত ভেড়ি আছে এখানে বলা মুশকিল।”[৫৬]

থানা	ফিসারির সংখ্যা
রাজারহাট	৭
গোসাবা	৭
সন্দেশখালি	১১৬
দেগঙ্গা	২১
হাড়োয়া	১৬৯
মিনাখাঁ	৪৮
গাইঘাটা	১
বসিরহাট	৫৪
বারাসাত	৪৮
হিঙ্গলগঞ্জ	৪
হাসনাবাদ	৪৩
পাথরপ্রতিমা	৭
ক্যানিং	৩৩
কুলতলি	৩১
মথুরাপুর	২১
বাসন্তী	১১
মোট-	৬২১টি

সূত্রঃ- হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দি মিস্ট্রি অফ দি সুন্দরবন (ক্যালকাটা, এ মুখার্জী অ্যান্ড কো পিভিটি এলটিডি, ১৯৯৯), পৃ-৯০

উপরিউক্ত যে ফিশারির পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে এগুলির অধিকাংশ কৃষিকাজের জলাভূমি। চাষবাসের পরিবর্তে এখানে মাছচাষের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। ভেড়িগুলিতে গড়ে ৬৯৪ কেজি করে মাছ এবং ৮৭৮ কেজি করে বাগদা চিংড়ি পাওয়া যায়।[৫৭] ৯০ শতাংশ ভেড়িগুলি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তৈরি হয়েছিল। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে সুন্দরবনের উত্তর, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণের ৩২,৯৩০ একর জায়গা জুড়ে অল্প ও বেশি মাত্রার লবণ জলের সহযোগিতায় ১৩৩৪টির মতো ভেড়ি রয়েছে। ১৫,৬১৩ হেক্টর জায়গায় রয়েছে মাঝারি লবণ জলের ভেড়ি।[৫৮] মৎস্যজীবীরা সরাসরি ভাবে ভেড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নয়। কেননা সুন্দরবনের নদীর জল থেকে মীন সংগ্রহ করে এরা এই সমস্ত ভেড়িতে সরবরাহ করে। ১৯৮০র দশক থেকে সুন্দরবনে মীন ধরার প্রতিযোগিতা

শুরু হয়েছিল। এর মূলত কারণ ছিল সুন্দরবনের বিভিন্ন এলাকায় ফিশারির রমরমা।[৫৯] তাছাড়া এর অন্যতম কারণ ছিল বিদেশীরা সুন্দরবনের বাগদা ও গলদা চিংড়ির স্বাদ পেয়েছিল। ১৯৮০ দশক থেকে এই চিংড়ি বরফের কফিনে বন্দি করে বিমানে ও জাহাজে করে পাড়ি দিতে শুরু করেছিল বিদেশের বাজার গুলিতে।[৬০] সুন্দরবন থেকে মাছের একটা বড় অংশ কলকাতার বাজারে সরবরাহ করা হয়। কলকাতার চাহিদা অনুযায়ী শতকরা ১৫-২০ ভাগ সুন্দরবন ও এখানকার মেছোঘেরি থেকে রপ্তানি করা হয়ে থাকে। নতুন করে বাসন্তী থানার ঝড়খালির জঙ্গল পরিষ্কার করে সেখানে ৪০০ হেক্টর ভূমিতে মৎস্য চাষ কেন্দ্র গড়ার কাজ হয়েছে। কম খরচে মৎস্য চাষ করে উৎপাদন বৃদ্ধি করাই উদ্দেশ্য।[৬১] দেখা গেছে এই সমস্ত মেছো ঘেরিগুলোতে এই বাগদার মীন সরবরাহ করার জন্য সুন্দরবনের মানুষের কাছে একটা নতুন কাজের সন্ধান দিয়েছিল নদীর মীন সংগ্রহ করার মাধ্যমে। এরা মূলত মীনসংগ্রাহক বা মীনধরা নামে পরিচিত। মাছধরার মধ্য দিয়ে অতীতেও মানুষের জীবিকা নির্বাহ হত। মীন সংগ্রহ অর্থনৈতিক ভাবে মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছিল সুন্দরবনের গ্রামবাসীদের কাছে। কাজটির মাধ্যমে কেবলমাত্র জীবিকা নির্বাহ করতো সুন্দরবনের নিম্নবিত্ত মানুষদের একটি অংশ। দেখা গেছে নদীর প্রতি এক কিলোমিটারের মধ্যে ৩০০-৪০০ জন মানুষ এই মীন ধরার কাজে যুক্ত রয়েছে, যাদের দৈনিক আয় হয়তো ১০০-১৫০ টাকা পর্যন্ত।[৬২] আবার এই অবস্থাও দেখা গেছে এক এক জনকে দিনে ৩০-৪০ টাকার মীন সংগ্রহ না করতে পেরে বাড়িতে ফিরতে হয়েছে। এই মীন বৈষম্য সুন্দরবনের ছোট থেকে বড় সব বয়সের মানুষকে নদীমুখী করে তুলেছিল। বাগদা সাধারণত সমুদ্রে থাকে। যখন ডিম পাড়ার সময় হয় তখন কম লোনা জলের দিকে জলে আসতে থাকে। সেই সময় সুন্দরবনের নদী গুলিতে সুতোর মতো দেখতে হালকা বাদামী রঙের বাগদার মীন জন্ম হত। যেটা সংগ্রহ করা মৎস্যজীবীদের

একটা পেশা হিসেবে দেখা দিয়েছে। “গঙ্গা ভাগীরথীর মোহনার সাগরসংগম থেকে ইছামতী, রায়মঙ্গল, কালিন্দী মোহনা পর্যন্ত বিস্তৃত গৌড়েশ্বর, বিদ্যা, মাতলা, পিয়ালী, ঘটিহারা, মণি, মৃদঙ্গভাঙ্গা, গোসাবা, সপ্তমুখী, হাতানিয়া-দোয়ানিয়া প্রভৃতি অসংখ্য নদী-খাঁড়ি, ভারানি-দোয়ানির বুক থেকে সারা বছর বাগদা পোনা বা বাগদার মীন ধরা পেশায় যুক্ত আছে সুন্দরবনের হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা।”[৬৩] সমীক্ষা করে দেখা গেছে “সুন্দরবনের জমি হাসিল করা প্রায় ৩৩,০০০ হাজার হেক্টর জমিতে নোনা মাছ ও চিংড়ি চাষ হয়। প্রায় দু’লক্ষ নারী-পুরুষ, কিশোর ও কিশোরী দিন রাত চিংড়ির ‘মীন’ ধরার কাজে ব্যস্ত থাকে।”[৬৪]

“দখিনা বাতাস এলে / থাকে না যে হুঁস,

বাগদা ধরতে ছোটে / অভাবী মানুষ।

জোয়ার লেগেছে দেখো / চলো নদী তটে।

সাগরের পোনা কতো / এসে যাবে ঘাটে।

ঝড়, বৃষ্টি, রোদে এসে / দলে যায় দেহ,

পোনা ধরা থেকে তবু / হটে না তো কেহ।”[৬৫]

(প্রতিকূল পরিস্থিতিকে বিপদসংকুল না মেনে, দখিনা বাতাসের আগমনে সাগরের থেকে ছুটে আসা মীন সংগ্রহ করতে নদীতে নেমে পড়ে এই অভাবি মানুষেরা। পেটের ভাত জোগাড় করার বাসনায় রাত দিন এক করে এই কাজ এরা।)

সুন্দরবনের ইতিহাসে সুন্দরবনের নদীর অবদান সবথেকে গুরুত্বপূর্ন। নদী না থাকলে সুন্দরবনবাসীর জীবনে নেমে আসত দারুণ বিপর্যয়। সুন্দরবনের নদীকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষ তাঁদের জীবিকার পথ খুঁজে পেয়েছে। যেমন নদী ও মানুষের সম্পর্ক বা সুন্দরবনবাসীর প্রাত্যহিকতায় নদীর অবদান কতটা তার একটি উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত জাল টেনে জীবন ধারণের মধ্যে

নিহিত আছে। প্রায় সাড়ে তিন হাত লম্বা বাঁশের চারটি চেড়া, সেগুলি আয়তক্ষেত্রাকারে একে অন্যের সাথে বাঁধা থাকে। এই কাঠামোর সাথে এক প্রকার পাতলা জাল যুক্ত থাকে। জালটি চারকোণা এবং বেশ কিছুটা লম্বা থাকে। বাঁশের চেড়ার সাথে লম্বা দড়ি বাঁধা থাকে। আর ওই দড়ি ধরেই নদীর পাড় ধরে স্রোতের অনুকূল বা প্রতিকূলে একজন টানতে থাকেন। ফলে জালের মধ্যে নানা ধরণের নদীর ছোট ছোট মাছের পোনা আটকে যায়। এই ভাবে বেশ কিছুটা জাল টেনে নিয়ে যাওয়ার পর জালের ভেতরের জঞ্জালপূর্ণ ছোট ছোট মাছের পোনা গুলোকে বাছার কাজ শুরু হয়। বাছাই করার সময় কেবলমাত্র এক ধরণের বিশেষ মাছের পোনাকে আলাদা পাত্রে তুলে রাখা হয়। এবং বাকি সমস্ত কিছু আবার নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এরপর ওই বাছাই করা মাছের পোনা বাজারে বা গ্রামে আসা ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করে যে টাকা পাওয়া যায়, তা দিয়ে সংসার খরচ চালায়। এ ভাবেই চলে তাদের জীবন। এই দৃশ্য সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি অঞ্চলে দেখা যায়। আর যারা এই জাল টানেন তাদের বেশিরভাগ নারী। ওই বিশেষ ধরণের মাছের পোনাকে স্থানীয় ভাষায় মীন বলা হয়। সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের অনেক নারী ও কিশোরী আছেন যারা রোজ সকাল, বিকাল, এমনকি গভীর রাতেও নদীতে জাল টেনে মীন ধরে। এবং এই ভাবে তাদের জীবিকা নির্বাহ করেন। সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের পাঠানখালী অঞ্চল, বাসন্তী ব্লকের পার্বতীপুর অঞ্চল, এমনকি পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট, এল-প্লট, রাক্ষসখালি, কামদেবনগর, বনশ্যামনগর, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর প্রভৃতি ব্লকের অনেক নারী ও কিশোরী আছে যারা রোজ সকাল, বিকাল এমনকি গভীর রাতেও নদীতে জাল টেনে মীন ধরে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবতপুর এলাকার মাধবনগর গ্রামের বাসিন্দা হলেন শেফালি ভূঁএ্যা, পেশায় মীন সংগ্রাহক, তিনি বলেন এই গ্রামের নারী-পুরুষসহ অধিকাংশ মানুষ সুন্দরবনের নদীতে

মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। মীন ধরতে গিয়ে এখানকার অনেক মানুষ কুমিরের আক্রমণে মারা গেছে, অনেকে জলে ডুবে মারা গেছে। তারপরেও এখানকার মানুষের মীন ধরা থেমে নেই। কারণ মীন না ধরলে অনেক পরিবারের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। আর তাছাড়া মীন ধরা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প উপায়ও নেই যার দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহ হয়।[৬৬] ঐ ব্লকের বনশ্যামনগর গ্রামের স্নেহলতা গারু নদী থেকে মীন সংগ্রহ করে পরিবারের আর্থিক অভাব মেটানোর চেষ্টা করে। তিনি বলেন, দিনের অধিকাংশ সময় মীন ধরে কেটে যায়। দুটি সন্তান তার, মীন ধরেই এক মেয়েকে মাধ্যমিক পাস করিয়েছেন। তিনি আরও বলেন যে এই অল্প পরিমাণ আয়ে তো ভালোভাবে আর সংসার চলে না, তার স্বামী দিন মজুরের কাজ করে সেখান থেকেও কিছু পরিমাণ আয় হয়।[৬৭] উক্ত ব্লকের কে-প্লট দ্বীপের শিবুয়া নদীতে মীন ও মাছ ধরে সংসার চালান রেবতী করণ। প্রত্যেক দিন তিনি ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মীন ধরে থাকে। তিনি ১৩ বছর ধরে এই মীন সংগ্রহের কাজে যুক্ত রয়েছে। সারা বছর ধরে নদীর লোনা জলে দেহে চর্মরোগ বাসা বেঁধেছে। জলে থাকতে থাকতে তাদের দেহের চামড়াও নোনা হয়ে গেছে।[৬৮] নামখানা ব্লকের শিবরামপুর গ্রামের বাসিন্দা মিনতি বেরা, তিনি সপ্তমুখী নদীতে ছেলে ও স্বামীকে নিয়ে নৌকায় করে মীন ধরতে যান। সারা দিন নদীতেই থাকে। প্রতিদিন প্রায় ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত আয় করেন। তার কাজ থেকে জানা গেছে, বর্তমানে মীন ধরা প্রায় বন্ধ করে দিচ্ছে সরকার। তবুও বাধ্য হয়ে এই কাজ করে। একশো দিনের কাজেও নানা সমস্যা রয়েছে। তাই জীবিকার জন্য এই নদীই তাদের ভরসা।[৬৯] উক্ত ব্লকের অনু গিরি তার মেয়েকে নিয়ে নদীতে মীন ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। স্বামী ছেড়ে চলে গেছে। তিনি জানান যে, সারাটা সময় ধরে জলের মধ্যে থাকার কারণে কোমরে ও হাঁটুতে বাত ধরেছে। ভালোভাবে সব কাজ করতে পারে না। মেয়ে ছাড়া দেখার কেউ

নেই তার।[৭০] কাকদ্বীপ ব্লকের ফটিকপুর গ্রামের মীন সংগ্রাহক হলেন রেবা বেরা, বয়স ৫৫ বছর। তিনি বলেন এই গ্রামের নারী, পুরুষ, অধিকাংশ মানুষ সুন্দরবনের নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। মীন ধরতে গিয়ে এখানকার অনেক মানুষ কুমিরের আক্রমণে মারা গেছেন, অনেকে জলে ডুবে মারা গেছেন। তারপরেও এখানকার মানুষের মীন ধরা থেমে নেই। কারণ মীন না ধরলে অনেক পরিবারের খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।[৭১] সাগর দ্বীপের কচুবেড়িয়ার বাসিন্দা মানসী মণ্ডল, তিনি দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে নদীর মাছ ধরে জীবিকা চালাচ্ছে। এরা দুই তিন জনের দল করে ছোট ডিঙ্গি নৌকা নিয়ে মাছ ধরে। তিনি বলেন তার স্বামী মারা গেছে, দুই ছেলে আছে। একজন কেরালায় রাজমিস্ত্রির কাজ করে, ছোটো ছেলে পড়াশোনা করে।[৭২] নামখানা ব্লকের দ্বারিকনগর গ্রামের অমিতা মান্না সপ্তমুখী নদীতে মীন ধরতে যান। প্রতিদিন প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ টাকার মীন সংগ্রহ করে। তবে এই রকম আয় সারা বছর হয় না। সেই মীন নামখানার বাজারে বিক্রি করে। মাঝে মাঝে তিনি মাছ বাছাই, জাল সারানোর কাজও করেন। দীর্ঘ কয়েক মাস ধরে তিনি অ্যানিমিয়া ও হাঁপানি রোগে ভুগছেন।[৭৩] পাথরপ্রতিমা ব্লকের আই-প্লট অঞ্চলের মহেশপুর গ্রামের শান্তবালা মাইতি মীন ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। মাঝে মাঝে তিনি আবার কাঁকড়াও ধরেন। তিনি বলেন ছোট কাঁকড়াগুলি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পুকুরে ছেড়ে দেন আর বড়ো কাঁকড়াগুলি কেদারপুর বাজারে বিক্রি করে দেন। সারাদিন নোনা জলে থেকে হাতে পায়ে এলার্জি হয়ে গেছে। তিনি এখন চোখে ভালো দেখতে পান না। তবুও তাকে প্রতিদিন এই কাজে যেতে হয় কারণ তার ছেলেরা তাকে দেখে না।[৭৪] অন্যান্য নারী-পুরুষদের মধ্যে কাকলি মাইতি (বনশ্যামনগর, পাথরপ্রতিমা), নূপুর হাজরা (জি-প্লট, পাথরপ্রতিমা), মহাদেব দোলুই (রাক্ষসখালী, পাথরপ্রতিমা), প্রতিমা গায়েন (এল-প্লট, পাথরপ্রতিমা), এছাড়া আরও অনেকে মাছ ধরে কোনো রকমে সংসার

চালাচ্ছে, ছেলে-মেয়ের পড়ার খরচ মিটিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছে। সুন্দরবনের নদীতে মীন ধরে জীবিকা নির্বাহ করে নূপুর হাজরা। বয়স ৫০ বছর, স্বামী- মৃত বাটুল হাজরা। দুই ছেলের মধ্যে ছোট ছেলে মারা গেছে। বড় ছেলে তাকে দেখে না। ভূমিহীন মানুষ এরা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই নদীর মাছ ও মীন ধরে জীবন চালাতো। ২০০৯ এর আয়লাতে স্বামী বাটুল হাজরা নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। নূপুর হাজরা মীন ধরে ও অন্যের জমিতে দিনমজুরি করে জীবন চালায়। আয়লাতে মাটির বাড়ি পুরোটাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যে কারণে সরকারের পক্ষ থেকে অর্থাৎ জি-প্লট গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এক কামরার একটা পাকা বাড়ি পেয়েছেন। তাছাড়া ১০০ দিনের কাজের জন্য জব-কার্ড পেয়েছেন। তিনি মীন ধরার জন্য নাইলনের একটা জাল কিনেছেন, এতে তাঁর মনে হয়েছে সারাটা জীবন ভাল ভাবে কেটে যাবে।[৭৫] ভগবতপুর গ্রামের বাসিন্দা গীতা দোলুই বলেন— স্বামী পুণ্য দোলুই, ও দুই পুত্র বৌমা নিয়ে ৮ জনের সংসার। স্বামীর বর্তমান বয়স ৭১ বছর, কর্মে অক্ষম। সংসার চালাতে ভরসা দুই ছেলে। গীতা দোলুই নদীতে মীন ধরে সংসার চালাতো। প্রথম জীবনে স্বামী তাকে সমকাজে সঙ্গ দিত। আয়লাতে অল্প পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাতে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০,০০০ টাকা অনুদান পান। দুই ছেলে চাষের কাজ করেন। অর্থ জমিয়ে একটা ছোট নৌকা বানিয়েছে। নদীর মাছ সংগ্রহ করা এখন তাদের পেশা হয়ে উঠেছে। মাঝেমধ্যে জঙ্গলের কাঠ তাঁদের অর্থের ভাণ্ডার পূর্ণ করে।[৭৬] মীন সংগ্রাহকগণ যে মীন ধরে সেগুলো বিক্রি হয় ১০০০ মীনের হিসেবে দাম হয় ২৫০ থেকে ৩০০ টাকায়। অনেক সময় দাম কম বেশি হয়। আর সত্যি বলতে এখানে যদি নদীটা না থাকতো তাহলে হয়ত ভিনরাজ্যে কাজের জন্য যেতে হত।[৭৭]

মৎস্যজীবী মীন সংগ্রাহকদের অনেকের আবার ছোট ছোট নৌকা রয়েছে। নৌকাগুলি লম্বায় ১৬-১৭ ফুট ও চওড়ায় ৫-৬ ফুট। নদীর পাড়েও যেমন মীন ধরা হয়ে থাকে, আবার বেঞ্চজাল দিয়েও অনেকে নদীর মাঝের দিকে গিয়ে মীন ধরে। কেননা নদীর মাঝে বেশি পরিমাণে মীন পাওয়া যায়।[৭৮] পাথরপ্রতিমা ব্লকের শ্রীপ্রতিনগরের বাসিন্দা ৪৬ বছর বয়স্ক কানুপদ দাসের বক্তব্য- ‘বাবা মারা যাওয়ার পর পরিবারের দায়িত্ব আমার কাঁধে চেপে বসে। পড়াশোনা করিনি ছোট থেকেই। বাড়িতে ছোট একটা নৌকা আছে, সেটাতে করে নদীতে মীন ও অন্যান্য মাছ ধরতাম। ২১ বছর বয়সে প্রথম মাছ ধরার জন্য সমুদ্রে যাই। নামখানার এক মালিকের নৌকাতে থেকে ১৫ বছর ধরে সমুদ্রের মাছ ধরেছি। নৌকা থেকে যা আয় হত তাই দিয়ে সংসার চলেছে। দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি এই আয় থেকে। ২০০৯ সালে আইলার ঝড়ে আমাদের নৌকা জম্বুদ্বীপের কাছে উল্টে যায়। গঙ্গামা প্রাণ ফিরিয়ে দিয়েছেন। সমুদ্রের ঢেউ দেখে ভয় পাইনা, কিন্তু আইলার পর আর সমুদ্রমুখী হইনি। নিজের দুই বিঘে জমি আছে, মাছ চাষ করি, এভাবেই ভালো আছি।’[৭৯] উল্লিখিত তথ্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় ‘জলে কুমির-ডাঙায় বাঘ’ এই যে বিপর্যয় ও প্রতিকূলতা তা কোন ভাবেই মৎস্যজীবীদের দৈনন্দিন জীবন-জীবিকায় বাধা হয়ে দাঁড়ায় না। কেননা অর্থ উপার্জনের জন্য মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোন সংকট তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। জলের সম্পদই তাদের মুখে অন্ন জোগায়। দিন-রাত্রি এক করে মৎস্যজীবীরা কায়িক পরিশ্রমের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদ উৎপাদনে ব্যস্ত থাকে। সুন্দরবনের মীন সংগ্রহকারীদের দ্বারা ধৃত মীনের একটা তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল—

বছর	দৈনিক মাথাপিছু গড় মীন সংগ্রহ	দৈনিক আড়ৎদার পিছু গড় মীন সংগ্রহ	গড় মৃত্যুর হার (শতকরা)	প্রতি হাজার মীনের গড় মুল্য
১৯৯১	৯২৫	৫৫০০০	৪৫	১০৬
১৯৯২	১৩০	২৮০০০	৮	৩৩৩
১৯৯৩	১৪৫	৪৩০০০	২	১৫৭
১৯৯৪	৫০	১৪০০০	৯	১০৬০
১৯৯৫	৪৬	৯০০০	১৬	১২১০
১৯৯৬	৩৮	৭০০০	১১	১৩৯০
১৯৯৭	৩৩	৫০০০	১৩	১৪৭০
১৯৯৮	৩১	৫০০০	১৩	১৪২০
১৯৯৯	২৯	৪০০০	১৫	১৫৯০
২০০০	১৮	২০০০	১৭	১৮৮০
২০০১	২২	২২০০	২২	১৭৬০
২০০২	১৭	২০০০	১৫	১৮২০
২০০৩	১৩	১৭০০	৭	১৮৭৫

সূত্রঃ- গৌতম কুমার দাস, সুন্দরবন পরিবেশ ও মানুষ (কলকাতা, শরৎ বুক ডিস্ট্রিবিউটারস্, ২০০৫), পৃ-৫০

উল্লিখিত পরিসংখ্যানগত তথ্যে ১৯৯১ সাল থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত নদীর বাগদা মীন সংগ্রহের মধ্য দিয়ে পরিবহণ ও বার্ষিক গড় আয় সংক্রান্ত যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট যে এই মীন সংগ্রহকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মীন সংগ্রাহকরা তাদের জীবিকার তাগিদে অর্থ সংগ্রহের একটা ভালো পথ পেয়েছিল, যার ধারা আজও অব্যাহত। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা একমাত্রিক জীবিকায় নয় বহুমাত্রিক জীবিকার সন্ধানে নিজেদেরকে ব্যস্ত করে রাখে। ১৯৬০-৭০ এর দশক গুলিতে পশ্চিম সুন্দরবন অর্থাৎ কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, জম্বুদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি ব্লক গুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে শাবার বা শুকনো মাছ তৈরির শিল্পক্ষেত্র শুরু হয়েছিল।[৮০] দেশ ভাগের আগে থেকেই শরণার্থীরা পূর্ব-পাকিস্তান থেকে এদেশে আসতে শুরু করেছিল, যার সংখ্যাটাও অনেক। রূপ কুমার বর্মন মহাশয় দেখিয়েছেন ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ৫১ লক্ষ ৪৪ হাজার শরণার্থী এসেছিল। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল

৩৮ লক্ষ ৪১ হাজার।[৮১] এই শরনার্থীর একটা বড় অংশ সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপ গুলিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাছাড়া এদেরই একটা অংশ কাকদ্বীপ, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, এবং পাথরপ্রতিমার ব্লকের দ্বীপগুলিতেও বসবাস করতে শুরু করেছিল।[৮২] এদের মধ্যে অনেকেই বহরাদার হয়ে উঠেছিল। এদের হাত ধরেই কিন্তু শাবার তৈরি হয়েছিল। এই শাবার গুলোতে নদী ও সমুদ্র থেকে তুলে আনা মাছ শুকনো করে পরে বিক্রি করা হত। এই বহরাদাররাই নিম্নশ্রেণীর মানুষদেরকে দিয়ে মৎস্য শ্রমিকের কাজ করাতো। ১৯৬৪ সালের থেকে জম্বুদ্বীপকে কেন্দ্র করে শাবার অর্থাৎ শুঁটকি মাছ শিল্প ব্যাপক আকারে বিস্তার লাভ করেছিল। শাবার শিল্পের সঙ্গে ১২,০০০ মৎস্যজীবী যুক্ত ছিল। বছরে প্রায় ২ হাজার মেট্রিক টন শুঁটকি মাছ শুকানো হত এবং বিক্রি করা হত।[৮৩] নামখানা ব্লকের অন্তর্গত ফ্রেজারগঞ্জ থেকে ৮ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের ওপরে অবস্থিত বিচ্ছিন্ন মনুষ্য বিহীন ম্যানগ্রোভ অরণ্য অঞ্চল হল জম্বুদ্বীপ। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে পূর্ব পাকিস্তানের চিটাগাঙ ও নোয়াখালি জেলা থেকে মৎস্যজীবীরা সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, কাকদ্বীপ, নামখানা, কালিস্থান, সাগর, মৌসুনি প্রভৃতি এলাকায় বসতি গড়ে তুলেছিল। এই মৎস্যজীবীরাই জ্বালানি সংগ্রহের জন্য জম্বুদ্বীপে যেত। দুই বাংলার মৎস্যজীবী মানুষ মিলে ফ্রেজারগঞ্জ, জম্বুদ্বীপে খুঁটি (Fishing Camp) বা কুঁড়ে বেঁধে শাবার ব্যবসার কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। এই প্রসঙ্গে বিকাশ রায়চৌধুরী তাঁর "The Moon and Net" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন– "In Jambudwip, there were seventeen Khuntis run by East Pakistan refugee fishermen in 1967-1968. And there are twenty-six fishing units of West Bengal proper."[৮৪] এই জম্বুদ্বীপকে কেন্দ্র করে যে শাবার শিল্প গড়ে উঠেছিল, তা ছিল মূলত শীতকালীন ব্যবসা। এই ব্যবসা শুরু হয় অক্টোবর মাসের মাঝামাঝি থেকে আর

শেষ হয় ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। শাবারের মালিক হলেন বহরাদার। শাবারের আকার নির্ভর করে সমুদ্রে মাছ ধরার অঞ্চলের দূরত্বের উপর। শাবার তিন ধরনের হয়। বড়ো শাবার পার্টি ৫০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে মাছ ধরতে যায়, মাঝারি পার্টির মাছ ধরার এলাকা ৫০ কিলোমিটারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, ছোট বা মিনি শাবারের পরিসর ১০ কিলোমিটারের মধ্যে। একসময় জম্বুদ্বীপ ও কালিস্থানে বড় বড় শাবার ছিল। বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ ও মৌসুনি দ্বীপে ছোট শাবারের পরিমাণ বেশি। বড়ো শাবারগুলিতে ২০ জনের অধিক জেলে থাকে এবং মাছ ধরার সরঞ্জামও অনেক বেশি থাকে। মাঝারি শাবারগুলিতে সর্বনিম্ন ৫ থেকে সর্বোচ্চ ১৪ জনের মতো জেলে থাকে এবং সঙ্গে ৫ থেকে ১৬ টির মতো বেঁহুতি জাল থাকে তৎসঙ্গে মাছ ধরার নৌকা থাকে ২ টির অধিক। ছোট শাবারগুলিতে ২ থেকে ৫ জন জেলে ও ৩ টি বা ৮ টির মতো বেঁহুতি জাল থাকে। শাবারগুলিতে মূলত দু ধরণের কর্মচারী থাকে– (ক) কূলের লোক অর্থাৎ যারা চরে বা ডাঙার উপর কাজ করে, (খ) নৌকার লোক অর্থাৎ যারা নদীতে বা সমুদ্রে কাজ করে। চরে বা কূলে যারা কাজ করে তাদের মধ্যেও দুটি শ্রেণী আছে– এক শ্রেণীর লোক ম্যানেজার, ক্যাশিয়ার ইত্যাদি, আর এক শ্রেণীর লোক যারা খুঁটির লোকেদের জন্য রান্না করে, নৌকা থেকে মাছ বয়ে আনে, মাছ বাছাই করে ও জাল সারানোর কাজ করে। জাল সারানো ও মাছ বাছাইয়ের কাজে বয়স্ক পুরুষ, মহিলা, শিশুরাও মাছ বাছাইয়ের কাজ করে থাকে। এই সমস্ত কাজের জন্য চুক্তি ভিত্তিক লোক নিয়োগ করা হয়। দাঁড়ি, মাঝি এরা চুক্তিবদ্ধ জেলে শ্রমিক। ঠিক সময়ে জাল পাতা, জাল তোলা, জাল থেকে মাছ ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ এরা করে থাকে।[৮৫]

সুন্দরবনের জম্বুদ্বীপ, কালিস্থান, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি, সাগর ও মৌসুনি প্রভৃতি কেন্দ্র গুলি মূলত শাবার শিল্পের জন্য পরিচিত। ১৯৯৯ সালের পর থেকে জম্বুদ্বীপ থেকে সরকারি ভাবে

বনদপ্তর শাবার শিল্প বন্ধ করেছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ঐ কেন্দ্রগুলিতে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে সর্বমোট ৩২০১ জন শিশু শ্রমিকের পরিসংখ্যান পাওয়া গেছে। এদের মজুরি তাদের কাজের দক্ষতার উপর নির্ভর করত। ১৯৯৪-৯৫ সালে তাদের মজুরি ছিল ২৫ থেকে ৩৫ টাকা, ২০০৪-০৫ সালে তা বেড়ে হয়েছিল ৪৫ থেকে ৬০ টাকা।[৮৬] ২০১৪-১৫ সালে মজুরি ছিল ৭০ থেকে ৭৫ টাকা, বর্তমানে শিশু শ্রমিকদের মজুরি বেড়ে হয়েছে ৯৫ থেকে ১০০ টাকা।[৮৭] জম্বুদ্বীপ একটা খাঁড়ির মাধ্যমে উত্তর থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই খাঁড়ির দুই দিকে দুই বাংলার মৎস্যজীবীরা শাবার শিল্প গড়ে তুলেছিল। তবে প্রথম থেকে উভয় দলের মধ্যে এক ধরনের চাপা অসন্তোষ ছিল যাকে কেন্দ্র করে বিবাদ তৈরি হয়েছিল। বিকাশ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন— "Gradually, the number of units increased to about five at Frasergunj. Both the fisherfolk of West Bengal proper and those from East Pakistan established their Khunti side by side in spite of their cultural differences. But around 1954, a conflict arose between an unit of West Bengal proper and that of East Pakistan over the selection of site for net-setting. As a result, an adhoc panchayat was formed with two or three local influential persons Brahman, Mahishya and Baharadar."[৮৮] এরই পরিপ্রেক্ষিতে বিকল্প শাবারের জন্য প্রয়োজন ছিল নতুন স্থানের। প্রসঙ্গত জম্বুদ্বীপ হয়ে উঠেছিল এই বিকল্প শাবার শিল্পের কেন্দ্র। শাবার শিল্পকে কেন্দ্র করে ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সময়কালে বিভিন্ন শাবার শিল্পের একটা পরিসংখ্যানগত তথ্য নিম্নে আলোচনা করা হল[৮৯]—

জম্বুদ্বীপের চর	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
খুঁটির সংখ্যা	৩০	৩১	২৭
যন্ত্রচালিত নৌকা	৫৫	৫৪	৫৪
যন্ত্রবিহীন নৌকা	৬০	৮৩	৭৯
বেঁহুদি জাল	২৭০	২৭৯	২৪৩
জেলে(জলের শ্রমিক)	১,২৯৫	১,৪২৫	১,৩৬১
ডাঙার শ্রমিক	২,৪৭০	২,৪৮১	২,৩০৫

কালিস্থানের চর	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
খুঁটির সংখ্যা	২২	১৮	২২
যন্ত্রচালিত নৌকা	৪৯	৩১	৫০
যন্ত্রবিহীন নৌকা	৫১	৩৬	৫৪
বেঁহুদি জাল	১৫৭	১৪৮	১৭২
জেলে(জলের শ্রমিক)	১,০২৬	৭০৮	১,০৭১
ডাঙার শ্রমিক	৭৪২	৫২৬	৭৮৩

বকখালির চর	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
খুঁটির সংখ্যা	৩৯	৩৬	৪০
যন্ত্রচালিত নৌকা	২৯	২৭	৪০
যন্ত্রবিহীন নৌকা	৪৬	৫৪	৬০
বেঁহুদি জাল	১৯০	১৭৩	২০১
জেলে(জলের শ্রমিক)	২২৮	২১২	২৪০
ডাঙার শ্রমিক	৪৬০	৪২০	৪৮৮

ফ্রেজারগঞ্জ চর	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
খুঁটির সংখ্যা	৩৫	৩৮	৪৬
যন্ত্রচালিত নৌকা	৩৯	৪১	৫০
যন্ত্রবিহীন নৌকা	৭০	৭৬	৯২
বেঁহুদি জাল	১৬৫	১৮০	২১০
জেলে(জলের শ্রমিক)	২৬৪	২৮৫	৩৬০
ডাঙার শ্রমিক	৫২০	৫৯৮	৭৩০

সাগর চর	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
খুঁটির সংখ্যা	১০৯	১১৬	১২১
যন্ত্রচালিত নৌকা	৮০	৯৫	১০৩
যন্ত্রবিহীন নৌকা	১৫০	১৭০	২৪০
বেঁহুদি জাল	৩৮০	৪৭৬	৪৯০
জেলে(জলের শ্রমিক)	৮৪৫	৯২০	১,০৪৪
ডাঙার শ্রমিক	৯৮০	১,৩৯২	১,৭৪০

মৌশুনি চর	১৯৯২-৯৩	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
পারিবারিক ব্যবসা সংখ্যা	১৫৯	১৭১	২০১
যন্ত্রচালিত নৌকা	৪১	৫৮	৬৭
যন্ত্রবিহীন নৌকা	১৮০	১৯৪	২১৮
বেঁহুদি জাল	৪৭৮	৫২৩	৫৭০
জেলে(জলের শ্রমিক)	৪৮৯	৫৩৩	৬৩১
পারিবারিক শ্রমিক	৪৭০	৬০৭	৬৯৮

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পর থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের বিভিন্ন শাবার কেন্দ্রে নিযুক্ত থেকে জেলে শ্রমিকরা তাদের জীবিকার একটা সংস্থান করতে পেরেছিল। কেবলমাত্র শীতকালীন ব্যবসা হলেও, এখানকার অল্প সময়ের আয় মৎস্যজীবীদেরকে আর্থিক ভাবে মজবুত করেছিল। ১৯৯০ এর দশকে শাবার শিল্পকে কেন্দ্র থেকে দাঁড়ি, মাঝি ও অন্যান্য কর্মীদের অর্জিত আয়ের একটা তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হল[১০]—

বড় মাঝি	২০,০০০ টাকা থেকে	৩৫,০০০ টাকা
মাঝি	১৩,৫০০ টাকা থেকে	২১,০০০ টাকা
দাঁড়ি	৬,৫০০ টাকা থেকে	৯,০০০ টাকা
বৃদ্ধ জেলে	২,৮০০ টাকা থেকে	৩,৫০০ টাকা
শিশু কর্মী	৬০০ টাকা থেকে	১,৮০০ টাকা
ট্রলারের মাঝি	১২,০০০ টাকা থেকে	২০,০০০ টাকা
সারেঙ/ ড্রাইভার	৬,৫০০ টাকা থেকে	৯,৫০০ টাকা
ট্রলার ক্রু	৫,৫০০ টাকা থেকে	৭,৫০০ টাকা
ম্যানেজার/ক্যাশিয়ার	৬,৫০০/৫,৫০০ টাকা থেকে	৯,০০০/৮,০০০ টাকা

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাঁচা মাছ ধরা এবং শুঁটকি তৈরির ক্ষেত্রে তাদের উপার্জনের অবস্থাকে আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করা যায়। মানে তারা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন মাছ ধরার কার্যক্রমের জন্য প্রতিদিন একটি ভিন্ন পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে চলেছে। যদিও মাছ ধরার পেশায় বড় অনিশ্চয়তা রয়েছে এবং কোনো নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা নেই। শাবার শিল্পের কাজে খুঁটির মালিকেরা শ্রমিক হিসেবে দক্ষ ও অভিজ্ঞ

মানুষদেরকে চুক্তির ভিত্তিতে কাজে লাগায় ফলে নতুন ভাবে যারা এই কাজ যোগ দেয়, স্বাভাবিক কারণে উভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য দেখা যায়।

একটি সমীক্ষার ভিত্তিতে মৎস্যজীবীদের দৈনিক গড় বা মাসিক আয় বা উপার্জন ও বর্তমান বাজার মূল্য পর্যালোচনা করে ঐতিহ্যবাহী জেলেদের আর্থিক উপার্জনের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল—

পেশা	প্রতিদিন গড় আয় (In Season)	আনুমানিক মাসিক আয়
যন্ত্রবিহীন নৌকার মাঝি	৩০০-৪০০ টাকা	১০,০০০ টাকা
যন্ত্রচালিত নৌকার মাঝি	৪০০-৬০০ টাকা	১০,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা
ছোট মাছ বিক্রেতা	২০০-৭০০ টাকা	৫,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা
খুঁটি শ্রমিক	১৫০-২৩০ টাকা	৩,০০০ থেকে ৭,০০০ টাকা
মীন সংগ্রাহক	১০০-৩০০ টাকা	২,০০০ থেকে ৫,০০০ টাকা
মাছ বাছাই শ্রমিক	৫০-১২০ টাকা	১,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকা
সামুদ্রিক মৎস্য শ্রমিক (Boatmen)		১২,০০০ থেকে ১৫,০০০ টাকা

সূত্রঃ – ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য।

জম্বুদ্বীপে শাবার শিল্পকে কেন্দ্র করে পরবর্তী সময়ে সমস্যা দেখা দিলে ২০০১-০২ সালের দিকে পাথরপ্রতিমার জি-প্লটে তৈরি হওয়া শাবার বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৯১] জম্বুদ্বীপের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা দেখা দিয়েছিল। মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকার জন্য বৃহৎ আন্দোলন করেছিল। জম্বুদ্বীপে অবস্থানকারী মৎস্যজীবীদের আন্দোলন এই কারণে যে, ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত সময়ে বনদপ্তরের অনুমতি পেয়েছে, সরকারকে রাজস্ব দিয়েছে জম্বুদ্বীপের মৎস্য-শ্রমিকেরা,

তারপরেও মাছ শুকিয়ে, বিক্রি করে তাদের জীবিকা চালিয়ে এসেছে। ১৯৯৯ সালের দিকে সরকারি নিষেধাজ্ঞায় সেই ব্যবসাতে বাধা সৃষ্টি হওয়াতে ১০ হাজারেরও বেশি মৎস্য-শ্রমিক প্রতিবাদে আন্দোলন করেছিলেন। সরকারি এই আইনে জম্বুদ্বীপ থেকে মৎস্যজীবীদের সরানো গেলেও এদের উপর নির্ভর করে থাকা লক্ষাধিক মানুষের স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হবে, এই আবেদনে তারা আন্দোলন করলেও শেষ পর্যন্ত বনদপ্তর জম্বুদ্বীপ থেকে মৎস্যজীবী মুক্ত করতে সচেষ্ট হয়েছিল। নানা প্রতিবন্ধকতাকে সমস্যা রূপে না দেখে, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা প্রথম থেকেই নদী-খাল, বিল, অরণ্য ও সমুদ্রে গিয়ে জলের মৎস্য সম্পদকে আশ্রয় করে জীবিকার সন্ধানে নিযুক্ত রয়েছে। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা একমাত্রিক নয় বহুমাত্রিক জীবিকার মধ্য দিয়ে তাদের জীবন, সমাজ ও অর্থনীতি পরিচালিত হয়ে থাকে। সারা বছর ধরে মৎস্যজীবীরা যেমন নদীর মাছের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। আবার দেখা গেছে এই মৎস্যজীবী নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা সুন্দরবনের জঙ্গলের কাঠ, মধু ও কাঁকড়া সংগ্রহ করে তাদের জীবন পরিচালিত করছে। পরিসংখ্যান তথ্যে দেখা গেছে সুন্দরবনের মধু সংগ্রহের জন্য কুলতলি, জয়নগর, বাসন্তী, গোসাবা ও ক্যানিং এই সমস্ত এলাকা থেকে সবচেয়ে বেশি মানুষ যুক্ত রয়েছে।[৯২] এপ্রিল থেকে মে এই দুমাস সুন্দরবনে মৌলেরা জঙ্গলের মধু সংগ্রহের কাজ করে থাকে। এপ্রিল মাস মধুমাস।[৯৩] সুন্দরবনের জঙ্গলের মধু সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা মৌলে নামে পরিচিত। রথীন্দ্রনাথ দে, তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রতি বছর ৪৫০০ নৌকা নিয়ে মউলেরা সুন্দরবনের জঙ্গলে মধু সংগ্রহে যায়। প্রতি বছর গড়ে ৫০০ কুইন্ট্যাল মধু এবং ৩০০০ কিলোগ্রাম মোম সংগ্রহ করে এই মৌলেরা।[৯৪] দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার আদমশুমারি রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে বর্তমানে প্রতি বছর ২০,০০০ কেজি মধু সংগৃহীত হয়ে থাকে সুন্দরবন থেকে।[৯৫]

১৯৭৯ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সুন্দরবন থেকে মধু ও মোম সংগ্রহের তথ্যে দেখা যায় সুন্দরবন থেকে গড়ে ৪৬ টন মধু ও ২৫৮৮ টন মোম সংগ্রহ করা হয়েছিল, যার দ্বারা সুন্দরবনের জঙ্গলজীবী মৌলেদের আর্থ-সামাজিক জীবন পরিচালিত হয়ে থাকে।[৯৬] জঙ্গলের ভেতরে মধু সংগ্রহ করতে গেলে বাঘের আক্রমণে জীবনের ঝুঁকি থাকে যে কারণে মৌলেদের সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পেতে শুরু করেছে। তথ্যে আরও উল্লিখিত হয়েছে যে সুন্দরবনের মৌলেদের সংখ্যা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করেছে। ২০০৭ সালে মৌলেদের সংখ্যা ছিল ৭০০ জন, যেখানে ২০০৭ সালের পূর্বে ১৫০০ মৌলে মধু সংগ্রহের কাজ করত।[৯৭] ২০১২ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে গড়ে ৮৮৪ জন মৌলে মধু সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনে গিয়েছিল।[৯৮] দেখা গেছে যে পরিমাণ মৌলে এই দুই মাসের জন্য মধু সংগ্রহের কাজ করে, তাদের ৯৫ শতাংশ মাছ-কাঁকড়া ধরার কাজে যুক্ত, বাকি ৫ শতাংশ অনান্য কাজে।[৯৯] মৌলেদের এই কাজের জন্য বনদপ্তর থেকে বি এল সি (Boat Licence Certificate) প্রথমেই সংগ্রহ করতে হয়। বিএলসি হল জঙ্গলে ঢোকার অনুমতি পত্র। জেলে-মউলে-বাউলে-কাঁকড়া শিকারি সকলের জন্য এই অনুমতি পত্রটি আবশ্যক। যারাই জঙ্গলের সম্পদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যেত তাদেরকে বনদপ্তরের থেকে এই বি এল সি সংগ্রহ করতে হত। সুন্দরবনের বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও মাছ-কাঁকড়া শিকারের ওপর নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বনদপ্তর নৌকার মালিকদের জন্য এই ১৯৮০ সালে বি এল সি অর্থাৎ বোট লাইসেন্স সার্টিফিকেট চালু করেছিলেন। বনদপ্তর ও মৎস্য দপ্তর যৌথ ভাবে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকায় ও সুন্দরবন রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় ৯২৩ টা ও ৩৭৯৩ টা বি এল সি ইস্যু করেছিলেন, যদিও ১৯৮০ সালের পরে আর কোন নতুন বি এল সি ইস্যু করা হয়নি। প্রতি বছর নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়ে বি এল সি রিনিউ করে তবেই জঙ্গলে প্রবেশ করতে হয়। বি এল সি ইস্যু ও রিনিউ করার সময় যে

পরিমাণ টাকা গ্রাহকদের কাছ থেকে নেওয়া হয়ে থাকে তার পরিমাণ ঠিক হয় নৌকার বহন ক্ষমতার অবস্থা বুঝে। নৌকার বহন ক্ষমতার পরিমাণ ১০ থেকে ৪০০ কুইন্ট্যাল পর্যন্ত হলে ১৫ টাকা থেকে ১০০ টাকা, যে নৌকার বহন ক্ষমতা ৪০০ কুইন্ট্যালের বেশি হলে ১৫০ টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে বনদপ্তর। বি এল সি ছাড়াও জেলেদেরকে সারা বছরের জন্য ৪০ টাকা করে দিয়ে বনদপ্তর থেকে আলাদা করে পাশ নিতে হয়। এই পাশ কার্যকরী থাকে আগস্ট থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত, অর্থাৎ এই আট মাস। প্রশাসনিক সুবিধার জন্য সুন্দরবনের অরণ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে— (ক) ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভ। (খ) ১৬৭৯ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বনবিভাগ। যদি কোন ব্যক্তি দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা ডিভিশনের পারমিট নিয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পে প্রবেশ করে, আবার যদি কেউ সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের থেকে নেওয়া পারমিট নিয়ে উক্ত এলাকায় প্রবেশ করে তবে উভয়কেই জরিমানা দিয়ে হয় বনদপ্তরকে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডিভিশনে এই জরিমানার পরিমাণ ১১৫০ টাকা ও সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের এলাকায় ৫০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। বনদপ্তরের নির্দেশ মতো এপ্রিল, মে ও জুন এই তিন মাস সুন্দরবনের জঙ্গলে মাছ ও কাঁকড়া ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এই সময় বনদপ্তর খুবই সতর্ক থাকে, যাতে কেউ জঙ্গলে প্রবেশ করতে না পারে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক এই কাঠামোতে বি এল সি নিয়ে এক ধরণের সংকট প্রথম থেকে অর্থাৎ ১৯৮০ সাল থেকে শুরু হয়েছে। কেননা জঙ্গলের সম্পদের উপর সুন্দরবনবাসীদের জীবিকা নিয়ন্ত্রিত হয়। সুন্দরবন সংরক্ষিত এলাকা হওয়ায় সুন্দরবনের সর্বত্র বনদপ্তরের বি এল সি বা অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করা যায় না। বি এল সি থাকলেও যদি কোন ব্যক্তি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প অথবা দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা বনবিভাগের অধীনে থাকা, যে সব সংরক্ষিত বন আছে সেখানে

প্রবেশ করে তাহলে তাদের জরিমানা দিতে হত, যার পরিমাণ ৫০০ টাকা থেকে ১৫০০ টাকা পর্যন্ত। যদি অধিক বার তারা বনদপ্তরের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে জঙ্গলে যেত, তাহলে বনদপ্তর তাদের কাছ থেকে বি এল সি বাজেয়াপ্ত করে নিত। এই বি এল সি বা অনুমতি পত্রের সংখ্যাটা এতটাই সীমিত যে সবার হাতে এখনও পর্যন্ত বনদপ্তর পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়নি।[১০০] সুন্দরবনের মধু সংগ্রাহক, মৌলেদের এক একটি দলে ৬-৯ জন থাকে। এক মাসে সর্বোচ্চ তিনটি ট্রিপ হয়। এই সময়ে তাদের আয় ট্রিপ অনুসারে ৫০০০ থেকে ৯০০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে। পাথরপ্রতিমা থানার জিপ্লটের সত্যদাসপুরের বাসিন্দা বেনুপদ ভক্তার বলেন, 'গত বছর গুলোর তুলনায় এই বছর মধু ভালো পেয়েছি। এই মরশুমে আয় হয়েছে ৭৪০০ টাকা। এবছর আর নয়। এবার নদীর মাছ-কাঁকড়া ধরার কাজ করব। এক বিঘের একটা জমি আছে চাষ করবো।'[১০১] সুন্দরবনের বিরাট সংখ্যক মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের উপরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক জীবিকার আর এক মাধ্যম হলো নদী-জঙ্গলের কাঁকড়া সংগ্রহ করা। সুন্দরবনের কাঁকড়াশিকারিদের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার।[১০২] সুন্দরবনের ১৫০ টিরও বেশি গ্রামে এরা বসবাস করছে। ৩০ হাজারের বেশি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে কাঁকড়া শিকারের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে বলে মনে করা হয়।[১০৩] কাঁকড়াধরা এই জীবিকার সঙ্গে বাগদি, পোদ, নমঃশূদ্র, শবর, সাঁওতাল, ওঁরাও প্রভৃতি সম্প্রদায় বাদে উচ্চবর্ণের মাহিষ্য তাঁতি, মালাকার, কামার ইত্যাদি সম্প্রদায়ের মানুষও এই জীবিকায় যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে। শঙ্কর কুমার প্রামাণিক তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে কুলতলি থানার বেশ কিছু বামুন পরিবার কাঁকড়া ধরার কাজ করে, তবে তা ঐতিহ্যগতভাবে নয়। সুন্দরবনের বাসন্তী, হিঙ্গলগঞ্জ, গোসাবা, সাতজেলিয়া, পাথরপ্রতিমা থানা এবং কাকদ্বীপ থানার ফটিকপুর এলাকায় বসবাসকারী এই মানুষেরা বেশি পরিমাণে কাঁকড়া ধরার

কাজ করে থাকে। এরা কাঁকড়া ধরার জন্য কাঁপি বা আংড়ি অর্থাৎ ‘শিক’ ব্যবহার করে। এই যন্ত্রটি দেখতে অনেকটা ইংরেজি বর্ণমালার জে (J) আকৃতির মতো দেখতে। তাছাড়া অনেকে কাঁকড়া ধরতে অনেকে দোন ব্যবহার করে থাকে। এক একটা দোন ১২০০-১৬০০ হাত লম্বা হয়ে থাকে। তবে দোন ব্যবহারে অনেক খরচ হয়ে থাকে, যে কারণে কাঁকড়া শিকারিরা কাঁটা দোনও ব্যবহার করে, যাতে কাঁকড়ার দোনের জন্য ব্যবহৃত কাঁচা মাছ আলাদা ভাবে কিনতে না হয়। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদ কাঁকড়া, অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ১১ টি প্রজাতি হলেও এর মধ্যে মাত্র ৫টি প্রজাতি যথা- স্ক্যাইলা সেরেটা, পরতুনাস পেলাজিকাস, পি. সাইগুইলোন্টাস, বরুণা লিট্টেরাটা এবং সারতোরিয়ানা স্পিনিজেরা খাদ্যের উপযোগী বলে মনে করা হয়। কাঁকড়া শিকারিদেরকে মূলত ৪-১০ জন করে এক একটি দলে বিভক্ত হয়ে নদী-খাঁড়ি, চর কিংবা জঙ্গলে গিয়ে কাঁকড়া ধরতে দেখা যায়। কাকদ্বীপ থানার ফটিকপুর ও বুধাখালি গ্রামের কাঁকড়া শিকারিরা, স্ত্রী-পুরুষ মিলে ৪-৬ জনের এক একটি দলে এক একটি নৌকা নিয়ে, কাঁকড়া ধরতে যান। সাধারণত দলের প্রত্যেকেই একই পাড়ার বাসিন্দা। এদের মধ্যে দু-তিন জন একই পরিবারের হয়ে থাকে।[১০৪]

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল হল নোনা কাঁকড়ার বাসভূমি। প্রতি বছর সুন্দরবনের থেকে ১০০০-১৫০০ টন কাঁকড়া উৎপন্ন হয়ে থাকে। ১৯৯০ সাল থেকে বিমানযোগে সুন্দরবনের কাঁকড়া হংকং, জাপান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে রপ্তানি করে প্রচুর পরিমাণে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করার প্রচেষ্টা করা হয়ে থাকে। যে কারণে সুন্দরবনে কাঁকড়ার কদর যেমন বেড়েছে একই ভাবে কাঁকড়াশিকারির সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে।[১০৫] ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়- কাঁকড়াজীবী সব পরিবার গুলো বর্তমানে দু’বেলা খাবার পেয়ে থাকে, তাদের

উপার্জিত অর্থ থেকে। এখানকার মানুষ সারা বছরই ভিন্ন ধরণের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্থোপার্জন করে থাকে। নিজেদের অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও এদের সন্তানদের প্রতি এরা যত্নশীল। প্রতিটি বাড়ির ছেলেমেয়েরা পড়াশোনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। পাকা বাড়ি বিশেষ দেখা যায় না, সবই মাটির বাড়ি। তবে কাকদ্বীপ ব্লকের ফটিকপুরের বাগদি পাড়ার কাঁকড়াজীবী মানুষেরা পাকা বাড়ির ধারণা রাখে। এদের অধিকাংশের মধ্যে নারীপুরুষ সবাই দেহের ঝলমলে পোশাকের ব্যাপারে খুবই সচেতন। শরীরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে উগ্র সাজের বাহার লক্ষ্য করা যায়।[১০৬] সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা জীবিকার তাগিদে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে বাঘ-কুমিরের আক্রমণ উপেক্ষা করে জীবন যুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। নদী-সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে ফিরে না আসা, কাঁকড়া-মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে বাঘের খাদ্যে পরিণত হওয়া, কিংবা জলদস্যুদের আক্রমণে মৃত্যু সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে দৈনন্দিন ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধারাবাহিক পুরুষ মানুষের এই মৃত্যুতে গোসাবার জেলেপাড়া এবং লাহিড়ীপুর গ্রামের একটি অংশ বিধবাপল্লী নামে পরিচিত হয়ে রয়েছে।[১০৭] বাঘের আক্রমণে মৃত্যুর ঘটনা হামেশাই দেখা যায়। নদীতে জাল পাতার সময় পীরখালি জঙ্গলে বাঘের মুখে পড়ে মৃত্যু হয় গোসাবার বালির ৯ নম্বর গ্রামের বছর ত্রিশের শেখর বিশ্বাসের। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র প্রকল্পের ফিল্ড ডাইরেক্টর-এর বক্তব্য, অনুমতি না নিয়ে নিষিদ্ধ এলাকায় ঢুকে পড়েছিল এই মৎস্যজীবীরা।[১০৮] কাকদ্বীপ ব্লকের ফটিকপুর গ্রামের বাগদি পাড়ার কাঁকড়া শিকারি ৪২ বছর বয়স্ক লালুপদ চেড়। তিনি বলেন- ৯-১০ বছর বয়স থেকেই বাবা-কাকাদের সঙ্গে নৌকাতে করে সপ্তমুখীর চর, লোথিয়ানদ্বীপ, পীরখালি, কালির চর, তেরবাঁকি ইত্যাদি এলাকায় কাঁকড়া ধরতে যেত। ১৩-১৪ বছর বয়স থেকেই বিভিন্ন দলে কাঁকড়া শিকারে যেতে শুরু করে। এরপর দুই ভাইকে সঙ্গে নিয়ে কাঁকড়া ধরতে যেত। জঙ্গলে যে পরিমাণ কাঁকড়া পেত কাকদ্বীপ

উকিলের হাটে গিয়ে ১২০ টাকা থেকে ৪০০ টাকা পর্যন্ত দামে বিক্রি করা হত। যা আয় হত সেটা দিয়ে সংসারের ৭ জন মানুষের দিন চলত। ২০05 সালে চরে কাঁকড়া ধরার সময় তার বাবাকে বাঘ আক্রমণ করে, আহত অবস্থাতে জঙ্গল থেকে চলে আসে সবাই। এর পর কয়েক বছর তার বাবা সুস্থ ছিলেন। আর মাছ কাঁকড়া ধরতে যেতে পারতেন না। ২০১০ সালে তিনি মারা যান। ঐ বছরে তার মা ক্যান্সারে মারা যায়। তিনি আরও বলেন শুধু এই কাজে এখন সংসার চালানো মুশকিল, তাই তিনি মীন ধরেন, দীন-মজুরের কাজও করে।[১০৯] উক্ত গ্রামের আর এক মৎস্যজীবী শম্ভু চেড়, ছোট থেকেই কাঁকড়া ও মাছ ধরার কাজ করে। পড়াশোনা ভাগ্যে জোটেনি তার। তিনি বলেন মাছ ও কাঁকড়া ধরা তাদের পারিবারিক পেশা, তিন পুরুষ ধরে তারা এই কাজ করছে। প্রথম প্রথম জঙ্গলে যেতে ভয় করতো তার, কিন্তু বাড়িতে ভাত-ডালের জন্য ভয় করলে কি চলে। জঙ্গলে তো যেতেই হবে, নাহলে খাব কি? তিনি আরও বলে যে, কাছাকাছি জঙ্গলগুলিতে এখন আর কাঁকড়া পাওয়া যায় না, গভীর জঙ্গলে যেখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না সেইখানে বেশি পরিমাণে কাঁকড়া পাওয়া যায়, সরকারকে ফাঁকি দিয়ে ঢুকে পড়তে হয় জঙ্গলে। বাঘ-কুমির-বিষধর সাপের ভয় তো আছেই। এছাড়া তাদের অন্য কোন জীবিকাও নেই, জীবন ধারণের জন্য জঙ্গল ও নদী তাদের একমাত্র ভরসা।[১১০] সারা দিন রাত এই মৎস্যজীবী মানুষেরা প্রতিকূল পরিবেশকে উপেক্ষা করে নৌকাতে জীবন কাটায়, অসুখ-বিসুখের তোয়াক্কা না করে।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা তাদের জীবিকার জন্য নানা ধরণের প্রতিবন্ধকতা ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবন পরিচালিত করে চলেছে। সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে উপেক্ষা করে কখনো সুন্দরবনের সংরক্ষিত এলাকায় কিংবা নির্ধারিত এলাকায় গিয়ে মাছ-কাঁকড়া ধরে, মীন ধরে, মধু-সংগ্রহ করে। প্রশ্ন হল- জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তারা এই কাজ গুলো করে কেন? সেক্ষেত্রে বলা

যেতে পারে যে সুন্দরবনের এই মানুষদের কাছে বিকল্প কোনো কাজ নেই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সুন্দরবনের বেশির ভাগ এলাকা লোনা জলে প্লাবিত হয়ে থাকে, যেকারণে কৃষিকাজের দিক থেকে তারা সরে আসতে শুরু করেছে। সুন্দরবনের এলাকা গুলিতে বর্তমানে একশো দিনের যে কাজগুলি হয়ে থাকে সেখানেও নানা জটিলতা তৈরি হয়ে থাকে, ফলে মৎস্যজীবীদের কাছে নদী ও জঙ্গলই এক মাত্র ভরসার জায়গা। সারা বছর ধরে মাছ সংগ্রহের কাজে তারা নিযুক্ত থাকে। সমুদ্রে মাছ ধরার ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমুদ্রের তলদেশের ভূপ্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান, সমুদ্রের জলকে বোঝার ক্ষমতা, সময় ও দিক সম্পর্কে মৎস্যজীবীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, মাছেদের গতিবিধি সম্পর্কে জ্ঞান তাদেরকে বেশি করে মাছ সংগ্রহের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। যেমন- নদী-সমুদ্রের পরিষ্কার জলে মাছ ধরার পরিবর্তে ভেটকি, ভোলা, লাক্ষা ইত্যাদি লাল গাব জলে থাকত বলে তারা সেখানেই মাছ ধরে। আবার নীল জলে লইট্যা, ইলিশ থেকে শুরু করে সব ধরণের মাছ পাওয়া যায়। তাছাড়া তিথি, নক্ষত্রের অবস্থান অনুধাবন করে জোয়ার-ভাঁটা জল ওঠা-নামার তারতম্য বুঝে তারা মাছ ধরতে পারে।[১১১] এপ্রসঙ্গে বিকাশ রায়চৌধুরী তাঁর লেখা- “The Moon and Net: Study of a Transient Community of Fishermen at Jambudwip” গ্রন্থে বলেছেন— “The marine fisherfolk, for their long association with the sea, have developed a very intimate knowledge of their immediate environment, i.e., of the sea and the sea fish. Their life activities are closely inter-woven with it and a thorough empirical knowledge becomes indispensable for their livelihood and for their daring sea voyage in which a wrong judgement may be a risk to their life or

cause a major failure in hauling. These two major factors seem to have largely led them to develop the cultural and emotional awareness of their immediate environment, viz., sea, fish, and the like."[১১২]

বর্তমানে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক প্রতিকূলতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। সুন্দরবনের নদী-খাঁড়ি, সমুদ্র কিংবা মোহনা প্রভৃতি স্থানে মৎস্যজীবীদের আগমনের সংখ্যা অনেকটা বেড়েছে। মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনীতির উপর নিঃসন্দেহে একটা বিশেষ চাপ তৈরি করছে। প্রসঙ্গত আলোচনা করা যেতে পারে যে মাতলার পূর্ব দিকের অধিকাংশ এলাকা সুন্দরবন টাইগার প্রোজেক্ট হিসেবে চিহ্নিত, সেকারণে মৎস্যজীবীরা খুবই কম এলাকায় মাছ ধরতে পারে। কারণ বেশির ভাগ এলাকাটি সংরক্ষিত হওয়ায় আধুনিক পদ্ধতির যন্ত্রচালিত নৌকা, ট্রলার ব্যবহারের উপরও নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যেকারণে এই এলাকার উপর মৎস্যজীবীদের চাপটাও অনেক বেশি, সেই তুলনায় মাছের উৎপাদনও কমে যাচ্ছে। এখানকার মৎস্যজীবীরা পুরাতন বা দেশী পদ্ধতি প্রয়োগ করে মাছ শিকার করে। অপরদিকে মাতলার পশ্চিম দিকে অর্থাৎ নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা, বকখালি, রায়দিঘি, মথুরাপুর, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশে বা জঙ্গলের মধ্যে মৎস্য শিকারে সীমাবদ্ধ না থেকে সমুদ্রে মৎস্য শিকারে যাচ্ছে। বর্তমানে সামুদ্রিক মাছের চাহিদা খুবই বেড়েছে, এবং এই এলাকাগুলির থেকে যন্ত্রচালিত ট্রলার ব্যবহার করে সমুদ্রে গিয়ে বিপুল পরিমাণে মৎস্য শিকার করা সম্ভব হয়।[১১৩] এক্ষেত্রে সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের জন্য মূলধন বিনিয়োগ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা একটি ট্রলার ফিশিং-এ নামাতে ৪ থেকে ৫ লাখ টাকা খরচ হয়ে থাকে। যদিও আয় হয় অনেক বেশি। এক একটি ট্রিপে (৭ থেকে ১০ দিন) দুই থেকে

আড়াই লাখ টাকা আয় হয়।[১১৪] সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে জীবনের ঝুঁকি থাকে অনেক বেশি। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় মধ্যে পড়ে অনেক সামুদ্রিক মৎস্যজীবী তাদের প্রাণ হারিয়েছে, এধরণের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেক মৎস্যজীবী আবার এই পেশা ত্যাগ করে বাড়িতে বিকল্প পেশার মধ্যেও জীবিকা নির্বাহের চেষ্টা করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য– পাথরপ্রতিমা ব্লকের রাক্ষসখালি দ্বীপের গোবিন্দপুর গ্রামের বাসিন্দা ৭০ ঊর্দ্ধ শুকদেব দোলুই বলেন, শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পাননি। ১৪ বছর বয়স থেকেই নদীর সঙ্গে সম্পর্ক। জীবন শুরু মৎসজীবী হিসেবে। ১৯৮৩ সালের প্রাকৃতিক দুর্যোগে নৌকাডুবি হন। ভগবান তাঁকে বাঁচিয়ে দেন। তখন থেকেই মাছ ধরা ছেড়ে কৃষিকাজ ও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেন। এটাই তার পেশা ছিল একসময়। মৎসজীবী হিসেবে জীবন শুরু করে তার ছোট ছেলে (লাল্টু)। বঙ্গোপসাগর তাঁর জীবন কেড়ে নেয়। নামখানায় একটা ইলিশ ধরার বড় নৌকাতে কাজ করতো ছেলেটি। ২০০৯ এর আয়লা নদীবাঁধ ভেঙ্গে বাড়ি ঘর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। সর্বস্বান্ত এক হত দরিদ্র মানুষ ইনি। পাথর প্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ও ব্রজবল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে কিছু টাকা সরকারি অনুদান পান। তাই দিয়ে দুই কামরার পাকা বাড়ি করে স্ত্রী-পুত্র-বৌমা-নাতনি সহ বিচ্ছিন্ন এক পরিবারে বসবাস করেন। শুকদেব দোলুই মহাশয় শেষ দিনটার জন্য প্রহর গুনছেন।[১১৫]

নামখানা, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ, রায়দীঘি প্রভৃতি এলাকার মানুষদের কাছে সামুদ্রিক মৎস্যকে কেন্দ্র করে প্রচুর পরিমাণে কাজের সুযোগ তৈরি হয়েছে। পুরুষেরা যেমন মৎস্য শিকারের সঙ্গে যুক্ত থাকে তেমনই বাড়ির অন্যান্যরা জাল বোনা, সারানো ও শুঁটকি মাছ তৈরি প্রভৃতি কাজের সাথে যুক্ত থেকে স্থায়ী একটা আয়ের পথ তৈরি করেছে। এত কিছুর পরেও সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনের দারিদ্রতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। নদী-সমুদ্রের

অনিয়মিত মৎস্য উৎপাদন তাদেরকে দেশ থেকে দেশান্তরে নিয়ে গিয়ে অন্য ধরণের জীবিকায় আগ্রহী করে তুলেছে। সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের উৎপাদনে প্রযুক্তিগত ও সরকারি সহযোগিতা ছাড়া মৎস্য-শিল্পকে উন্নত করা সম্ভব নয়। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক জলাশয়, নদী, খাল, বিল, সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে মাছের প্রাচুর্য রয়েছে। তা সত্ত্বেও মৎস্য নির্ভর জীবিকার প্রতি মৎস্যজীবীদের বিষণ্নতা লক্ষ্য করা যায়।

১৯৪৭ সালের পর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত সময়কালে সুন্দরবনের উপর বিপন্নতা ডেকে আনা বেশ কিছু প্রাকৃতিক বিপর্যয় আইলা, ফণী, বুলবুল, আমফান, ইয়াস প্রভৃতি মৎস্যজীবীদের চিরাচরিত জীবিকার উপর আঘাত হেনেছে। কেবলমাত্র মৎস্য শিকার নয়, সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে বসবাস করে অন্য কোন জীবিকার প্রতি মনোযোগ দেওয়া তাদের পক্ষে আর সম্ভব হয়ে উঠছে না। আকাশে মেঘ দেখলে মৎস্যজীবীরা ভীত হয়ে পড়ে, স্বামী-পুত্র যে মাছ ধরতে নদী-সমুদ্রে গেছে তারা ফিরে আসবে তো। মাছ ও মাছের গন্ধকে ভালোবেসে যারা মৎস্য শিকার করে, তারাই আজ সুন্দরবনে বিকল্প পেশার সন্ধান করছে। প্রতিনিয়ত নদী ভাঙন প্লাবিত করছে সুন্দরবনের বিস্তৃত জলাভূমিকে যেকারনে একদিকে চাষের কাজ সময়মত হচ্ছে না, অপরদিকে ভেড়ি-পুকুর ইত্যাদিতে মাছ চাষের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে মৎস্যজীবীদেরকে। নানা ভাবে অর্থনৈতিক বিপন্নতার শিকার হচ্ছে এই মৎস্যজীবীরা। সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক জীবনের প্রসঙ্গে একথা বলে ইতি টানা যেতে পারে-

"আর মালোদের দখল ছিল জলে; তরলতার নিরবলম্ব নিরবয়বের মধ্যে। কোনোদিন সেটা বাস্তবের গভীর স্পর্শ খুঁজিয়া পাইল না। পাইল না শক্ত কোনো অবলম্বন। কঠিন কোন পা রাখিবার স্থান। তাই তারা ভাসমান। পৃথিবীর বুকে মিশিয়া যতই তারা, জেলেরা, গাছপালা, বাড়িঘরের সঙ্গে মিতালি করুক, তারা বাষ্পের মত ভাসমান"।[১১৬]

সূত্রনির্দেশ

১। সমরেশ বসু, গঙ্গা (কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩৬৪), পৃ-১।

২। সাক্ষাৎকারঃ নাম- সহদেব দোলুই, পিতা- শুকদেব দোলুই, বয়স- ৩৩, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- গোবিন্দপুর আবাদ, গ্রামপঞ্চায়েত- ব্রজবল্লভপুর, রাক্ষসখালি, থানা ও ব্লক- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৩/০৭/২০২১।

৩। L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazetteers- 24-Parganas (Calcutta: Government of West Bengal, 1998), P-197.

৪। W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal-Districts of the 24 Parganas and Sundarbans, Vol.I (London: Trubner & Co, 1875), Pp-301-302.

৫। Rup Kumar Barman, Fisheries and Fishermen: A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal (Delhi: Abhijeet Publications, 2008), P-14.

৬। Ibid, P-13.

৭। Ibid, P-14.

৮। Census 1951, West Bengal, District Handbooks, 24-Parganas, West Bengal Government Press, Alipore, 1954.

৯। Census 1961 and 1971, West Bengal, District Handbooks, 24-Parganas, West Bengal Government Press, Annexed Building, Alipore, Kolkata.

১০। Amal Kumar Das, Sankarananda Mukherji and Manas Kamal Chowdhuri (Ed.), A Focus on Sundarban (Calcutta: Editions Indian, 1981), P-27.

১১। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য (দক্ষিণ গড়িয়াঃ গ্রথন, ২০০৬), পৃ-৪৯।

১২। পূর্ণেন্দু ঘোষ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা (কলকাতাঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬), পৃ-১৩৫।

১৩। তদেব, পৃ-১৩৫।

১৪। Rup Kumar Barman, প্রাগুক্ত, পৃ-১৫।

১৫। পূর্ণেন্দু ঘোষ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫।

১৬। Rup Kumar Barman, প্রাগুক্ত, পৃ-১৭।

১৭। পূর্ণেন্দু ঘোষ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনগোষ্ঠী ও আদিবাসীদের জীবন-সংস্কৃতি, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৫।

১৮। Haraprasad Chattopadhyaya, The Mystery of the Sundarbans (Calcutta: A Mukherjee & Co PVT Ltd, 1999), P-126.

১৯। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রাগুক্ত, পৃ-49.

২০। তদেব, পৃ-৫০।

২১। Bikash Roychaudhuri, The Moon and the Net: Study of a Transient Community of Fishermen at Jambudwip (Calcutta: Anthropological Survey of India, 1980), P-17.

২২। D. N. Guha Bakshi, P. Sanyal, and K. R. Naskar (Ed.), Sundarbans Mangal (Calcutta: Naya Prokash, 1999), Pp-422-423. এবং এই বিষয়ে দ্রষ্টব্য- কুমুদরঞ্জন নস্কর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা (কলকাতাঃ তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬), পৃপৃ-৪১৭-৪১৮।

২৩। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন (কলকাতাঃ লোক, ২০১৩), পৃ-১০৪।

২৪। সাক্ষাৎকারঃ নাম- মহাদেব দোলুই, পিতা- হরিপদ দোলুই, বয়স- ৫৫, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- গোবিন্দপুর আবাদ, গ্রামপঞ্চায়েত- ব্রজবল্লভপুর, রাক্ষসখালি, থানা ও ব্লক- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৩/০৭/২০২১।

২৫। সাক্ষাৎকারঃ নাম- ভুবন কুমার পাত্র, বয়স- ৯৩, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- গোবর্ধনপুর, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, তারিখ- ২০/১০/২০২১।

২৬। রমেশ গায়েন, সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যজীবীদের সংগ্রাম, দেবপ্রসাদ জানা (সম্পা.), শ্রীখণ্ড সুন্দরবন (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ-৩৮৯।

২৭। গোকুল চন্দ্র দাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত (কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১), পৃ-৩৭।

২৮। K. G. Gupta, Bengali Version of the Reports on the Results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into Fishery matters in Europe and America (কলিকাতাঃ প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত, ১৯১০), পৃ-৭।

২৯। রমেশ গায়েন, সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যজীবীদের সংগ্রাম, দেবপ্রসাদ জানা, (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৯।

৩০। তদেব, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৯।

৩১। জীবেশ গুহ, বলরাম দাশগুপ্ত এবং দুলালচন্দ্র সাঁতরা, জীববিদ্যা (দ্বিতীয় খণ্ড) (কোলকাতাঃ মৌলিক লাইব্রেরী, ২০০৪), পৃ-২৪০।

৩২। Census Hand Book, 1991. District South 24 Parganas, Directorate of Census Oparations West Bengal.

৩৩। Census Hand Book, 2011. District South 24 Parganas, Directorate of Census Oparations West Bengal.

৩৪। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৩৭-৩৯।

৩৫। সাক্ষাৎকারঃ নাম- দীনেশ মণ্ডল, বয়স- ২৯, পিতা- সুশান্ত মণ্ডল পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, গ্রামপঞ্চায়েত- জি-প্লট, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, ব্লক- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৬/০২/২০২২।

৩৬। ক্ষেত্র সমীক্ষা, গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য, তারিখ- ১৩/৯/২০২১।

৩৭। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫।

৩৮। প্রদ্যুৎ সরকার, সুন্দরবনের নৌ-নির্মাণ শিল্প, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র ষষ্ঠ সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০০৫) পৃ-৩।

৩৯। তদেব, পৃ-৩

৪০। ডাঃ কালিচরণ কর্মকার, সুন্দরবনের আঞ্চলিক শিল্পঃ সম্ভবনা ও সমস্যা, দেবপ্রসাদ জানা (সম্পা), শ্রীখন্ড সুন্দরবন (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০০৪), পৃপৃ-৩৯৬-৯৭।

৪১। সাক্ষাৎকারঃ নাম- বিপুল গায়েন, মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক, পাথরপ্রতিমা বি. ডি. ও অফিস, তারিখ- ০৯/০৩/২০২২

৪২। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা নদীর মাঝি (কলকাতাঃ বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৫৫), পৃপৃ-১-২।

৪৩। অমিতাভ ঘোষ, ভাটির দেশ, অনুবাদ অচিন্ত্যরূপ রায় (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৬), পৃ-৩৭।

৪৪। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৬।

৪৫। সাক্ষাৎকারঃ নাম- বাপি আদক, পিতা- সন্তোষ আদক, বয়স- ৪৭, আড়ৎদার ক্যানিং বাজার, তারিখ- ১৫/০৫/২০২২।

৪৬। সাক্ষাৎকারঃ নাম- বিভূতি ভূষণ মাইতি, পিতা- গুনধর মাইতি, বয়স- ৭৪, পেশা- অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, গ্রাম- হরেন্দ্রনগর, থানা- ঢোলাহাট, ব্লক- কাকদ্বীপ, তারিখ- ১৩/০২/২০২২।

৪৭। W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal-Districts of the 24 Parganas and Sundarbans, Vol-I (London: Trubner & Co, 1875), P-35.

৪৮। কমল চৌধুরী, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত (কলকাতাঃ, মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭), পৃপৃ-১৫৩-১৫৪।

৪৯। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ (কলকাতাঃ রীসা রিডার্স সার্ভিস, ২০০৭), পৃ-৬৪।

৫০। Haraprasad Chattopadhyaya, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০৪।

৫১। Assembly Proceedings, Official Report, West Bengal Legislative Assembly, 42nd Session, February-March, 1966, P-270.

৫২। রমেশ গায়েন, সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যজীবীদের সংগ্রাম, দেবপ্রসাদ জানা, (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ-৩৮৯।

৫৩। Haraprasad Chattopadhyaya, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৮।

৫৪। Ibid, পৃ- ৯০।

৫৫। Ibid, পৃ-৯০।

৫৬। সাক্ষাৎকারঃ নাম- বিপুল গায়েন, মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক, পাথরপ্রতিমা বি.ডি.ও অফিস, তারিখ- ০৯/০৩/২০২৩

৫৭। কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন (কলকাতাঃ দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৯), পৃ-৪৪০।

৫৮। তদেব, পৃ-৪৩৯।

৫৯। সাক্ষাৎকারঃ নাম-মিলন দাস, সম্পাদক- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিঃ নং- ২০৪৭৪/৯২, তারিখ- ২৮/০৭/২০২২।

৬০। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৭।

৬১। কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪১।

৬২। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৭।

৬৩। ধূর্জটি নস্কর, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পণ প্রথম খণ্ড (কলকাতাঃ শ্যামলী পাবলিকেশন, ১৯৯৭), পৃপৃ-৯০-৯১।

৬৪। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব-পরিমণ্ডল (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১২), পৃ-১১১।

৬৫। অনুকূল মণ্ডল, সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি (কলকাতাঃ দি সী বুক এজেন্সী, ২০১৪), পৃপৃ-৯১-৯২।

৬৬। সাক্ষাৎকারঃ নাম- শেফালী ভূঁঞ্যা, স্বামী- বাপী ভূঁঞ্যা, বয়স- ৩৯, পেশা- মীন সংগ্রাহক, গ্রাম- মাধবনগর, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৭/০৬/২০২১।

৬৭। সাক্ষাৎকারঃ নাম- স্নেহলতা গারু, স্বামী- বিশ্বজিৎ গারু, বয়স- ৩৯, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- বনশ্যামনগর, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৭/০৬/২০২১।

৬৮। সাক্ষাৎকারঃ নাম- রেবতী করণ, বয়স- ৩৩, পেশা- মীন সংগ্রাহক, গ্রাম- কে-প্লট, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৮/০৭/২০২১।

৬৯। সাক্ষাৎকারঃ নাম- মিনতি বেরা, বয়স- ৪১, পেশা- মীন সংগ্রাহক, গ্রাম- শিবরামপুর, থানা- নামখানা, তারিখ- ১৫/০৮/২০২১।

৭০। সাক্ষাৎকারঃ নাম- অনু গিরি, বয়স- ৫০, পেশা- মীন সংগ্রাহক, গ্রাম- শিবরামপুর, থানা- নামখানা, তারিখ- ১৫/০৮/২০২১।

৭১। সাক্ষাৎকারঃ নাম- রেবা বেরা, বয়স- ৫৫, গ্রাম- ফটিকপুর, থানা- কাকদ্বীপ, পেশা- মীন সংগ্রাহক, তারিখ- ১৬/০৮/২১।

৭২। সাক্ষাৎকারঃ নাম- মানসী মণ্ডল, বয়স- ৪৩, পেশা- মীন ও মাছ ধরা, গ্রাম- কচুবেড়িয়া, থানা- সাগর, তারিখ- ২০/০১/২০২২।

৭৩। সাক্ষাৎকারঃ নাম- অমিতা মান্না, বয়স- ৫১, পেশা- মীন ও মাছ ধরা, গ্রাম-দ্বারিকনগর, থানা-নামখানা, তারিখ- ১৫/০৮/২০২১।

৭৪। সাক্ষাৎকারঃ নাম- শান্তবালা মাইতি, স্বামী- ধীরেন মাইতি, বয়স- ৭৫, পেশা- মীন ও কাঁকড়া ধরা, গ্রাম-মহেশপুর, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১১/০৭/২০২২।

৭৫। সাক্ষাৎকারঃ নাম- নূপুর হাজরা, স্বামী- বাটুল হাজরা, বয়স- ৫০, পেশা- মীন ও মাছ ধরা, গ্রাম-উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, তারিখ- ২২/০৩/২০১৯।

৭৬। সাক্ষাৎকারঃ নাম- গীতা দোলুই, স্বামী- পূণ্য দোলুই, বয়স- ৫৩, পেশা- মীন ও মাছ ধরা, গ্রাম-ভগবতপুর, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ২৭/০৪/২০১৯।

৭৭। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য, তারিখ- ১১/০৫/২০২১।

৭৮। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ- ৬৭।

৭৯। সাক্ষাৎকারঃ নাম-কানুপদ দাস, পিতা- হরেন দাস, বয়স- ৪৬, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম-কামদেবনগর, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ১৯/০৫/২০২১।

৮০। সাক্ষাৎকারঃ নাম-ননীভূষণ পাল, পিতা- জগন্নাথ পাল, বয়স- ৭৪, গ্রাম-দক্ষিণ কাশিয়াবাদ, থানা-ঢোলাহাট, তারিখ- ১৯/০৬/২০২১।

৮১। Rup Kumar Barman, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬। এই বিষয়ে আরো দ্রষ্টব্য- Prafulla K. Chakrabarti, The Marginal Men: The Refugees and The Left Political Syndrome in West Bengal (Kalyani: Lumieri Books, 1990).

৮২। সাক্ষাৎকারঃ নাম- গৌরহরি মন্ডল, পিতা- শুভাশিস মণ্ডল, বয়স- ৭৩, অক্ষয়নগর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৯/০৬/২০২১।

৮৩। কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগনা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪২।

৮৪। Bikash Roychaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃপৃ- ৯-১০।

৮৫। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, জম্বুদ্বীপের চর, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

৮৬। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন (কলকাতাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ২০১৪), পৃপৃ- ৮৫-৮৮।

৮৭। ক্ষেত্রসমীক্ষা, গবেষক কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য, তারিখ- ১১/০৫/২০২২।

৮৮। Bikash Roychaudhuri, প্রাগুক্ত, পৃ- ৮।

৮৯। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, জম্বুদ্বীপের চর, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি।

৯০। তদেব।

৯১। সাক্ষাৎকারঃ নাম-পঙ্কজ কুমার বেরা, পিতা- পল্লব বেরা, বয়স- ৬৭, পেশা- শিক্ষক, গ্রাম- উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৫/০৭/২০২১।

৯২। Census Hand Book, 2011, District South 24 Parganas, Directorate of Census Oparations West Bengal, P-16

৯৩। রঞ্জন চক্রবর্তী ও ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী, প্রাগুক্ত, পৃ-৬১।

৯৪। রথীন্দ্রনাথ দে, সুন্দরবন (কলকাতাঃ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, ১৯৯১), পৃ-৪৮।

৯৫। Census Hand Book, 2011, District South 24 Parganas, Directorate of Census Oparations West Bengal, P-16.

৯৬। সুধীন সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-১১১-১১২।

৯৭। Census Hand Book, 2011, District South 24 Parganas, Directorate of Census Oparations West Bengal, P-16.

৯৮। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ- ১৬৫।

৯৯। তদেব, পৃ-১৬৫।

১০০। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনে কাঁকড়া শিকারে বি এল সি-র ফাঁস, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা), দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতাঃ ছোঁয়া, ২০২০), পৃপৃ- ৭৬৬-৭০, এই বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য- শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা (কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১৪), পৃপৃ- ১০৬-১১০।

১০১। সাক্ষাৎকারঃ নাম-বেনুপদ ভক্তা, পিতা- সুবল ভক্তা, বয়স- ৩৭, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- দাসপুর, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৫/০২/২০২২।

১০২। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৪৬।

১০৩। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা (কলকাতাঃ বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, ২০১৪), পৃ-৪।

১০৪। তদেব, পৃপৃ-৫, ১১, ২০।

১০৫। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯

১০৬। তথ্য গবেষকের ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত, তারিখ- ১১/০৫/২০২২।

১০৭। বিনয়কৃষ্ণ রায়, সুন্দরবনের কৃষক, জেলে ও আদিবাসীঃ জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র ষষ্ঠ সংখ্যা, (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ বাই লেন নং-১, ২০১০), পৃ-৩৮।

১০৮। 'সুন্দরবনে বাঘের আক্রমণে মৃত মৎস্যজীবী', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ২০২৩।

১০৯। সাক্ষাৎকারঃ নাম- লালুপদ চেড়, পিতা- ভক্তি চেড়, গ্রাম- ফটিকপুর, কাকদ্বীপ ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২১/০৩/২০২২।

১১০। সাক্ষাৎকারঃ নাম- শম্ভু চেড়, পিতা- শক্তি চেড়, গ্রাম- ফটিকপুর, কাকদ্বীপ ব্লক, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২১/০৩/২০২২।

১১১। নিরঞ্জন জলদাস, কাকদ্বীপের মৎস্য-অর্থনীতি ও বাস্তুতন্ত্র (১৯০০-২০০০), অপ্রকাশিত, এম ফিল গবেষণাপত্র, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১১, পৃ- ৯০।

১১২। Bikash Roychaudhuri, The Moon and the Net: Study of a Transient Community of Fishermen at Jambudwip (Calcutta: Anthropological Survey of India, 1980), P-77.

১১৩। ইন্দ্রাণী ঘোষাল, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-৫২, ৫৯।

১১৪। তথ্য গবেষকের ক্ষেত্র সমীক্ষার দ্বারা সংগৃহীত, তারিখ- ১৮/০৬/২০২২। (৬-৮ দিন ধরে সমুদ্রে ফিশিং-এ যুক্ত থাকাকে স্থানীয় ভাবে ট্রিপ বলা হয়।)

১১৫। সাক্ষাৎকারঃ নাম- শুকদেব দোলুই, পিতা- হরিপদ দোলুই, বয়স- ৭০, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- গোবিন্দপুর আবাদ, গ্রামপঞ্চায়েত- ব্রজবল্লভপুর, রাক্ষসখালি, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ২৪/০৩/২০১৯।

১১৬। অদ্বৈত মল্ল বর্মন, তিতাস একটি নদীর নাম (কলকাতাঃ পুঁথিঘর, ১৩৬৫), পৃ-৩৮৬।

চতুর্থ অধ্যায়

সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় ও মৎস্যজীবীদের বিপন্নতা

"সুন্দরবন বাস্তবিকই অতি সুন্দরবন। এ বনে ফল বৃক্ষ নাই; দুই একটি ফলবান বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, অধিকাংশই মনুষ্যের অভক্ষ্য। বঙ্গদেশই নদীমাতৃক, সুন্দরবন ততোধিক। কোনও ক্ষীণকায় নদীস্রোত যতই দক্ষিণ দিকে সমুদ্রাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, ততই বিস্তৃত, ততই প্রশস্ত, ততই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ হইয়া, অবশেষে সাগরোপমোকায়ে সাগরে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। যাইতে যাইতে প্রত্যেক নদীপথের পার্শ্বে কত শাখা প্রশাখা, খাল নালা বিস্তার করিতে করিতে গিয়াছে তাহার সংখ্যা করিবার উপায় নাই। নদী হইতে খাল উঠিয়া আঁকাবাঁকা ভাবে বনের ভিতর চলিয়া গিয়াছে। নদীর স্রোতে কোন ত্রিমোহনা বা বাঁকের মুখে পৌঁছিলে দেখা যায় বিস্তৃত চড়া—চড়ার উপর কেওড়া বৃক্ষের শ্রেণী, তাহার অন্তরালে বনস্থলী। চরের উপরে কেওড়াতলায় সুন্দর ছায়ায় হরিণ চরিতেছে, কোথাও বা বৃক্ষের ডালে বানর নাচিতেছে। কোনদিকে নদীর উচ্চ পাহাড় ভাঙ্গিয়া পড়িয়া সুন্দরবনের বৃক্ষ সমূহের শিকড়রাশির প্রাচুর্য প্রদর্শন করিতেছে। সুন্দরবনের বাদা বা বনভূমি যেমন নিরবচ্ছিন্ন জঙ্গলাকীর্ণ তাহার পার্শ্ববর্তী আবাদ বা ধান্য ভূমি সেইরূপ পরিষ্কৃত ও শস্যাস্তরণে আবৃত হইয়া নয়নানন্দ বর্দ্ধন করে।"*

সূদুর অতীত কাল থেকেই সুন্দরবন অরণ্যে সমৃদ্ধ। ইতিহাসের পথ ধরে সুন্দরবনের বনভূমি ও বনজ সম্পদ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। সুন্দরবনের এই অবক্ষয়ের পর্ব শুরু হয়েছে ১৭৭০ সাল থেকে অরণ্য সংস্কারের মাধ্যমে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের ক্রমবর্ধমান চাপে সুন্দরবনের পরিবেশগত ভারসাম্য যথেষ্ট বিপন্নতায় পরিণত হয়, যা বর্তমান সুন্দরবনের ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঔপনিবেশিক সরকার অধিক পরিমাণে রাজস্ব পাওয়ার বাসনায় সুন্দরবনে মনুষ্য বসতির চেষ্টা করে। সুন্দরবনবাসী তাদের জীবিকার জন্য ভীষণ ভাবেই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল।

---

*সূত্রঃ- সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, (প্রথম খণ্ড)(কলিকাতাঃ চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জি এন্ড কোং, ১৩২১), পৃপৃ-৪৪-৪৬।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা কৃষিকাজ, মাছ, মধু, কাঠ-কাঁকড়া সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। দেখা যাচ্ছে বর্তমানে সুন্দরবন তার ভৌগোলিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের একটা রূপরেখা আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছে, তা সে প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে কেন্দ্র করেই হোক অথবা সুন্দরবনের নদী-খাঁড়ি, বন-জঙ্গলের সম্পদের উপর নির্ভর করে থাকা মৎস্যজীবী মানুষের দ্বারায় হোক, সুন্দরবনের এই ভারসাম্যহীনতা সামগ্রিক ভাবে সুন্দরবনের পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি করেছে। সুন্দরবনের উৎপত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে প্রকৃতিবাদী বিজ্ঞানী ও ইতিহাসবিদদেরকে বিস্মিত করে, এই সুবিশাল ভূমি সমুদ্র থেকে উঠে আসেনি বা অন্য কোন স্থলভাগ থেকে বিবর্তিত হয়নি। বিশ্বের দরবারে এই ম্যানগ্রোভ বৃহত্তম একক হিসেবে পরিচিত। সুন্দরবন নানা প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদে সমৃদ্ধ। কৃষিকাজকে উপেক্ষা করে সুন্দরবনের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত মানুষের একটা সংখ্যা ভয় ও ক্ষোভকে বিসর্জন দিয়ে নদী-জঙ্গলের সম্পদের উপর বেঁচে আছে।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র

পার্থিব পরিবেশে মানুষের আবির্ভাব ঘটেছে আজ থেকে খুব বেশি হলে মাত্র ৩৫ হাজার বছর আগে। এই ৩৫ হাজার বছরের মধ্যে মানুষ কৃষিকাজ শিখেছে, জীবজগৎকে পোষ মানিয়েছে। ভূগর্ভ থেকে খনিজ সম্পদ ও জ্বালানি সম্পদ আহরণ করার কৌশল আবিষ্কার করেছে। মানুষের নিজের সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। বর্তমানে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় আটশো কোটি। এই বিপুল সংখ্যক মানুষের মুখে অন্ন জোগাতে অরণ্য সংস্কার করে চাষের জমি তৈরি করতে হয়েছে। জমিতে এক বারের বদলে দুবার, তিনবার চাষ করতে হয়েছে। মাটির উর্বরতা কমে গেলে রাসায়নিক সার নিয়ে মাটিকে চাঙ্গা করতে হয়েছে। তাতে মাটি আরও বেশি রূঢ় ও

অনুর্বর হয়ে উঠছে। নদী থেকে খাল কেটে জলসেচের জন্য জল টেনে নিতে হয়েছে, ফলে নদী তার নিজের পলি, বালি বয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও হারিয়ে ফেলেছে। নদীর বুকে বাঁধ বেঁধে মানুষ জল ধরে রাখার বন্দোবস্ত করেছে; তার ফলে কৃত্রিম জলাধারে পলি জমে এমন অবস্থা দাঁড়িয়েছে যে, ওই বাঁধ আর বর্ষার সময় আগের মতো জল ধরে রাখতে পারে না। জল ধরে রাখার পরিবর্তে জল ছাড়তে হয়। তখন মানুষ মানুষের জন্য বন্যা তৈরি করে। অবশ্য মানুষ মানুষের জন্য কলকারখানা, গাড়ি, বাড়িও বানায়। তবে সে কাজও খুঁতবিহীন নয়। কলকারখানার ধোঁয়া, শিল্পজাত বর্জ্য, ঘর-গৃহস্থালির আবর্জনা এক সঙ্গে জল, জমি আর বাতাসকে দূষিত করে। এর ওপর রয়েছে, মানুষের ওপর মানুষের প্রভুত্বের ইচ্ছা। সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করার জন্য কিছু মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা। অপ্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্রের পরীক্ষা। পিছিয়ে পড়া দুর্বল মানুষকে বঞ্চিত করে, ধনী মানুষের এগিয়ে চলার অমানবিক প্রতিযোগিতা। ফল—বিজ্ঞানীদের পরিভাষায় পরিবেশের অবক্ষয় অর্থাৎ অবনতি। পরিবেশের এই অবনতি বলতে জল, বায়ু, মাটি প্রভৃতি সম্পদ নিঃশেষের মাধ্যমে পরিবেশের ক্ষয় সাধন, বাস্তুতন্ত্রের ধ্বংস সাধন, আবাস ধ্বংস করণ, বন্যপ্রাণী বিলুপ্ত করণ এবং দূষণ বৃদ্ধিকে বোঝায়। এটাকে এভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়- কোন পরিবর্তন বা পরিবেশগত সমস্যার অবনতি যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ক্ষতিকর।

আমার গবেষণা সন্দর্ভের যে সময়কাল ১৯৪৭-২০২১, তা অপরিবর্তিত রেখে আলোচ্য অধ্যায়ে সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের যে চিত্র বা রূপরেখা তুলে ধরার প্রয়াস করেছি, সেখানে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন যাপনের ধারায় কতটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছে এই প্রশ্ন গুরুত্বপূর্ণ। আবার একথাও বলা প্রাসঙ্গিক হবে যে, সুন্দরবনের এই বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয় কি

পুরোটাই প্রাকৃতিক নাকি মনুষ্যসৃষ্ট? এই প্রশ্নের উত্তর, নিম্নোক্ত বিশ্লেষণে পাওয়ার চেষ্টা করা হবে।

ডাঙ্গায় বাঘ আর জলে কুমির এই সত্যতা নিয়ে সুন্দরবন। বঙ্গদেশের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত সমুদ্র কূলবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ ভূ-ভাগকে সুন্দরবন বলে অভিহিত করা হয়। "নিম্নবঙ্গে যেখানে গঙ্গা বহু শাখা বিস্তার করিয়া, সাগরে আত্মবিসর্জন করিয়াছেন, প্রাচীন সমতটের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সেই লবণাক্ত পল্বলময় অসংখ্য বৃক্ষগুল্ম সমাচ্ছাদিত শ্বাপদসঙ্কুল চরভাগ সুন্দরবন বলিয়া পরিকীর্ত্তীত হয়"।[১] উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার উন্নয়নশীল ৬ ও ১৩ টি, সর্বমোট ১৯টি ব্লকের বাদাবন ও লোকালয় নিয়ে সুন্দরবন অঞ্চল।[২] ভারতীয় সুন্দরবন ৯,৬৩০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে, এর মধ্যে ৪২৬৭ বর্গ কিলোমিটার শুধুই ম্যানগ্রোভ অরণ্য। এই অরণ্যের মধ্যে ২,৩৪৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বনভূমি ও বাকি ১৯২০ বর্গ কিলোমিটার জলাভূমি অঞ্চল। ২,৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে উঠেছে, ব্যাঘ্র প্রকল্প বর্হিভূত এলাকা হল ১,৬৮১ বর্গ কিলোমিটার। সুন্দরবনের জনবসতিপূর্ণ এলাকা ৪,৪৯৩ বর্গ কিলোমিটার।[৩] বনহাসিল করা লোকালয়, কৃষিক্ষেত্র, ও লবণ জলীয় মাছ চাষের ভেড়ি অঞ্চলের আয়তন ৫,৩৬৩ বর্গ কিলোমিটার।[৪] সুন্দরবনের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে রয়েছে নদ-নদী, নদীর চর বা ঢাল অর্থাৎ সুন্দরবন নদীনালায় সমৃদ্ধ। মধুমিতা মুখার্জি, Sunderban wetlands রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন- "About 1720 sq. KM such canal water areas are being utilised for canal fisheries."[৫] নদীগুলি সুন্দর বনের উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে। প্রধান নদীগুলি হল হুগলী, বারাতলা, সপ্তমুখী, গোসাবা, ঠাকুরান, হেড়োভাঙ্গা, রায়মঙ্গল, ইছামতী, বিদ্যা, মাতলা। অধিকাংশ নদীগুলি নোনা জলে পূর্ণ। ভারতীয় সুন্দরবনের মোট ১০২ টি অরণ্যময় দ্বীপের যে ৫৪

টি দ্বীপে জঙ্গল হাসিল করে মনুষ্য বসতি স্থাপন করা হয়েছে।[৬] সেই সব দ্বীপের চারপাশে মাটি দিয়ে বাঁধ নির্মাণ করে নদীর জল আটকাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সুন্দরবন এক ফসলি। বর্ষার জলেই মূলত চাষবাস হয়। কৃষিকাজ এখানকার মানুষের জীবিকা হলেও, সারা বছর ধরে সুন্দরবনের বেশিরভাগ মানুষ মাছ সংগ্রহের কাজে যুক্ত থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে।

এই অধ্যায়ে ভারতীয় সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয় জনিত পরিবর্তন ও সুন্দরবনের জলাভূমি, জলাশয়, নদী, সমুদ্রের উপর নির্ভর করে থাকা মৎস্যজীবীদের অবস্থান সম্পর্কিত যে ভারসাম্যহীনতা, তার ঐতিহাসিক এক পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করবো। বাস্তুতন্ত্র কেবলমাত্র একটা শৃঙ্খলা নয়, শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে একে অপরের মধ্যেকার আত্মসম্পর্কের সত্যানুসন্ধান। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের যে ইতিহাস অনুসন্ধানে নিমজ্জিত হয়েছি তাতে নদ-নদী, বনাঞ্চলের উদ্ভিদ, বন্যপ্রাণী, বনজ সম্পদ ও সামুদ্রিক সম্পদ এবং অবশ্যই মনুষ্য সম্পদ এর সঙ্গে সংযুক্ত। সুন্দরবনের অরণ্য প্রকৃতি কালের স্বাভাবিক নিয়মেই গড়ে উঠেছে। বাস্তুতন্ত্র বলতে যা বোঝায় তা হল সমস্ত উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের বেঁচে থাকার জন্য অনুকূল এক পরিমণ্ডল। সুন্দরবনের এই বাস্তুতান্ত্রিক পরিমণ্ডল মানুষের দ্বারা সৃষ্ট নয়, প্রকৃতির আপন খেয়ালে সৃষ্ট। পৃথিবীর বৃহত্তম ও বিস্ময়কর লবণাম্বু উদ্ভিদ বা ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের বনভূমি সুন্দরবন। সুন্দরবন সংরক্ষিত বনাঞ্চল বিশ্বস্বীকৃত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাস্তুতন্ত্র, যেখানে রয়েছে নানান জীব-বৈচিত্র্যের সমাহার। তাছাড়া হাজারো সব উদ্ভিদ সম্পদের প্রাচুর্য যা শতাব্দীকাল ধরে সংরক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের মধ্য দিয়ে সুন্দরবনকে দ্বিখন্ডিত করার যে প্রয়াস প্রাথমিক ভাবে শুরু করা হয়েছিলো সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই বাস্তুতন্ত্রের অবক্ষয়ের বীজ নিহিত ছিল। সেই কাজ সাম্প্রতিক সময়েও অপরিবর্তিত রয়েছে।

সুন্দরবনের অরণ্য সম্পদের বিবরণ

গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের উপকূলীয় অঞ্চলের সুন্দরবনে রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম বাদাবন বা জলাভূমির জঙ্গল। সারা বিশ্বে এখন পর্যন্ত ৫৩ রকম প্রজাতির জলাভূমির বৃক্ষ-গুল্মের সন্ধান পাওয়া যায়। তার মধ্যে শুধু সুন্দরবনে জন্মায় ৩৫ রকম প্রজাতির বৃক্ষ ও গুল্ম।[৭] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ গুলি হল- সুন্দরী (Heritiera minor), গর্জন (Raizophora sp), ধুঁদুল (Xylocarpusgranatum), পশুর (Xylocarpusmekongenesis), কেওড়া (Sonneratia apetala), মট-গরান (Ceriops tagal), তড়া (Aegialitis rotundicauda), গড়িয়া (Kandelia candel), ভোরা (Rhizophora apiculata), বাইন (Avicennia officinalis), গরান (Ceriops decandra), হেঁতাল (Phoenix paludosa), গৌর শিঙ্গে (Dolichandrone spathacea), গোলপাতা (Nipa fruticans), কাঁকড়া (Bruguiera sp), জেলে-গরান (Ceriops decandra), হারজোলা (Acanthus illicifolius), গেঁও (Excoecaria agallocha), গোরি (Kandelia rheeii), কাওরা (Bruguiera gymnorhiza), বাতরাজ (Clerodendrum sp), ওরা (Sonneratia acida) প্রধান।[৮] তাছাড়া আরো কিছু ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের অবস্থান ও পরিলক্ষিত হয় সুন্দরবনে। সেগুলি হল- আমুর, তরা, হিজল, সমুদ্র, খলসি, বাবলা, গামিরাই, ভোলা, হিজলিমেনাদি, করঞ্জা, কেদারসুন্দরি, লতাসুন্দরি, বন কার্পাস, বনভেন্ডি, ঝাউ, দুধিলতা, বাওলি লতা, চুলিয়া কাঁটা, বনক্যান, বনসীম, বড়সীম, কেয়া, পানলতা, সিঙ্গার, ডাবুর, কুরচি, দাদামারি, চায়া, প্রভৃতি গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের অস্তিত্বের প্রমান পাওয়া যায় সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে।[৯] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করে নিম্নলিখিত নোনাজলের উপযোগী ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বা বৃক্ষগুলি যেমন সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ তেমনিভাবে এই ম্যানগ্রোভ আবার মনুষ্য প্রজাতিরও সম্পদ।

স্কটিশ উদ্ভিদবিদ স্যার ডেভিড প্রেনের পরে ভারতে স্বাধীনতা পূর্ব পর্যন্ত সুন্দরবনের উদ্ভিদ নিয়ে বিশেষ কোন কাজ হয়নি। ডেভিড প্রেন ১৯০৩ সালে প্রকাশিত সুন্দরবনের উদ্ভিদ নিয়ে উপযোগী তথ্য দিয়েছিলেন। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ নিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রথম সেমিনার হয় ১৯৫৭ সালে কলকাতায়। সেই সেমিনারের বিবরণীকেই ভারতীয় ম্যানগ্রোভের প্রথম প্রামান্য দলিল হিসেবে গণ্য করা হয়েছিল। বর্তমানে সুন্দরবনের উদ্ভিদদের নিয়ে বহু গবেষণার সূত্রপাত হয়েছে, তার প্রধান কারণ হিসেবে বলা যায় সুন্দরবনে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের গঠনগত বৈশিষ্ট্য এবং প্রতিকূল পরিবেশে অভিযোজনের এই অভিনবত্ব অন্যত্র বিরল।[১০] উদ্ভিদ বৈচিত্র্যের এই আধিক্য থাকার কারণে ১৯৮৪ সালে সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান রূপে ঘোষিত হয়েছিল। নিম্নলিখিত কয়েকটি ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের সার্বিক বিশ্লেষণ তার যৌক্তিকতা বিচার করবে বলে আমার মনে হয়।

সুন্দরীঃ- স্টারকুলেয়েসি গোত্রের এই উদ্ভিদ গ্রীষ্মমন্ডলীয় জোয়ার-ভাঁটার অরণ্যে পাওয়া যায়। সুন্দরবনের নামের সঙ্গে এর সার্থকতা রয়েছে। সুদূর অতীতে কলকাতা নগরীতেও সুন্দরী বৃক্ষের বন ছিল। সুন্দরী কাঠ খুবই দৃঢ় ও মজবুত হওয়ায় খুবই উপযোগী সাপেক্ষ, পোকার আক্রমণ রোধের ক্ষমতা রাখে। সুন্দরী ফুলের মধু উৎকৃষ্ট। মানুষের ব্যাপক হস্তক্ষেপে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে সে আজ বিলুপ্তির পথে।[১১]

গরানঃ- সেরিওপস ট্যাগাল প্রজাতির চিরহরিৎ বৃক্ষ। প্রকৃতই ম্যানগ্রোভ। একে জাত গরান বা মটগরান বলা হয়। সুন্দরবনের অরণ্যে এই বৃক্ষ এমনভাবে নিজেকে সজ্জিত করে রাখে যে দূর থেকে একে পিরামিডের মতো দেখায়। ৬-৭ মিটার এই বৃক্ষের উচ্চতা। প্রচুর পরিমাণে লবণ সহ্যক্ষম গরান সুন্দরবনের জঙ্গলের ৫ শতাংশ জায়গা দখল করে আছে। এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব এতো বেশি যে মানুষের লালসার কুঠার এর ওপর প্রচন্ড আঘাত হানে। পরিণত একটা গরান বৃক্ষ

হালকা লাল বর্ণের হয়। প্রস্ফুটিত হবার সময় গরান ফুলের হালকা ও সুমিষ্ট গন্ধ মৌমাছি ও পতঙ্গ কে কাছে টানে। গরান ফুলের মধু উৎকৃষ্ট। তাছাড়া বাসগৃহ নির্মাণ, নদীর বাঁধ নির্মাণ সহ নানান গৃহস্থালির কাজে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। কান্ডের রস বা ছালের রস ট্যানিনের জন্য, এবং চর্ম ও অন্যান্য শিল্পে ব্যবহৃত হয়। রক্তবন্ধ ম্যালিগন্যান্ট ঘা নিরাময় সহ ভেষজ বিজ্ঞানে গরান খুবই সমাদৃত।[১২]

গেঁওয়াঃ- ইউফরবিয়েসি গোত্রের উদ্ভিদ গেঁও বা গেঁওয়া এক্সোকারিয়া অ্যাগালোচা প্রজাতির। ম্যানগ্রোভ সহবাসী এই উদ্ভিদ চিরহরিৎ, লম্বায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে এই উদ্ভিদটিকে দেখা যায়। এই গাছের পত্র জ্বালানী, আসবাবপত্র, কাগজের মন্ড ও প্যাকিং বাক্সের কাজে খুবই উপযোগী। ভূমিক্ষয় রোধ এবং দ্রুত অরণ্য সৃজনে সক্ষম এই ম্যানগ্রোভ ভেষজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট সমাদৃত।[১৩]

কেওড়াঃ- সোন্নারেসিয়েসি গোত্রের কেওড়া চিরহরিৎ। শ্বাসমূল যুক্ত এই ম্যানগ্রোভ বৃক্ষটি জোনাকিদের বড়ো প্রিয়। রাতের বেলায় এই গাছটিকে ঘিরে জোনাকিময় হয়ে থাকার জন্য বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন ফায়ারফ্লাই ম্যানগ্রোভ। বৃক্ষটি উচ্চতায় ১৫ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কেওড়া ফুলের মধুর পরিচিত রয়েছে দেশ ও দেশান্তরে। নদীর জলে ভাসমান অবস্থায়ও কেওড়া জন্মাতে পারে। আসবাবপত্র, নৌকা নির্মাণ এ ব্যবহৃত হয় কেওড়া কাঠ। ভূমিক্ষয় রোধে বৃক্ষটির গুরুত্ব অপরিসীম। নোনা জলের মাছ বিশেষ করে চিংড়ির আদর্শ বিচরণভূমি হল কেওড়ার জঙ্গল।[১৪]

বাইনঃ- গ্রীষ্মমন্ডলীয় জোয়ার-ভাঁটার অরণ্য উদ্ভিদ গোষ্ঠীর মধ্যে সুন্দরবনের বাইন আভিসিন্নিয়া অফিসিন্নালিস প্রজাতির। বাইন সুন্দরবনের জঙ্গলের প্রায় ৩০ শতাংশ জায়গা দখল

করে থাকে। ২০-২৫ মিটার উচ্চতা সম্পন্ন বাইন বৃক্ষ চিরহরিৎ সম্প্রদায়ভুক্ত। বাইনের ফলের রস ফোঁড়া নিরাময়কারী ভেষজ ঔষধ হিসাবে গণ্য হয়। এই বৃক্ষের পাতা ও ছোট ছোট ডাল-পালা থেকে জৈবসার প্রস্তুত করা হয়। এর বায়বীয় শ্বাসমূলের গায়ে যে বিভিন্ন প্রজাতির শৈবাল জন্মে তাও চিংড়ি-সহ নোনাজলের মাছের খাদ্য সংগ্রহ ও বিচরণের পক্ষে অনুকূল। গৃহস্থালির কাজে বাইন উপযোগী।[১৫]

গর্জনঃ- বাইজোফোরা এপিকুলেটা গোত্রের ম্যানগ্রোভ হল গর্জন। গর্জন সমগ্র ক্রান্তীয় বলয়ে জোয়ার-ভাঁটা খেলা অরণ্যের লবণাম্বু বৃক্ষ। গর্জন সুন্দরবনের অধিক লবণমুক্ত বদ্বীপ অঞ্চলের আদি উদ্ভিদ কুলের অন্যতম। এর বায়বীয় শ্বাসমূল ও অধিমূল জোয়ার-ভাঁটার তীব্র স্রোতেও ভূমিক্ষয় রোধে সক্ষম। গর্জনের বাকল ট্যানিনের কাজে, বিভিন্ন বস্তু রং করতে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত। তাছাড়া গর্জন জ্বালানি, কাঠ-কয়লা, গৃহস্থালির আসবাব, নৌকা নির্মাণের পক্ষে উপযোগী। পাতা ও ছোট ছোট প্রশাখা জৈবসার সৃষ্টির সহায়ক।[১৬]

ধুঁদুলঃ- জাইলোকার্পাস গ্রানাটাম প্রজাতির ধুঁদুল চিরহরিৎ। ২০-২৫ মিটার উচ্চ। দেখতে কাঁঠাল গাছের মতো, অধিমূল আছে। ধুঁদুলের ফল গোলাকার অনেকটা তরমুজের মতো। জলে ভাসমান অবস্থায়ও ধুঁদুল বীজের অঙ্কুরোদগম হতে পারে। ট্যানিনের কাজেও এর বাকল ব্যবহৃত হয়। ভেষজ বিজ্ঞানীরা রক্তক্ষরণ বন্ধে, উদরাময় অসুখে ধুঁদুল ব্যবহারের উপদেশ দেন।[১৭]

পশুরঃ- জাইলোকার্পাস মেকনজেনসিস প্রজাতির পশুর সুন্দরবনের অতি পরিচিত বৃক্ষ। জোয়ার-ভাঁটা প্লাবিত কিছুটা সমতলভূমিতে পশুর ভালো জন্মায়। পশুর পর্ণমোচী বৃক্ষের অন্তর্গত। নদীর জলে ভাসতে ভাসতে পশুর বৃক্ষের বীজের অঙ্কুরোদগম হয়। পরিণত বৃক্ষ কাঁঠাল গাছের

মতো দেখতে। আসবাবপত্র তৈরি, নৌকা তৈরি ও গৃহস্থালির নানা কাজে পশুর মূল্যবান কাঠ হিসাবে পশুর সমাদৃত।[১৮]

গোলপাতাঃ- ম্যানগ্রোভ সহবাসী অ্যারিকেসি বা পামি গোত্রীয় এই উদ্ভিদ সুন্দরবনের জোয়ার-ভাঁটার অরণ্যে এর অবস্থান পরিলক্ষিত হয়। গোলপাতা পাম প্রজাতির নারকেল গাছের মতো দেখতে। গাঢ় লবণাক্ত জলে গোলপাতা জন্মাতে পারে না। গোলপাতা মানুষের দেহের ঘা ও চুলকানিতে বিশেষ উপকারী।[১৯]

হেঁতালঃ- প্রকৃত ম্যানগ্রোভ সহকারী হেঁতাল বোগড়া নামে সুন্দরবনবাসীর কাছে পরিচিত। সুন্দরবনের লবণমুক্ত পরিণত শক্ত মাটিতে হেঁতাল ভালো জন্মায়। ফোনিক্স পালুডোজা বা পাম প্রজাতির হেঁতালের কান্ড ৩-৪ মিটার লম্বা হয়। জঙ্গল বৃদ্ধি ও মাটির ক্ষয়রোধ সহায়ক হেঁতাল ঠাসাঠাসি ভাবে জন্মায়। হেঁতালের বন বাঘ ও বিষাক্ত সাপের উপযুক্ত বাসস্থান। হেঁতাল ও গোলপাতার জঙ্গলে পরিণত মাটির স্তরে অসংখ্য ছিদ্র দেখা যায়। আসলে আর্থ্রপোডা, শামুক ও বিভিন্ন কীটপতঙ্গ গর্ত করে বাসা বাঁধে। হেঁতাল ও গোলপাতা ম্যানগ্রোভ বনভূমির জৈবিক, প্রাকৃতিক উপকার সাধন করে, ভূমির পতন রোধ করে, তুমুল ঝড়ঝাপটা থেকে দক্ষিণবঙ্গকে অনেকাংশে সহায়তা দিচ্ছে।[২০] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে উল্লিখিত ম্যানগ্রোভ বৃক্ষগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও এল এস এস ওম্যালির মতে, এই বাদাবনের প্রধান বৃক্ষগুলি ছিল তখন গরান, গেঁওয়া ও কেওড়া এবং এদের মধ্যে গরান সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গাছ।[২১]

বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ, সুন্দরবনের উল্লিখিত এই সমস্ত ম্যানগ্রোভ কেবলমাত্র অর্থকরী দিক দিয়েই যে সুন্দরবনবাসীকে সমৃদ্ধ করেছে তা নয়। এই সমস্ত বৃক্ষগুলির জীবনধারণ প্রক্রিয়াই প্রাণীকুলকে বাঁচিয়ে রেখে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য জনিত এক শৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে। অনস্বীকার্য, গাছ

ধরিত্রীর নীলকণ্ঠ। একটি গাছ একটি প্রাণ। একটি গাছ পরিবেশের বা বাস্তুতন্ত্রের থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে এবং পরিবেশকে ফিরিয়ে দেয় বিশুদ্ধ অক্সিজেন। এই অক্সিজেনই প্রাণীকুলের তথা আমাদের প্রাণবায়ু। একটি পিপুল গাছের মাথা যদি ডালপালা সমেত **১৬২** ব্যাস মিটার হয়, তো, ঘন্টায় প্রতি **২২৫২** কিলোগ্রাম কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ও ফেরত দেয় **১৭১২** কিলোগ্রাম অক্সিজেন। বস্তুতপক্ষে, ৫৮০ বর্গ মিটার চওড়া সবুজ বন বাতাসে জমে থাকা সালফার যৌগের ৭০ শতাংশ শুষে নেয় এবং পরিবেশের ধূলো, ধোঁয়া ও ক্ষতিকারক গ্যাস ও ধারণ করে। **২৩** হাজার কিলোমিটার অতিক্রমণীয় গাড়ির দূষণও শুষে নেয় একটি পরিণত ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ। প্রাণীজগৎ না খেয়ে জীবনধারণে সক্ষম, কিন্তু অক্সিজেন বাদ দিয়ে ক্ষণমাত্রও নয়।[২২]

এখন প্রশ্ন হল, সুন্দরবনের এত উদ্ভিদ বৈচিত্র্য বা ম্যানগ্রোভ বৈচিত্র্য এল কোথা থেকে। কোথায় ছিল এ বন? তার উত্তর খুঁজতে হলে আমাদেরকে প্রকৃতির শাসনের উপর বা প্রকৃতির নিয়মের মধ্যে খুঁজতে হবে। সত্যতা এই যে প্রাচীন ভারতবর্ষে **১৩** টি মহাবনের কথা জানা যায়। তাদের মধ্যে আঙ্গেরীয় বন (১) অন্যতম। বাকি বন গুলি যথাক্রমে- (২) প্রাচ্যবন, (৩) নৈমিষারন্য, (৪) পঞ্চনদবন, (৫) সৌরাষ্ট্রবন, (৬) অপরান্তক বন, (৭) বামনবন, (৮) দশার্ণকবন, (৯) কারুষবন, (১০) মহাকান্তার, (১১) দন্ডকারণ্য, (১২) কলিঙ্গ বন, (১৩) কালেসবন। মূলত আঙ্গেরীয় বন থেকে সুন্দরবনের সৃষ্টি বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। তাঁদের বক্তব্য, যে প্রায় ৭-৮ হাজার বছর আগে এক বিশাল অরণ্য বঙ্গোপসাগর উপকূল থেকে উত্তর পূর্ব অসমের ব্রহ্মনদ পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এই ভয়াল ভয়ঙ্কর নয়নাভিরাম সুন্দরবন আঙ্গেরীয় বনেরই অংশ[২৩]। পৃথিবীর সমস্ত জায়গায়, বিশেষত ক্রান্তীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভ দেখা যায়। তবে বৈচিত্র্যে তারা এক

এক দেশে এক এক রকম। যেমন পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের উপকূল অঞ্চল অপেক্ষা ভারতবর্ষ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ম্যানগ্রোভের বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশি। পশ্চিম আফ্রিকা ও আমেরিকায় এ পর্যন্ত মোট ৬-৭ রকম প্রজাতির লবনাম্বুজ উদ্ভিদের সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় পাওয়া গেছে ৬০/৬২ রকম লবনাম্বুজ উদ্ভিদ ও গুল্ম। তবে বৈচিত্র্য ও ব্যাপকতায় ম্যানগ্রোভের মহিমা দেখা যায় বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপ অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে, তাছাড়া মালাক্কা প্রণালী, বোর্নিয়া, নিউগিনি, থাইল্যান্ড ইত্যাদি দেশের কিছু কিছু অঞ্চলে। এছাড়া আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে জাম্বেসি ও রুফিসি নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে রয়েছে বিশাল এলাকা জুড়ে ম্যানগ্রোভের সারি। ভারত ও বাংলাদেশের গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ এলাকায় রয়েছে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ম্যানগ্রোভের সারি। তাছাড়া ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে মহানদী, গোদাবরী এবং কৃষ্ণা নদীর ব-দ্বীপ অঞ্চলে রয়েছে ম্যানগ্রোভ অরণ্য। আর প্রকৃতির এই বিচিত্র উদ্ভিদ জগৎ জন্ম নিয়েছে বেশির ভাগই উপকূল আশ্রিত অঞ্চলে। কখনও বড় বড় নদীর মোহনা অঞ্চলে তাদের আবাস গড়ে উঠেছে, আবার কখনও তারা আবাস গড়ে তুলেছে বালিয়াড়ি ঢাকা অগভীর উপহ্রদ অঞ্চলে। এ সব অঞ্চলে সমুদ্রের নোনা জলের অবাধ যাতায়াতের জন্য এরা এসব জায়গা বেশি পছন্দ করে। আর পছন্দ করে অক্সিজেনের তুলনায় হাইড্রোজেন সালফাইড। তাই সমুদ্রের কাছাকাছি বালি মাটিতে এরা জন্মায় বেশি। কেননা এখানকার মাটিতে অক্সিজেনের তুলনায় হাইড্রোজেন সালফাইড-এর পরিমাণ থাকে বেশি। এছাড়া এ ধরণের মাটিতে প্রচুর হিউমাসও থাকে। সুন্দরবন জীবমন্ডল সংরক্ষণের ১৯৮৯-৯০ থেকে ১৯৯৩-৯৪ এর হিসেব অনুযায়ী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ম্যানগ্রোভ অধ্যুষিত অঞ্চলের পরিমাণ ৬৮৭ হেক্টর।[২৪]। প্রাচীন কাল থেকে মানুষের কাছে গরান, বাইন, সুন্দরী, হোগলা, পশুর, ধুঁদুল, গোলপাতা, গর্জন ইত্যাদি সব

ম্যানগ্রোভের পরিচয় ছিল। কেননা প্রাচীনকালে আরবদেশের নাবিকরা যে সব জাহাজ ব্যবহার করতো, জানা যায় যে সে সব জাহাজের মাস্তুল তৈরি হত সম্পূর্ণ একটা ম্যানগ্রোভের কান্ড থেকে। আবার ম্যানগ্রোভ কেটে ও তৈরী হত তক্তা। এবং তক্তা দিয়ে তৈরি হত জাহাজ। ২০০০-৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাহরিন থেকে যে সব জাহাজ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বাণিজ্য করতে আসতো, সেই সব জাহাজের সামনের ও পেছনের অংশ তৈরী হত গরান, বাইন ইত্যাদি সব ম্যানগ্রোভের কাঠ বা তক্তা দিয়ে।[২৫]

ম্যানগ্রোভের ব্যবহারিক দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাস্তুতন্ত্রকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের ব্যবহার মানব সভ্যতার নানান দিকে পরিব্যাপ্ত। বর্তমানে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে নৌকা তৈরির জন্য মূল্যবান কাঠ হিসেবে গর্জন, কেওড়া, পশুর খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। ১৮২৭ সালে রাজস্ববোর্ড সর্বপ্রথম সুন্দরবনের অরণ্যের এই কাঠের উৎপাদনের দিকে দৃষ্টি আরোপ করেছিল। তথ্যে উল্লেখ রয়েছে অন্যান্য কাঠের মতো পশুর নৌকা তৈরির জন্য মূল্যবান কাঠ হিসেবে ব্যবহৃত হত।[২৬] সুন্দরবনের এইসব বৃক্ষ অর্থনীতি, ভেষজ কাজে ব্যবহার ছাড়াও দেখা গেছে মানুষের ক্ষুধা নিবৃত্তির কাজেও ম্যানগ্রোভের জনপ্রিয়তা রয়েছে। এখন পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে তথা সুন্দরবনের ব-দ্বীপ এলাকায় কেওড়ার (ম্যানগ্রোভ প্রজাতি) ফল খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ওই অঞ্চলের দরিদ্র মানুষেরা।[২৭] সুন্দরবনে প্রাপ্ত গোলপাতা গাছ খুবই মূল্যবান। সুন্দরবনবাসীরা যখন জঙ্গলে কাঠ-মধু-মাছ সংগ্রহের জন্য যায় নারকেলের মতো দেখতে গোলগাছের ফল তাদের পিপাসা নিবারণে সাহায্য করে। শিবশঙ্কর মিত্র, তাঁর সুন্দরবনে আর্জান সর্দার গ্রন্থে লিখেছেন— "আর্জানের হাতে আজ তার বন্দুক। সে যেন আর কিছুই পরোয়া করে

না। ফিরবার পথে এক গোল ঝাড়ের মধ্যে এগিয়ে গেল। কয়েকটা গোল ফল ভেঙে তার জলে গলা ভিজিয়ে নিল।”[২৮]

ম্যানগ্রোভের পরিচয় মানেই পরিবেশের পরিচয়। পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারেও ম্যানগ্রোভ এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছে। উপকূল অঞ্চলে সমুদ্রের হাত থেকে ভূমিক্ষয় এড়াতে ম্যানগ্রোভ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। তাছাড়া আঞ্চলিক আবহাওয়ার নিয়ন্ত্রক এই প্রজাতির ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ। ম্যানগ্রোভ ছাড়াও সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে দেখা যায় বাবলা, আকাশমণি, ইউক্যালিপটাস, ঝাউ, দেবদারু, চৌরাসিয়া, কেটকি প্রভৃতি বৃক্ষ। অবশ্য এগুলি ছাড়াও আরো নানান প্রকৃতির বৃক্ষ পরিবেশের সামাজিক বনসৃজন প্রকল্পের জন্য লাগানো হয়েছে। এগুলি রোপণ করার উদ্দেশ্য অবশ্য স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত ও পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা। তাছাড়া কোন স্থানের আবহাওয়া বন্যা বা খরা প্রভৃতির পরিবর্তনে অরণ্যের প্রভাব অপরিসীম। সেক্ষেত্রেও সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ সংক্রান্ত ভারসাম্যও নিয়ন্ত্রিত হয় এই অরণ্যের দ্বারা। অরণ্য প্রকৃতির জলচক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, প্রভৃতি সচল রেখে জীবকুলের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপকরণগুলি সরবরাহ করে। সুন্দরবনের অরণ্য প্রকৃতি প্রচুর জল মাটি থেকে তুলে নিয়ে বা শোষণ করে পরিবেশে ছড়িয়ে দিয়ে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি করে। বিখ্যাত পরিবেশ বিজ্ঞানী তথা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ তারকমোহন দাস একটি ৫০ টন ওজনের গাছ তার ৫০ বছরে জীবিতকালে পরিবেশ তথা মনুষ্য সমাজের যে উপকার করে, আর্থিক দিক থেকে তিনি তার মূল্যায়ন করেন, যেটি **১৯৭৯** সালে গবেষণামূলক প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হয়। সেই মূল্যায়নটি নিম্নে তুলে ধরা হল—

একটি গাছের মূল্য—

অক্সিজেন উৎপাদন	২,৫০,০০০ টাকা
পশু খাদ্য উৎপাদন	২০,০০০ টাকা
ভূমিক্ষয় রোধ ও মাটির উর্বরতা বজায় রাখা	২,৫০,০০০ টাকা
চক্রাকারে জলের আবর্তন, বায়ুর তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ	২,৫০,০০০ টাকা
প্রাণী ও অন্যান্য জীবের আশ্রয় স্থান	২,৫০,০০০ টাকা
বায়ু ও তাপদূষণ (গ্রিনহাউস) নিবারণ	৫০,০০০ টাকা
	১৫,২০,০০০ টাকা

সুত্রঃ সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীব-পরিমণ্ডল (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০০৫), পৃ-৬৮।

বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে একটি গাছের মূল্য হিসাবে যে পরিসংখ্যান এখানে তুলে ধরা হয়েছে তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বাস্তুতন্ত্রের হাজার হাজার গাছ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য কতটা উপকারী ও উপযোগী। ন্যাসি বেকহাম দেখানোর চেষ্টা করেন যে গলফ্ কোর্সের মতো একটা বড় ধরনের অরণ্য ৬ থেকে ৭ হাজার এর মতো মানুষের অক্সিজেনের যোগান দিতে পারে।[২৯] এ থেকে বোঝা যায় যে ৪২৬৭ বর্গকিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র প্রতিনিয়ত কি পরিমাণ অক্সিজেন উৎপাদন করছে তা সহজেই অনুমেয়। দিন দিন সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র নানা কারণে তার আয়তন হারাচ্ছে। ফলে অরণ্যের বিলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে কত পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়বে এবং তার কারণে তাপমাত্রা যে কতটা বাড়বে তা অনুধাবন করা যায়। এখন প্রশ্ন হল- যদি একটি গাছ বছরে আড়াই লক্ষ টাকার উপাদান আমাদেরকে সরবরাহ করে, তাহলে বৃহৎ এই সুন্দরবনের হাজার হাজার গাছ কত টাকা অনুদান দেবে?[৩০] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ অরণ্য বার্ষিক ৪৬.২ কোটি মূল্যের কার্বন শোষণ করে। বাৎসরিক ২৭.৫ কোটি মূল্যের সাইক্লোন প্রতিহত করে[৩১]। যে ম্যানগ্রোভ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে

এতো ভাবে সাহায্য করে, তবুও মানুষ সেই প্রাণদায়ী, অক্সিজেন দায়ী ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ নির্মূল করে চলেছে। অরণ্য ও অরণ্যচারী এই সমস্ত সম্পদ কোনভাবেই পুনর্নবীকরণ সম্ভব নয়। একবার যদি শেষ হয় তবে আর ফিরে আসবে না। ম্যানগ্রোভ লুপ্ত হলে মানুষও লুপ্ত হবে। ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মতো সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে প্রাণী বৈচিত্র্যও সুন্দরবনে অনন্য। যেকারণে ১৯৮৯ সালে সুন্দরবন জীবপরিমন্ডল সংরক্ষিত রূপে ঘোষিত হয়। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে ৩৩৪ প্রজাতির মনোরম বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়।[৩২] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে যে বিচিত্র প্রাণী প্রজাতি দেখতে পাওয়া যায়, সেই প্রসঙ্গে এ কে দাস ও এন সি নন্দী Sundarbans Mangal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "A total of 1434 animal species have been reported so far from the Indian part of Sundarbans from terrestrial, intertidal and aquatic environs. These animals comprise 989 species of invertebrates, one species of hemichordate and 445 species of vertebrates, And amongst 40 species of mammals, 5 species of dolphins, 163 species of birds, 3 species of Monitor lizards, 12 species of turtles and 40 species of snakes are shown in Sundarban."[৩৩] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী উল্লেখযোগ্য প্রাণীদের মধ্যে বাঘ (Tiger), চিতল হরিণ (Chital dear), বন্য শুয়োর (Wild boar), বিভিন্ন প্রজাতির বানর (Monkey), জংলি বিড়াল (Jungle cat), মেছো বিড়াল (Fishing cat), বন বিড়াল, সজারু, কটাল, বেজি, কুমির, বিহঙ্গ প্রজাতির মধ্যে ধড়বক (Large and median egret), কোচে বক (Lettle egrat), পানকৌড়ি (cormorant), শ্বেত-সিন্ধু ঈগল (White bellied sea eagle), মেছো বাজ (Osprey), দৈত্য বক (Giant heron), পিনটেল (Pintaill), উইগন (Wigeon), টাফটেড

পোচার্ড (teeffted pochard), কারলিউ (Carlew), হুইটব্রেল (Whitbrel), প্লডার, পোলিয়াথ হেরন (Goliath heron), প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সরীসৃপ প্রাণীর মধ্যে ময়াল (Python), শঙ্খচূড় (King cobra), কেউটে (Cobra), কালাচ (Krait) সাপ অন্যতম। এছাড়া তার্কেল (Water monitor), সোনা গোসাপ (Yellow monitor), বাংলার গোসাপ (Bengal monitor), সমুদ্রের রিডলে কচ্ছপ (Ridley's turtle), Green turtle, Hawksbill turtle, loggerhead turtle, নদীর মোহনার কুমির (Estuarine crocodile), প্রভৃতি সব প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়। তাছাড়া অমেরুদন্ডী প্রাণীও প্রচুর যেমন গলদা চিংড়ি (Prawn), পাতাল চিংড়ি (Thaliacina sp), বেউলে কাঁকড়া (Fidler crab), লাল কাঁকড়া (Red crab), সাগর কাঁকড়া (Horseshoe crab), সমুদ্র শসা (Sea cucumber), গেছো শামুক (Troe smaoil), সাগর কুসুম (Sea anemone), বিভিন্ন প্রজাতির মৌমাছি (Honey bee) সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে প্রাণী সম্পদে বৈশিষ্ট্যময় করেছে। মাছের মধ্যে হাঙ্গর, মাডস্কিপার, পার্সে, ভাঙর, ভেটকি, প্রায় ১২০ টি প্রজাতির মাছ ও অবস্থান করছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে[৩৪]। বিশিষ্ট সুন্দরবন গবেষক কুমুদরঞ্জন নস্কর মনে করেন সুন্দরবনে বর্তমান বাঘ আছে বলে সুন্দরবনে বন আজও আছে। এবং বনের দৌলতে এখানকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য আজও বজায় আছে। হরিণ তৃণভোজী প্রাণী, যে কারণে হরিণের অবস্থান যদি সুন্দরবনে বেশি হতো তবে বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ সম্পদের উপর আঘাত আসতো। কিন্তু বাঘ আছে বলে হরিণের ভারসাম্য রক্ষিত আছে। ফলত এই শৃঙ্খলা বোধহয় পরিবেশের সামঞ্জস্য বজায় রাখে। বর্তমানে ১৪০ টি পুরুষ বাঘ, ১১৮ টি বাঘিনী ও ৪৭ টি বাচ্চা বাঘ সুন্দরবনের অধিবাসী।[৩৫] ১৯৭৩ সালে সুন্দরবনের ২৫৮৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্প গড়ে উঠেছে। বাঘের

উপস্থিতি কিন্তু সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যকে বজায় রাখে। চোরাশিকার করতে শিকারি ভয় পায়। সুন্দরবনের সম্পদ রক্ষা পায়।

কুমিরঃ সুন্দরবনের গুরুত্বপূর্ণ বন্যপ্রাণী হিসাবে যার কথা বলা দরকার তা হল কুমির। প্রবাদে রয়েছে ডাঙায় বাঘ আর জলে কুমির। সুন্দরবনের কুমির পৃথিবী বিখ্যাত ও ভয়ংকর রকমের হিংস্র। সুন্দরবনের কুমির (এসটুয়াসাইন ক্রোকোডাইন) ২০-২৫-৩৫ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়ে থাকে। পৃথিবীর বৃহত্তম কুমির সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্ব বজায় রাখে। নদীর চিংড়ি ও কাঁকড়া সাধারনত কুমিরের প্রিয় খাদ্য বলে গণ্য হয়। বিশ্বের কাছে সুন্দরবনের এই কুমিরের চাহিদা খুব। এই সুন্দর সরীসৃপটাকে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে না ফেলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার পাথরপ্রতিমা থানার ভগবতপুরে ১৯৭৬ সালে কুমির প্রকল্প গড়ে তুলেছে। এই প্রকল্পের অবশ্য একটা গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য রয়েছে, তা হল বনাঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে কুমিরের ডিম সংগ্রহ করে এনে তার থেকে বাচ্চা তৈরি করা এবং সেখান থেকে বিদেশী মুদ্রা অর্জন করা। যেভাবে তামিলনাড়ুতে ক্রোকোডাইল ব্যাঙ্ক তৈরি হয়েছে বা উড়িষ্যায় তৈরি হয়েছে কুমির প্রকল্প ঠিক সেই ধারণায় পাথরপ্রতিমা ব্লকের ভগবতপুরে সুন্দরবনের কুমির প্রকল্প তৈরি হয়েছে।[১৫]

বন্যশুকরঃ জন্তু হিসাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে বন্যশুকর এক উল্লেখযোগ্য নাম। প্রায় তেরো হাজারের মতো বন্যশুকর বাস করে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে। এরা ছোট ছোট বাঘের শাবক ধরে খেয়ে ফেলে। তাছাড়া বাঘেরও শতকরা ৬০ শতাংশ খাদ্য জোগায় এই বন্যশুকর[৩৭]।

কাঁকড়াঃ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের পোকা হিসাবে চিহ্নিত এই প্রাণীটি। প্রায় ৩০-৪০ রকমের কাঁকড়া দেখতে পাওয়া যায় এখানে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে সমস্ত রকমের কাঁকড়া

পাওয়া যায় তাদের মধ্যে প্রধান- এক দাঁড়ওয়ালা লাল-হলুদ-নীলচে কাঁকড়া, গেছো কাঁকড়া, চিতি কাঁকড়া, পাতি কাঁকড়া, কালো কাঁকড়া, নোনা কাঁকড়া, গোল কাঁকড়া, লজ্জাবতী কাঁকড়া, সন্ন্যাসী বা সাগর কাঁকড়া ইত্যাদি। পরিবেশের ঝাড়ুদার পাখি হিসাবে কাক যেমন সর্বাধিক পরিচিত একটি প্রাণী, তেমনিভাবে সুন্দরবনের ঝাড়ুদার প্রাণী হিসাবে পরিচিত কাঁকড়া পচনশীল বস্তু সামগ্রী খেয়ে সুন্দরবনের জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করে। কাঁকড়া পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ তো বটেই এছাড়া কাঁকড়া থেকে মূল্যবান ঔষধ ও প্রস্তুত হয়ে থাকে।[৩৮] কাঁকড়া সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য বজায় রাখতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অমিতাভ ঘোষ তাঁর ভাটির দেশ গ্রন্থে লিখেছেন—" বাদাবনের পচা পাতা, জঞ্জাল সাফ করে ওরাই বাঁচিয়ে রাখে বনকে। ওরা না- থাকলে তো নিজেদের আবর্জনার চাপেই দমবন্ধ হয়ে মারা পড়ত জঙ্গলের সব গাছ। বাদাবনের জৈবতন্ত্রের একটা বিরাট অংশই যে এই কাঁকড়ারা, সেটা কেউ অস্বীকার করতে পারবে? ডালপালা সমেত সমস্ত গাছের তুলনায়ও যে একটা বাদাবনের কাঁকড়াদের গুরুত্ব বেশি সেটা তো সত্যি? ম্যানগ্রোভের বদলে এই ধরণের নদীমুখের জঙ্গলগুলির নাম কাঁকড়াদের নামেই হওয়া উচিত। কারণ বাঘ বা কুমির বা ডলফিন নয়, এই কাঁকড়ারাই হল গোটা বাদাবনের জৈবতন্ত্রের মূল ধারক"।[৩৯]

মাছঃ বিশালাকার জলাভূমিতে সমৃদ্ধ সুন্দরবন, লোনাজলের এলাকা ১৯২২ বর্গ কিলোমিটার ও স্বাদুজলের এলাকা ৮৯১ বর্গ কিলোমিটার।[৪০] এখানে মাছের মূল উৎস নদী, যা প্রতিদিন ২ বার জোয়ার-ভাঁটা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বাদুজলের অসংখ্য প্রজাতির মাছ যেমন রয়েছে তেমনিই লবনাক্ত জলের মাছও রয়েছে প্রায় ১৩০ প্রজাতির। লবনাক্ত জলের যে সমস্ত মাছ গুলি আমাদের তথা মানব সমাজের প্রাত্যহিক খাদ্যতালিকাভুক্ত ও অর্থনৈতিক কারণে বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলি হল- পার্সে, রামপার্সে, ভাঙন, ভেটকি, খেড়ে ভেটকি, কৈভোলা, ভোলাপমফ্রেট, সাদা পমফ্রেট,

কালো পমফ্রেট, ইলিশ, পাঙ্গাশ, তোপসে, খয়রা, নিহেড়ে, ফ্যাসা, গুরজাউলি, পাত্তা বা কুকুরজীব, আমুদি, রুলি, চাঁদা, পায়রা চাঁদা, সামুদ্রিক ট্যাংরা, শংকরমাছ, পায়রাতলি, বোয়াল, বক মাছ, তেলাপিয়া, বাগদা, চিংড়ি, চেড়ে বাগদা, চাপড়া চিংড়ি, গলদা, কড়া চিংড়ি, লাউঘটি চিংড়ি প্রভৃতি। যদিও কাঁকড়ার মতো চিংড়ি ও জলের পোকা, তবুও এরা খাদ্যগুণে ভরপুর। মিষ্টি জলেও যে সব মাছ পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য- রুই, কাতলা, মৃগেল, বাটা, সিলভারকার্প, গ্রাসকার্প, তেলাপিয়া, জিওল প্রজাতির কই, মাগুর, শিঙ্গি, শোলমাছ, ল্যাটামাছ, বোয়াল, ভেটকি, পুঁটি তাছাড়া মৌরলা, চাঁদা, খলসে, ট্যাংরা, শোলট্যাংরা, প্রভৃতি। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের এই সম্পদ অর্থাৎ সুন্দরবনের মাছের বার্ষিক উৎপাদন গড় ৩০ হাজার মেট্রিকটন, যা স্থানীয় প্রয়োজন মিটিয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী জেলা ও রাজ্য সহ বিদেশেও পৌঁছে যাচ্ছে।[৪১]

পাখিঃ সুন্দরবনের এই অরণ্যে জল-জঙ্গলে ঘেরা পরিবেশে পাখির সঙ্গে সম্পর্ক সুনিবিড়। সুন্দরবনের এই জঙ্গলে ১৬৩ প্রজাতির পাখি রয়েছে, এর মধ্যে ৫৩ প্রজাতির পরিযায়ী।[৪২] উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র্যের নিরিখে সুন্দরবনের খ্যাতি বিশ্বজোড়া, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে সুন্দরবনের লোথিয়ান দ্বীপ, সজনেখালি ও হ্যালিডে দ্বীপ এই তিনটি এলাকা নিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য।[৪৩]

মানবসম্পদঃ

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা

দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন-

শক-হুন-দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"[৪৪]

হাজার হাজার মানুষের রক্ত ধারার সংমিশ্রণে জনপদ গড়ে উঠেছে নয়নাভিরাম সৌন্দর্যমণ্ডিত ম্যানগ্রোভ বাদাবন সুন্দরবনে। শত শত মানব জীবন-জীবিকার আন্দোলনে জাত-পাত ও ধর্মের ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে এক অখণ্ড জনগোষ্ঠী, গভীর প্রাণময় অথচ ভয়ংকর ভয়সঙ্কুল গভীর অরণ্যে নিজেদের অস্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখেছে। জীবনধারাকে চলমান রেখেছে। জঙ্গল হাসিলকে কেন্দ্র করেই মূলত জনসংখ্যার চাপ বেড়েছে সুন্দরবনে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে জায়গা করে নেয় প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদের মতো মনুষ্য সম্পদ। মানুষের স্রোতে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র প্লাবিত হয়ে যায়। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের এই অবক্ষয়ের প্রধান কারণ অবশ্যই জনসংখ্যার আধিক্য, যার ফলস্বরূপ সুন্দরবনের অরণ্যের আয়তনও দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে **১৯৫১** সালের জনগণনার তথ্যে দেখা যায় সুন্দরবনের লোকসংখ্যা **১২** লক্ষের কম।[৪৫] **১৯৮১** সালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭ লক্ষ।[৪৬] **২০০১** সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হল ৩৭ লক্ষের অধিক।[৪৭] **২০১১** সালের আদমশুমারি তথ্যে দেখা যায় সুন্দরবনের জনসংখ্যা ৪৪ লক্ষের অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।[৪৮] গত **১৯৫১** সাল থেকে **২০১১** সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিসংখ্যান নিম্নরূপ-

ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দ	১১,৫৯,৫৫৯ জন	৫৪%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ	১৪,৪৬,২৪২ জন	৮০%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ	১৮,০০,০০০ জন	৮০%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দ	২৭,০০,০০০ জন	৬৭%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ	৩২, ০৫,৫২৪ জন	৮৪%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ২০০১ খ্রিস্টাব্দ	৩৭,৫৭,৩৫৬ জন	৭৬%
ভারতীয় সুন্দরবনের জনসংখ্যা	আদমশুমারি ২০১১ খ্রিস্টাব্দ	৪৪,২৬,২৫৯ জন	

সুত্রঃ সন্তোষ বর্মন, সুন্দরবনের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা (কলকাতাঃ ২০১০), পৃ-৫৬

বিগত প্রায় দুইশত বৎসর কাল যাবৎ সুন্দরবনের গভীর ঘন জঙ্গল সংস্কার শুরু হয়। শুরু হয় ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংসের কাজ। বিস্তার ঘটে আবাদভূমির। কৃষি ভূমির বিস্তার, আর মাছ চাষের ভেড়ি তৈরির জন্য চলতে থাকে অরণ্য পরিষ্কার, এর ফলেই দ্রুততার সাথেই জনবসতির বিস্তার ঘটে।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ক্রমবিবর্তনের ধারা

একটা কথা যা লোকপ্রবাদে পরিণত হয়েছে যে, যে দিন থেকে আদিম মানুষ আগুন জ্বালাতে বা তার ব্যবহার শিখল আর সেদিন থেকেই শুরু হল প্রকৃতির ওপর ধ্বংসের লীলা। লোকপ্রবাদটি আজ যেমন বিশ্ববাসীর জন্য প্রযোজ্য তেমনিভাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। আজ আমরা স্বীকার করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে সুন্দরবনে যেদিন মানুষ প্রবেশ করল ঠিক সেইদিন থেকেই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ধারাটাও পাল্টাতে শুরু করল। উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদ সম্পদ, প্রাণী সম্পদ ও মনুষ্য সম্পদের সহাবস্থান দেখা গেছে তাতে করে নিশ্চিত যে এই অঞ্চলে একটা শৃঙ্খলিত বাস্তুতান্ত্রিক পরিবেশ রচিত হয়েছে। কিন্তু এই শৃঙ্খলা সময়ের হাত ধরে দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৭৭০ সালে ঔপনিবেশিক সরকারের হাতে পড়ে সুন্দরবনের যে অবক্ষয় শুরু হয়েছিল, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতার পরেও সুন্দরবনের সেই চিত্র অপরিবর্তনীয় থেকে গেছে। যদি আমরা সচেতন না হই এই ধারা আরও দ্রুত নিঃশেষের পথে নিয়ে যাবে আমাদেরকে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা ও মনুষ্য সম্প্রদায়ের লালসার বলি হচ্ছে সুন্দরবনের অরণ্য সম্পদ। ফলে বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। সময়ের হাতে পড়ে সুন্দরবনকে গ্রাস করছে জনসম্পদ। সারা পৃথিবিতে ৮০০ কোটির অধিক মানুষের বাস বর্তমান

সময়কালে। ভারতবর্ষে বাস করে ১৪০ কোটি মানুষ। আর পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনে বাস করে ৫০ লক্ষ মানুষ। জঙ্গল হাসিলের হাত ধরে আবাদ ভূমির সম্প্রসারণ বেড়েছে। ফলে সুন্দরবনের ১০২ টি অরণ্যময় দ্বীপের ৫৪ টিতে ভূমি দখল করে মানুষের বসতি নির্মাণ হয়েছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ প্রতিনিয়ত ব্যবহার করে ৫০ লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা নির্ধারিত হচ্ছে।

সুন্দরবনের এই জনবিস্ফোরণ ক্রমাগত ধ্বংস করে চলেছে প্রকৃতির সঞ্চিত সম্পদের ভান্ডারকে। আপেক্ষিক দৃষ্টিতে যদি বিচার করি তবে একটা পরিসংখ্যান মুখে-মুখেই বর্ণিত হয় তা হল এই যে সুন্দরবনের ৫০ লক্ষ মানুষ, যদি প্রত্যেকেই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অংশ মৎস্য সম্পদের ভক্ষক হয়ে থাকে, তবে প্রতিদিন প্রায় ৫০ লক্ষ মাছ পৃথিবী তথা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে হারাচ্ছে। যেটা আমরা গুরুত্ব দিয়েও বিচার করি না। বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যটা কি কাজ করছে এখানে, যদিও বা কাজ করে তবে তা কি করে? এর বিশ্লেষণ হয়তো আজ হবে না অদূর ভবিষ্যতে হয়তো বা হবে। যদি সুন্দরবন থাকে? ভারতবর্ষের সুবিখ্যাত ও সর্ববৃহত্তম ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বনভূমি হল পশ্চিমবাংলার এই সুন্দরবন। পরিসংখ্যানে দেখা যায় ভারতবর্ষের মোট বনভূমির পরিমাণ ২৩ শতাংশ। এর মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ১৩ শতাংশ।[৪৯] এর অধিকাংশই সুন্দরবন দখল করে আছে।

সুন্দরবনের জলজ বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিদকণা ও প্রাণীকণার সমাহার দেখা যায়। এই এলাকার প্রতি লিটার জলে ৩০০ থেকে ৪০০ টি উদ্ভিদকণা বা ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন এবং ২০ থেকে ৩০ টি প্রাণীকণা বা জুপ্ল্যাঙ্কটন থাকে। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন হল জলজ পরিবেশের প্রথম স্তরের শক্তি উৎপাদক। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনকে, জুপ্ল্যাঙ্কটন খাদ্য হিসেবে ভক্ষণ করে। ব্যাঙের রেণু, যা ব্যাঙাচি-

এরকম ৩৪ টি বেনথস প্রজাতি সুন্দরবনে রয়েছে। এখানে বন্যপ্রাণীর মধ্যে ৫০ টি প্রজাতির সরীসৃপ, ৮ টি প্রজাতির উভচর, ৩১৫ টি প্রজাতির পাখি ও ৪২ টি প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী রয়েছে। এছাড়া ২১০ টি প্রজাতির মাছ, ২৪ টি প্রজাতির চিংড়ি, ১৪ টি প্রজাতির কাঁকড়া এবং ৭৩ টি প্রজাতির কম্বোজ বা শম্বুক জাতীয় প্রাণী সুন্দরবনে দেখা যায়।[৫০] সুন্দরবনে এই বাস্তুতন্ত্রে অবস্থানকারী মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার কঠিনতম তথা অসম লড়াইটা চিরকালের, তথাপি এই বাস্তুতন্ত্রের অংশীভূত সমস্ত কিছুর মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক বর্তমান। লড়াই চিরকালীন হলেও নদী-জঙ্গল, কৃষিব্যবস্থা, জীবনচর্যা এখানকার গঠনশীল অর্থনীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র কেন্দ্রিক ম্যানগ্রোভ অঞ্চলের বাস্তুরীতি, জল-স্থলের প্রাণীপুঞ্জের খাদ্য শৃঙ্খল ও উপযুক্ত পরিবেশ পরিস্থিতি বাস্তুতন্ত্রকে একটা নিশ্চিত স্থিতি দিয়েছিল একটা সময়ে। কিন্তু কালের অগ্রগতির হাত ধরে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে অবস্থানকারী উদ্ভিদ ও প্রাণীসম্পদের আজ ধ্বংসের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সুন্দরবনের বনরাজ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে বহু উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদ, বিপন্নবোধ করছে বহু বৃক্ষ ও প্রাণীজগৎ। বাস্তুতন্ত্রকেন্দ্রিক গাঙ্গেয় বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যের অংশীদারি এই সুন্দরবন, সেই স্টারকুলিয়েসি গোত্রের উদ্ভিদ প্রজাতি সুন্দরী যার বিজ্ঞানসম্মত নাম হেরিটিয়েরা এইটন আজ বিলুপ্তির পথে। মানুষের লোভ ও লালসার শিকারে পরিণত হয়ে নিজেকে আর সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অমূল্য সম্পদ বলে প্রমাণ করতে সে ব্যর্থ। জঙ্গল হাসিলের হাত ধরে যতদিন সুন্দরবন সম্প্রসারিত হয়েছে সুন্দরী বৃক্ষের বিলুপ্তি ও সঙ্গে সঙ্গে এসেছে। সূর্যের পশ্চিম দিগন্তে ঢলে পড়ার সাথে-সাথেই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে সন্ধ্যে নামে, আর এতেই ল্যাদাপোকা কিংবা শুয়োপোকার মত দেখতে অথবা কিছুটা সোনালি রং-এর

বা লাল রং-এর গুবরে পোকার মতো অজানা এক বিচিত্র প্রজাতির পোকা সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের পাতা খেতে শুরু করে ক্রমশ বৃক্ষের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেকার সময়ের ব্যবধানে রক্তিম আকার লাভ করে বাস্তুতন্ত্রকে ছেড়ে হারিয়ে যাচ্ছে বেশ কিছু লবনাম্বু বৃক্ষ। যেমন বাইন, গেঁওয়া, কেওড়া, জাত বাইন প্রভৃতি। সম্প্রতি, দ্য গ্রিন-এর জৈব খামার প্রকল্পের প্রভাবে বা প্রাকৃতিক আবহাওয়ার অবনমনে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ পোকার আক্রমনে বিপন্ন। সন্ধ্যা নামলে তাদের আগমন বেশি ঘটে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে। তাই পাচার চক্রের হাত ধরে যেমন সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে প্রাণী সম্পদ হারিয়ে যাচ্ছে ঠিক একই ভাবে অজানা পোকার আক্রমনে উদ্ভিদ শূণ্য হচ্ছে এখানকার বাস্তুতন্ত্র।[৫১] সুন্দরবনের মউলে, বাউলে ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষেরা ম্যানগ্রোভ অরণ্যের উপরে নির্ভরশীল; জ্বালানি কাঠ ও অন্যান্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত কাঠের চাহিদা পূরণ করতে এরা ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস করছে। সুন্দরবনের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় ১৯৮৮ সাল থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যে ১৪৬ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি ধ্বংস হয়ে গেছে। গত দুই শতাব্দীর মধ্যে ৫০০০ বর্গ কিলোমিটার বনভূমি ধ্বংস করে সুন্দরবনে জনবসতি গড়ে উঠেছে।[৫২]

সুন্দরী বৃক্ষের পাশাপাশি সুন্দরবন থেকে যে সমস্ত ম্যানগ্রোভ শ্রেণীর বৃক্ষ বা উদ্ভিদ আজ বিলুপ্তির পথে তাদের মধ্যে অগ্রগন্য হল গোলপাতা (Nypa Fruticaus)। বিনা অনুমতিতে গোলপাতা সংগ্রহ আইনত অপরাধ। নভেম্বর থেকে মার্চ মাস হল গোলপাতা সংগ্রহের সঠিক সময়। নিয়মমতো মাটি থেকে ৯ ইঞ্চি উপরের অংশ থেকে গোলপাতা কাটতে হয়। সুন্দরবনের উপকূলবর্তী মানুষেরা ঘরের নানা কাজে এই গাছ ব্যবহার করতো। গোলপাতাকে গরিবের আশ্রয়স্থলের প্রধান উপাদান হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।[৫৩] কিন্তু বর্তমানে চোরা পথে

গোলপাতা সংগ্রহ করার ফলে এই ম্যানগ্রোভ আজ অবক্ষয়ের পথে। এছাড়া উল্লেখযোগ্য গড়িয়া (Kandelia candal), টগরীবানী (Scyphiphora hydrophyllecea), বনলেবু (Alalantia correa), লতাহরগোজা (Acauthus volubilis), লতাসুন্দরী (Brownlowia lanceolata), কৃপা (Leemnitzxera racemosa), পশুর (Xylocurpus mekongensis), কাউফুল (Tylophora teneeis), ওড়া (Sonneratia griffit hit and alba), গর্জন (Rhizophora apiculata and mucronata), কাঁকড়া (Bruguiera sexngula and gymnorrhiya), আমুর (Aglaia cucullata), নোনা দূর্বা (Aeluropus lagopoides), হিজল (Barringtonia acutangula), বড়সীম বা বনসীম (Canavalia cathartica and lineate), অমললতা (Cissus triplia), করঞ্জ (Derris indica), বুনোগাব (Diospyros ferrea), গেঁওয়া (Excoecaria bicolas), বেঁচি (Flacourtia indica), লতা বেগুন (Sola num trilobatum), কলকে ফুল (Thenetia perevviana) প্রভৃতি। তাছাড়া সুন্দরবনের গভীর বাস্তুতন্ত্রের অংশ বোঁচা হাঁস, প্যাচা, গাঙচিল, কুরা, গয়ের, সাদা ঈগল, হটটিটি, হারগিলে, মদনঢাক, বাঘাবক, মাছরাঙা প্রভৃতি সব পক্ষী সম্পদ অবলুপ্তির আশঙ্কার তালিকায় স্থান লাভ করেছে। এছাড়াও অবলুপ্তির পথে পা রেখেছে শেয়াল, বড়বেঁজি, খটাস, বানর, সজারু, বনবিড়াল, নুঙ্গা ইত্যাদি সব প্রাণী সম্পদ।[৫৪]

সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য এবং বন্যপ্রাণীর বাস্তুতন্ত্র হল এক খাদ্যগ্রহণ ও সংস্থান প্রক্রিয়া। খাদ্যশৃঙ্খল অনুযায়ী বাস্তুসংস্থান বা খাদ্যচক্রের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে উদ্ভিদকণা ও প্রাণীকণা। বনের সবথেকে ক্ষুদ্রপ্রাণী ছোট মাছ, কাঁকড়া ও শামুক এই কণা গুলো খেয়ে বেঁচে থাকে। ছোট মাছ আবার মাঝারি ও বড় মাছ এবং পাখি ও অন্যান্য প্রাণীর খাবার। পাখি আর হরিণ হচ্ছে শক্তিশালী প্রাণী বাঘের খাবার। ফলে উদ্ভিদকণা ও প্রাণীকণা মারা গেলে সব স্তরের প্রাণীদের খাদ্য জোগান

বন্ধ হয়ে যাবে, ফলে তারা শেষ হয়ে যাবে।[৫৫] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে স্বাভাবিক কারণে থাকে নানান সব উদ্দীপনা-উন্মাদনা-কৌতূহল। আরও সব কিছুকে ঘিরে যার অবস্থান সেই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের জীবন্ত এক আতঙ্ক হল বাংলার বাঘ। সারা বিশ্ববাসীর নিকট রয়্যাল-বেঙ্গল-টাইগার নামে সমধিক পরিচিত। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে এই প্রাণীর বিচরণ বাঁচিয়ে রেখেছে বাস্তুরীতি বা ইকোসিস্টেমকে। সেই বাঘের সংখ্যা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে খুবই নগণ্য। বাস্তুতন্ত্রের এই প্রাণী সম্পদের বিলুপ্তির নানান কারণ রয়েছে। মানুষের আগমনই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন সাধিত করেছে; ধ্বংস করেছে বাঘের সংখ্যা, নামিয়ে এনেছে অবলুপ্তির পথে। এর শিকড় অবশ্য অতীতে রোপণ করা হয়েছিল। সুন্দরবনের জঙ্গল হাসিল করে আবাদ তৈরির প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন ২৪ পরগণা জেলার কালেকটর জেনারেল ক্লড রাসেল। যে কারণে আবাদ ভূমির সম্প্রসারণের হাতে পড়ে শুরু হল জঙ্গল হাসিল এর কাজ। শহর গড়ার মহাযজ্ঞে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে ভিড় জমলো মানব সম্পদের। মজুরদের ওপর দায়িত্ব বর্তালো বাঘ নিধন ও কুমির নিধনের মহান কার্যকলাপের। কাঠুরে মজুরদের বন্দুক ধরার সাধ্যি ছিল না। তারা বাঘ মারতো দা-কুড়াল-বল্লম দিয়ে। এর জন্য পুরষ্কারও পেত তারা। তাছাড়া সাহেব শিকারিরা বন্দুকের সাহায্যে বাঘ মারতে পারলেই উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতেন সরকারের কাছ থেকে। অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে রাজা-সম্রাটদের হাতে নিহত হয়ে বিপন্ন প্রজাতির দলে সে নাম লিখিয়েছে। মোগল আমল থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত ব্যাঘ্র হত্যাকারীদের নাম ও নিহত বাঘের সংখ্যা ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়েছে নিম্নে সারণিতে তা দেওয়া হল-

১। মোগল সম্রাট বাবর নির্বিচারে বাঘ শিকার করেছেন।

২। জাহাঙ্গীর ৮৭ টি বাঘ শিকার করেছেন।

৩। নূরজাহান (১ লক্ষ টাকার ব্রেসলেট উপহার পেয়েছিলেন) ৪ টি ব্যাঘ্র মেরে।

৪। ডব্লু. রাইস (শ্বেতাঙ্গ রেলওয়ে অফিসার) ১৫৮ টি বাঘ নিধন করেন।

৫। আর. গর্ডন কানিং (ব্রিটিশ শিকারী) ৮৩ টি বাঘ মেরেছেন।

৬। বি. সাইমন (ব্রিটিশ শিকারী) ৬০০ টি বাঘ মেরেছেন।

৭। কর্নেল নাইটিঙ্গেল (ব্রিটিশ শিকারী) ৩০০ টি বাঘ মেরেছেন।

৮। মন্টেগুয়ে জিরার্ড (ব্রিটিশ শিকারি) ২২৭ টি বাঘ নিধন করেছেন।

৯। স্যার গুর্ডার মহারাজা ১১৫০ টি বাঘ মারেন।

১০। যাতে সিং ১০০০ টি বাঘ মারেন।

১১। মাধো রাও সিন্ধিয়া ৮০০ টি বাঘ শিকার করেন।

১২। গুলার সিং ৬১৬ টি বাঘ শিকার করেন।

১ ৩। নৃপেন্দ্র নারায়ন ৩৭০ টি বাঘ শিকার করেন।

এই পরিসংখ্যানের[৫৬] উপর নির্ভর করেই বলা যায় যে বর্তমানে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে বাঘের সংখ্যা কমছে। **১৯৭৩** সালে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের সূচনা হয়। **১৯৭৩** সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বাঘের সংখ্যার একটা পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হল-

সাল	বাঘের সংখ্যা	সাল	বাঘের সংখ্যা
১৯৭৩	৫০	১৯৯২	২৭৭
১৯৭৬	১৮১	১৯৯৬	২৭৭
১৯৭৯	২০৫	১৯৯৯	২৯০
১৯৮৩	২৬৪	২০০১	২৪৫
১৯৮৯	২৬৯	২০০৪	২৭৪

সূত্রঃ বিকাশকান্তি সাহা, সুন্দরবন কথা (কলকাতাঃ দে পাবলকেশান, ২০১৬), পৃ-৭২

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে মূলত বাঁচিয়ে রাখে বাঘ। বাঘের অনুপস্থিতির কারণে বাড়বে চোরাশিকার। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলিত বাস্তুরীতি বিপন্ন হবে। যার প্রভাবে মনুষ্য সম্পদও তাদের জীবন বাঁচাতে ব্যর্থ হবে। কেবলমাত্র বাঘ নয় মানুষের আগ্রাসনে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে হারিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী। তারমধ্যে গন্ডার, বুনোমোষ, স্বর্ণ মৃগ উল্লেখযোগ্য। বিপন্ন প্রায় প্রজাতির মধ্যে মোহনার কুমির, অলিভরিড্লে কাঠা, বাটাগুর কচ্ছপ, গোসাপ, ময়াল সাপ, অজগর, কেউটে সামুদ্রিক কচ্ছপ ইত্যাদি। এভাবে পরিবর্তন হলে সুন্দরবন তথা অরণ্যের শৃঙ্খলাও বিলুপ্তির পথে যাবে। তাছাড়া সুন্দরবনের দক্ষিণ উপকূল অঞ্চলে জাভা গন্ডারের মতো খানিকটা দেখতে ছোটো আকারের গণ্ডার আর দেখা যায় না। উনিশ শতকের প্রথম দিকে শেষ গন্ডারটিও শিকারির হাতে প্রাণ দিয়েছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের পূর্ব প্রান্তীয় জঙ্গলে ৭-৮ ফুট লম্বা শিং-ওয়ালা বন্য মহিষ দেখতে অনেকটা মোষের মতো, উনিশ শতকের আশির দশকে সে বেচারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। এছাড়া ডোরাহীন লালচে রঙের কুকুরে হরিণ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। বর্তমানে বিলুপ্তির পথে অলিভ রিডলে কাঠা, বাটাগুর কচ্ছপ,

মার্গার কুমির, লোনাপানির কুমির, কালোকাছিম, অজগর, কেউটে, গোখরো, চন্দ্রবোড়া ইত্যাদি।[৫৭] এই ভাবে দেখা যাচ্ছে অতীত সময় থেকে **১৯৪৭** সালে ভারতে স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও তার পরবর্তী সময় থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত অযাচিত ভাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে চলেছে। যেকারণে **১৯৪৭** সালের পরে **১৯৫৭** সালে সুন্দরবনের এই প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা ও সুন্দরবনের এই অবক্ষয়ের সচেতনতায় কলকাতাতেই প্রথম সেমিনার হয়েছিল একথা আগেই আলোচনা হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে অর্থাৎ **১৯৬১** সাল থেকে বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ ও প্রাণী সম্পদের উপযোগিতা সংক্রান্ত গবেষণা ও আলোচনা হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে দিন দিন সুন্দরবনকে যে অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, এখন থেকে সচেতন না হলে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের জীবপরিমন্ডল সুরক্ষিত থাকবে কিনা সন্দেহ।

বাস্তুতান্ত্রিক ভূমিক্ষয়

বিপুল সম্ভাবনাময় সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র আজ অবহেলিত ও সঙ্কটাপন্ন, নানান সমস্যায় জর্জরিত। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে যে সমস্যা তা সাধারণত প্রাকৃতিক ও আর্থ-সামাজিক। আবার এই সমস্যা দুটিকে নিয়েই রচিত সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র। ম্যানগ্রোভ অরণ্য ধ্বংস, বাস্তুতন্ত্রের বন্যপ্রাণীর বিলুপ্তি, পরিবেশগত ভারসাম্যের বিনাশ, সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যা হ্রাস, বিরল প্রজাতির গাছ ও পশুপাখি হত্যা, বিশ্ব-উষ্ণায়ণ, নদী বাঁধের ভাঙন, বৃষ্টিপাতের সংকটজনিত সমস্যা, জলাভূমির বিলুপ্তি, জনবসতির দ্রুত বিস্তার ও ভূগর্ভস্থ জলস্তরের হ্রাস প্রাপ্তি প্রভৃতি সব প্রাকৃতিক সমস্যা এবং সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অধিবাসীদের জীবিকার সমস্যা, কৃষি-শিল্প-শিক্ষা সংক্রান্ত সমস্যা, সড়ক-নদী-রেলপথে যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, বিদ্যুৎজনিত

সমস্যা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন ও চিকিৎসা জনিত সমস্যা, বিকল্প কর্মসংস্থানের সমস্যা, জলদস্যু-চোরাশিকারি-সীমান্তে অনুপ্রবেশ জনিত সমস্যা, মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা প্রভৃতি সব সমস্যায় সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন।

পশ্চিমবাংলার গাঙ্গেয় উপকূলের সুন্দরবন নবীন ও দ্রুততম পরিবর্তনশীল একটি ভূখণ্ড। অসংখ্য নদী-খাঁড়ি সহযোগে বিস্তৃত সুন্দরবন। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে কাঁটাতারের মাধ্যমে সুন্দরবনকে দ্বিখণ্ডিত করে ভারত ও বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে ভাগাভাগি করার ইতিহাসের সঙ্গে আমরা পরিচিত। এর ফলে লক্ষাধিক মনুষ্য সম্পদের আগমন হয়েছিল সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে। স্বাভাবিকভাবেই মনুষ্য সৃষ্ট এই সমস্যা সুন্দরবনের অবক্ষয়কে ত্বরান্বিত করেছিল। তবে প্রাকৃতিক নিয়মে ও ভৌগোলিক কারণে সুন্দরবন ক্রমশ অবনমনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, যার প্রভাব পড়ছে মৎস্যজীবীদের উপর। ভূতত্ত্ববিদ কলোনেল গ্যাস্ট্রেলের অভিমত হল— সুন্দরবন ভূ-খন্ডের ভিত্তি যথেষ্ট সুদৃঢ় নয়, ভূ-পৃষ্ঠের মাত্র ১৫০ ফুট নিম্নে ৪০ ফুট পুরু একটি তরল বালির ভিতের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মতো ঐতিহাসিক যুগেও এই ব-দ্বীপ ভূ-কম্পনে আলোড়িত হয়েছে। এর ফলে ভূগর্ভস্থ তরল বালির স্তর উপরিভাগের ভার ধরে না রাখতে পেরে বারংবার সমুদ্রের দিকে নেমেছে। যার কারণে উপরিভাগের গাছপালা, জীবজন্তুসহ ভূগর্ভে নিমজ্জিত হয়েছে।[৫৮] অসংখ্য নদী-খাঁড়ি সহযোগে বিন্যস্ত রয়েছে সুন্দরবন। উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে বহমান এই খাঁড়ি পথ দিয়ে ১৭.২১ লক্ষ বর্গকিমি বিস্তৃত গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা অববাহিকা থেকে আসা ৮৫ কোটি টন পলি প্রতি বছর জোয়ার ভাঁটার টানে মোহনায় সঞ্চিত হয়। তাসত্ত্বেও সুন্দরবনের দ্বীপগুলোর আয়তন বাড়েনি, কোথাও ভাঙছে কোথাও গড়ছে।[৫৯] ভারতীয় সুন্দরবনের ভাঙা-গড়ার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল-

ক্রমিক সংখ্যা	দ্বীপ / দ্বীপপুঞ্জ	১৯১৭ (আয়তন, বর্গকিমি)	২০২০ (আয়তন, বর্গকিমি)
১	সাগরদ্বীপ	২৩৯.৯০	২৩৩.৪০
২	ঘোড়ামারা-সুপাড়িভাঙা-লোহাচড়া-বেডফোর্ড	৩২.০৯	৩.৫৯
৩	মৌসুনি	৩৩.৫১	২৬.২১
৪	জম্বুদ্বীপ	৫.৭৯	৩.০৫
৫	নামখানা	১৫৭.৩৯	১৪৩.৭৯
৬	জি-প্লট	৮৪.৬৩	৪০.৭৯
৭	লোথিয়ান	২৬.৭২	৩৬.৪৩
৮	ধনচি	৬৮.২৯	৩৩.৭০
৯	পাথরপ্রতিমা	১১০.৭৫	১৪০.১২
১০	বুলচেরি	৪২.৯৮	১৯.২৩
১১	ধুলিভাসানি ও চুলকাঠি	২০৩.৩৯	১৮২.৬৬
১২	আজমলমারি	৮৬.০২	৬৮.৬১
১৩	হেড়োভাঙা	৫৮.৭৩	৪৫.৬৮
১৪	কুলতলি ব্লকের অংশবিশেষ	৫০.৬১	৭৩.৯১
১৫	বাসন্তী ব্লকের দক্ষিণাংশ	১৬৫.৪৮	১৬২.১৭
১৬	গোসাবা ও সংলগ্ন দ্বীপসমূহ	৪১০.২২	৪০১.২৬
১৭	ডালহৌসি ও ভাঙ্গাদোয়ানী	১০৫,৪০	৭৮,০৯
১৮	নেতিধোপানি ও তার দক্ষিণাংশ	৩৫২.৫৮	৩৩৯.৪৪
১৯	সজনেখালি-সুধন্যখালি-পঞ্চমুখানি	২৭৯.৮৬	২৮২.৮০
২০	চামটা, গোনা, বাঘমারা ও চাঁন্দখালি	৫৩৯.৭৯	৫০১.৩৫
২১	আড়বেশি ও কাটুয়াঝুড়ি	২৬৯.৯৩	২৪৫.৪৮
২২	ঝিলা	৯৩.২৮	৮৮.৬৬
মোট		৩৪১৭.৩৩	৩১৫০. ৪২

সূত্রঃ কল্যাণ রুদ্র, ভূখন্ড সুন্দরবন শতাব্দীর বিবর্তন, শুধু সুন্দরবন চর্চা, জুলাই-অক্টোবর ২০২১, পৃ- ৮

উল্লিখিত তালিকাটিতে সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের যে চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, এথেকে প্রতীত হয় যে ১৯১৭ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলার উপকূল ভাগের ২২টি দ্বীপের আকৃতিগত পরিবর্তন সমগ্র সুন্দরবনের ভারসাম্যকে বিঘ্নিত করেছে। কেবলমাত্র এই ২২টি দ্বীপ নয়, ৩৫০০, ১০২ ও ৫৪ সংখ্যাগুলো বিপন্নতায় অবক্ষয়ের পর্যায়ে অগ্রসর হচ্ছে। অর্থাৎ সুন্দরবনের ১০২ টি দ্বীপ, ৫৪ টি মনুষ্যভূমি ও ৩৫০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ ও অসংখ্য উদ্ভিদ প্রজাতিসহ মৎস্য সম্পদ IUCN বা International Union for Conservation of Nature and Narural Resources এর ২০২০ সালের বিচারে অবক্ষয়ের স্বীকার। উল্লিখিত 'সুন্দরবনের ভাঙা ও গড়া' তালিকায় পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট দ্বীপটির আয়তন ২০২১ সালে ৮৪ বর্গকিলোমিটার থেকে ৪০ বর্গকিলোমিটারে এসে দাঁড়িয়েছে। জি-প্লট দ্বীপের দক্ষিণের সর্বশেষ জনবসতিপূর্ণ এলাকা গোবর্ধনপুর। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ে সাড়ে পাঁচ হাজার বিঘার এলাকা এখন আড়াই হাজার বিঘায় দাঁড়িয়েছে। সমুদ্র যত এগিয়ে আসছে জলাশয়, বসতবাড়ি, চাষের জমি লোনা জল গ্রাস করে নিচ্ছে। এখানকার নব্বই শতাংশ মানুষই মৎস্যজীবী, কিন্তু বাসস্থান হারিয়ে এখন ভূমিহীন-উদ্বাস্তু এরা। ২০০৯ সালের আইলা ঝড় মানুষগুলোকে সর্বস্বান্ত করেছে। আগে এই এলাকায় তরমুজ, লঙ্কা ও পান চাষ করেও জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু নদী বাঁধ ভাঙনে লোনা জল প্রতিবারেই প্লাবিত করছে এলাকাকে, যেকারণে এই সব চাষ বন্ধ হয়ে গেছে। এই এলাকার বেশিরভাগ মানুষ বাঁধের কোলে বসবাস করে, বর্তমানে এখানকার মানুষের জীবিকার ভরসা নদীর মাছ। ২০২০ সালের আমফান ও ২০২১ সালের ইয়াস ঝড় জি-প্লটের অস্তিত্বের উপর প্রশ্ন চিহ্ন তৈরি করেছে।[৬০] একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ হল— জলবায়ুর পরিবর্তন, সাগরের ফুলে-ফেঁপে ওঠা, বনাঞ্চলের অপসারণ, ক্রমবর্ধমান সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা এসবের

কারণে উপকূলের দ্বীপগুলির রূপ ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। তাছাড়া সমুদ্রের গ্রাসে পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের সব দ্বীপেরই দক্ষিণাংশ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে।[৬১] উক্ত তালিকাতে আরও দেখা যায় নামখানা, জম্বুদ্বীপ, পাথরপ্রতিমা ব্লকের জি-প্লট, বাসন্তী, গোসাবা, সাগরের ঘোড়ামারা প্রভৃতি সুন্দরবনের এই সব এলাকাগুলো তাদের পূর্বের অবস্থা থেকে অনেকটাই ভৌগোলিক ভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। সুন্দরবনের ভূমির এই অবক্ষয়ের সাথে বাস্তুতন্ত্রের ম্যানগ্রোভ অরণ্যও ধ্বংস হয়েছে। ঔপনিবেশিক সময়ে সুন্দরবনে বসতি নির্মাণ যেমন বন ধ্বংস করে করা হয়েছে, একই ভাবে ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে বাসস্থানের সুবিধার্থেও বন কেটে বসতি নির্মাণ হয়েছে। এছাড়া মৎস্য চাষের জলাশয় ও ভেড়ি তৈরিতেও সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বিপন্ন হয়েছে। ১৭৮০ থেকে ১৮৭৩ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ব্যাপক হারে বন সংস্কার হয়েছিল। ১৮০০ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত এই কাজ বন্ধ থাকলেও পরে অবশ্য ১৮৭৩ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সুন্দরবনের উত্তর অঞ্চল ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল মিলে পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর, বাসন্তী, মথুরাপুর, কুলপি, কুলতলি প্রভৃতি এলাকা সংস্কার করা হয়েছিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পরে ১৯৫০ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত যে সমস্ত বন অবশিষ্ট ছিল তার সংস্কার করা হয়েছিল মূলত বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের বসবাসের জন্য। ১৯৬৩ সালে ঝড়খালি ও হেড়োভাঙ্গা অঞ্চলের ৫০০০ একর বন সংস্কার করে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য বন্দোবস্ত হয়েছিল।[৬২] পরিসংখ্যান করে দেখা গেছে সুন্দরবনের সাগরদ্বীপ এলাকার ১০,০০০ বর্গকিমি, ছোট মোল্লাখালির ১০০০ বর্গকিমি, বাসন্তী ব্লকের ১০,০০০ বর্গকিমি ও ক্যানিং এলাকার ২০০০ বর্গকিমি এলাকার ম্যানগ্রোভ বনভূমি বিগত ১০ বছরের মধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।[৬৩] ২০২১ সালের জুন মাসে বাসন্তী থানার আনন্দবাদ মৌজায় যন্ত্রের সাহায্যে ম্যানগ্রোভ কেটে প্রায় ১৪০০ বিঘা বা প্রায় ৪৬৭ একর

জায়গায় ভেড়ি বানানো হয়েছে।[৬৪] সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের পশ্চাতে একদিকে মনুষ্যবসতি যেমন দায়ী, একইভাবে বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ব-উষ্ণায়নও সুন্দরবনের অবক্ষয়ে অশনি সংকেত সূচিত করেছে। পরিবেশের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে বরফের পাহাড় গলে গিয়ে সমুদ্রের জলের পরিমাণ বাড়িয়ে তুলেছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৫০ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সমুদ্রতলের উচ্চতা প্রায় ১৫ সেমি বেড়েছে। বিশ্বজুড়ে সমুদ্রতলের বৃদ্ধি গড়ে ৩.২ মিটার হলেও ভারতীয় সুন্দরবনের ক্ষেত্রে তা প্রায় ৮ মি.মি.।[৬৫] বিশ্ব-উষ্ণায়নের কারণে সমুদ্রের তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তিত হয়েছে। যেকারণে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিমাণ সমান ভাবে বাড়ছে। সমীক্ষায় দেখা গেছে ১৯৪৭ সালের পর থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সুন্দরবনে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় সুন্দরবনের বাস্তুতান্ত্রিক কাঠামোতে ব্যাপক আকারে পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ১৯৭০ থেকে ১৯৮০র দশকের মধ্যে ঘন্টায় ২৫০ কিমি গতিবেগে আছড়ে পড়া ১৯৮৯ সালের বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় সুন্দরবনের প্রভূত ক্ষতিসাধন করেছিল।[৬৬] প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলেও ২০০৯ সালের আইলা ঝড় সুন্দরবনের ভৌগোলিক চেহারার ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করেছিল। অর্থনৈতিক ভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে এখানকার মৎস্যজীবীসহ সুন্দরবনবাসী। আইলার তান্ডবে সুন্দরবনের প্রায় ৮০০ কিলোমিটার নদীবাঁধ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দুই চব্বিশ পরগণা মিলে আনুমানিক ১৯ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল আইলার তান্ডবে, যার প্রভাব এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি সুন্দরবনের মানুষ।[৬৭] ২০১৯ সালের নভেম্বর মাসের বুলবুল ঝড়ে উত্তর ২৪ পরগনায় ১ লক্ষ ৪৩ হাজার ৭৬৮ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়। জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত চাষির সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। কাকদ্বীপ, নামখানা ও পাথরপ্রতিমা ব্লকের ৬০ শতাংশ পানের বরোজ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।[৬৮]

২০২১ সালে আমফান ও ইয়াস ঝড়ে সুন্দরবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সুন্দরবনের ঘোড়ামারা, কাকদ্বীপ, নামখানা, পাথরপ্রতিমা, সাগর, মৌসুনি ও ফ্রেজারগঞ্জ। সুন্দরবনের নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত করেছিল কৃষিজমি ও মৎস্যজীবীদের মাছ চাষের ক্ষেত্র।[৬৯] এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় একদিকে সুন্দরবনের ভূমিরূপের পরিবর্তন যেমন করে চলেছে অন্যদিকে ম্যানগ্রোভ অরণ্যসহ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের প্রাণীসম্পদের উপরেও আঘাত আনছে। পরিবেশবিদদের অনুমান সুন্দরবনের এই অবক্ষয়ে আগামী ৪০ বছরের মধ্যে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অবলুপ্তির সম্ভবনা রয়েছে। ১৯৪৭ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনে সুন্দরবনের জলজ বাস্তুতন্ত্রের বহু প্রজাতির উদ্ভিদসম্পদ ও প্রাণীসম্পদ ধ্বংস হয়েছে। জাহাজ, লঞ্চের ও নৌকার পোড়া তেল নদীর জলে মিশে ম্যানগ্রোভ অরণ্যের বৃদ্ধি বন্ধ করে দিচ্ছে, বিশেষ করে গোলপাতা গাছের। সুন্দরবনের মাছের ২০০ প্রজাতির মধ্যে ৯৩ প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। বর্ষাকালে সুন্দরবনের নদী-সমুদ্র থেকে যে-হারে ইলিশ পাওয়া যেত, বর্তমানে তা কমে গেছে।[৭০] এমনিতেই সুন্দরবনের কৃষি মূলত এক ফসলি, জলবায়ুর উপর নির্ভর করে ধান ছাড়াও লঙ্কা, উচ্ছে, ঝিঙে, তরমুজ ইত্যাদি ফসল উৎপাদন ভালো হত। ক্রমাগত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে সুন্দরবনে অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে কৃষিকাজ বিপন্ন হচ্ছে। বিগত ৮০ বছরে সুন্দরবন অরণ্য এবং বসত এলাকা মিলিয়ে প্রায় ২৫০ বর্গ কিলোমিটার জমি নদী বা সমুদ্র গর্ভে গিয়েছে।[৭১] এই অবক্ষয় সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে যেমন বিপদ ডেকে আনছে, একই ভাবে সমগ্র সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের বিপন্নতাকে প্রকট করে তুলছে।

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে অরণ্য ও পরিবেশ আইন

আলোচনার সুবিধার্থে প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো যে বাস্তবিকই সুন্দরবনের জন্য আলাদা করে কোন আইন তৈরি হয়নি। কার্যকরী বিভিন্ন উন্নয়ন দ্বারা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে বসবাসকারী মউলে-বাউলে-মৎস্যজীবী তথা সমগ্র মানব সমাজের উন্নতিতে সহায়তা দান করা হয়েছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে নিয়ে বর্তমানে অনেক ভাবনা চিন্তা চলছে। কারণ বিশ্ববাসী আজ নানান সমস্যার মধ্যে পড়ে গিয়ে অরণ্যের উপযোগিতা অনুধাবন করতে পেরেছে। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ধ্বংস করার কাজ ঔপনিবেশিক আমল থেকে দ্রুততর হয়েছে বলে আমার মনে হয়। কারণ ১৮৫৩ সালে ভারতে রেলপথ সম্প্রসারনের কাজ শুরু হয়। বম্বে থেকে থানে পর্যন্ত প্রথম রেলপথ তৈরি হয়ে, রেল চলতে শুরু করে। সেখানে রেলপথের সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহার করা হত কাঠের স্লিপার। স্লিপারগুলি অধিকাংশই আসতো শাল, সেগুন কিংবা অরণ্যের মধ্যেকার নানা দামি বৃক্ষ ছেদন করে। তাতে যেমন গভীর অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রে ভারসাম্য আঘাতপ্রাপ্ত হতো, তেমনই ভাবে অরণ্যের সাথে যুক্ত মানুষদের সমস্যায় পড়তে হত। ভারতে অরণ্য আইন তৈরির পশ্চাতে ব্রিটিশদের সাম্রাজ্যবাদী নীতি কাজ করেছিল। তাছাড়া অরণ্যের সঙ্গে যুক্ত মানব সমাজ তথা কোল, ভিল, মুন্ডা, সাঁওতাল প্রভৃতি সব আদিবাসী মানুষের জীবন, তা অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ দিয়েই পরিপূর্ণতা লাভ করত। যখন কাঁচামাল সংগ্রহ ও বনজ সম্পদ সংগ্রহের ওপর ব্রিটিশদের ঝোঁক বাড়ল, তখন বিঘ্নিত হলো বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য ও অরণ্যে অধিবাসীদের স্বার্থ। অনেক আন্দোলন, অনেক প্রতিবাদের চিহ্ন আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি। প্রজা বিদ্রোহের দমনের দানবীয় চেহারা কি হতে পারে তার প্রত্যক্ষ সাক্ষী ভারতীয় ইতিহাস। অত্যাচারিত এইসব মানুষজন নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে ভিড় জমিয়েছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের অরণ্য সম্পদ

সংগ্রহের মতোই যেন অযাচিত ভাবেই ব্রিটিশদের সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের দিকে নজর পড়েছিল। তাই জঙ্গল হাসিলের হাত ধরে আবাদভূমির সম্প্রসারণ হয়েছিল। মানুষের স্রোত এসে জমায়েত হয়েছিল সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে। এতে যদিও বেশি পরিমাণ রাজস্ব আদায়ের প্রচেষ্টায় ছিল ব্রিটিশ সরকার। ১৭৯৩ এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও কিন্তু আস্তে আস্তে করে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে ধরেছিল। সেইমতো নতুন নতুন নীতির দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় রত হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। অরণ্যের ওপর হস্তক্ষেপ করাটা ব্রিটিশ সরকার অরণ্য আইন তৈরি করেই কার্যসিদ্ধি করেছিল। প্রাক-ঔপনিবেশিক সময়কালে যতই জাতি এবং শ্রেণী এর মধ্যে একটা পৃথকীকরণ থাকুক না কেন, সেখানে সবকিছুর মধ্যে একটা বিধিসম্মত সুসামঞ্জস্য ছিল। কৃষি, শিল্প, রাজ্য-কৃষক, এদের মধ্যে একটা পারস্পারিক সম্পর্ক ও সংযোগ ছিল। যেটা এখন বিরোধের পর্যায়ে দাঁড়িয়েছে। এটার পরিবর্তন এলো সপ্তদশ শতকে। যখন ইউরোপ জুড়ে নেমে এসেছিল শিল্প বিপ্লবের জোয়ার। ভারত যুক্ত হচ্ছে তখনই যখন ইউরোপে শিল্পবিপ্লব হবে হবে করছে। শিল্পের জন্য দরকার প্রচুর পরিমাণে সম্পদ, এবং দরকার একটা বাজার। যে কারণেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকার ব্যবসা-বাণিজ্যের ওপর বেশি পরিমাণে মনোনিবেশ করলো, তার থেকেই শুরু হল সাম্রাজ্যবাদ। এই ঔপনিবেশিকতাটাই ভারতীয় বাস্তুতন্ত্রের একটা বিশাল ধ্বংসের জায়গা তৈরি করেছে। ১৮৬৪ সালে তৈরি করা হচ্ছে ইমপেরিয়াল ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট। কারণ অবশ্য বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে আরও বেশি বন্য সম্পদ আহরণ করা, আসলে বন ধ্বংস করা। যাতে বনদপ্তর ঠিক ভাবে চলতে পারে সেকারণেই আইন বলবৎ করা হল। ভারতীয় অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের ওপর ব্রিটিশ শক্তির একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য খুবই দ্রুততার সাথে ১৮৬৫ এর অরণ্য আইন তৈরি করা হয়েছিল। আইনত রাষ্ট্রের একটা নিয়ন্ত্রণ রয়েছে অরণ্যের ওপর। কিন্তু সেই আইনকে

আরও জোরালো ও আরও কঠিন করতে নিজেদের মধ্য থেকে দাবি উঠতে থাকে। এই দাবির জোরালো সমর্থনে নিম্নোক্ত তিনটি দল তৈরি হয়[৭২]। ১। অ্যানেক্সস্‌নিস্ট, এদের বক্তব্য যে ভারতের প্রতিটি অরণ্যের ওপর রাষ্ট্রের পুরো অধিকার থাকবে। ২। প্রাগ্‌মাটিক, এদের বক্তব্য যদিও আত্মকেন্দ্রিক, কিন্তু একটা ভারসাম্যের কথা বলে। এদের মতে ভারতীয় অরণ্যের বাস্তুতন্ত্রের যে জায়গাগুলো স্পর্শকাতর অর্থাৎ কিনা যাদের জীবন বনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সেই আদিবাসী মানুষ এবং ভৌগোলিক ভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই সব এলাকার উপর নিয়ন্ত্রণের কথা এরা বলেছেন। অর্থাৎ ব্রিটিশদের কাছে যেগুলি মূল্যবান সেগুলো রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করবে। বাকী যে অংশ গুলো থাকবে, সেগুলোতে গোষ্ঠীর মধ্যে অংশীদারিত্ব করার অধিকার দেওয়া হবে। ৩। পপুলিস্ট, এদের মতে রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না জঙ্গলের ওপর। যেহেতু কৃষক ও আদিবাসীরা অরণ্যের মূল সম্পদ তাই তাদের হাতেই থাকবে অরণ্যের অধিকার।

১৮৬৫-র অরণ্য আইন তৈরি হয়েছিল, মূলত ব্রিটিশ শক্তির সুবিধার্থে। কারণ ইউরোপের শিল্প বিপ্লবের হাতে পড়ে নিজেদের কারখানা গুলিতে বেশি করে সম্পদের যোগান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া রেলপথের বিস্তার সেই সম্পদ আরও কাছাকাছি আনতে সহায়তা দান করবে। রেলপথের সম্প্রসারনের জন্য দরকার স্লিপার, যেগুলো আসতো অরণ্য নিধনের কাজ করে। অরণ্যজীবী মানুষদের অধিকার ধ্বংস করতে এবং ব্রিটিশ শক্তির একাধিপত্যের বিস্তারের জন্যই এই আইন তৈরি করে ছিলেন ঔপনিবেশিক সরকার। “The 1865 act was passed to facilitate the acquisition of those forest areas that were earmarked for railway supplies”[৭৩] এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ১৮৬৫ এর অরণ্য আইন তৈরির পশ্চাতে রেলের একটা বড় ভূমিকা ছিল। কেননা রেলের স্লিপারের জন্য প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে

কাঠের, যেগুলি আসতো অরণ্যের শাল, সেগুন, দেওদার ইত্যাদি গাছের থেকে। এবিষয়ে ঐতিহাসিক ইরফান হাবিব তাঁর 'Man and Environment' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- "Railways created and increasing, apparently insataible, demand for wood of all shorts nearly 1,100 wooden sleepers were required for each kilometre of track, needing some 250 trees to be felled on the average. Even sleepers of good Sal timber could not last for over eight or ten years, so that after each decade or so an equal amount of timeber would be needed again. Since 13,639 kilometers of railway track had been laid by 1879, one can imagine that for the initial track-laying along 3.4 million trees must have been cut."[৭৪] রেলের এই স্লিপার নির্মাণের জন্য সুন্দরবনের দিকেও ঔপনিবেশিক সরকারের নজর পড়েছিল। "১৮৭০ সালে রেলপথের স্লিপারের জন্য বিকল্প হিসাবে সুন্দরবনের সুন্দরী গাছের কাঠ ব্যবহার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়েছিল। সুন্দরী গাছের বেড় যেহেতু ৩ ফুটের বেশি হয় না, তাই স্লিপার হিসাবে ব্যবহারের পক্ষে সম্ভবত এই গাছ উপযুক্ত বিবেচিত হয়নি।"[৭৫] "কিন্তু রেলইঞ্জিনের জ্বালানি হিসাবে সুন্দরবনের জ্বালানি কাঠের গাছগুলি যে ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হয়েছিল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।"[৭৬] এবিষয়ে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে অধিকাংশ ইউরোপীয়দের কাছে ভারতীয় অরণ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল না। কেননা তারা এদেশের জঙ্গলকে মনে করত মারাত্মক গ্রীষ্মমন্ডলীয় ব্যাধিসমূহের আঁতুড়ঘর, ভয়ংকর ডাকাত ও হিংস্র জন্তুদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল।[৭৭] সেকারণে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সুন্দরবন সম্পর্কে তাদের একইরকম ধারণাই ছিল। ফলে এই সমস্ত অরণ্যের ধ্বংস কামনা করত ঔপনিবেশিক সরকার। ১৮৫৩ সালে

বাংলার গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসি সুন্দরবনকে বর্ণনা করেন—“বঙ্গোপসাগর ও ব-দ্বীপের জনবসতিগুলির মধ্যবর্তী সুন্দরবন ম্যালেরিয়া বীজাণুর অক্ষয় সঞ্চয়ভাণ্ডার যা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর দ্বারা বাহিত হয়ে সমগ্র দেশে ব্যধি ও মৃত্যু ছড়িয়ে দেয়; এই স্থান বাঘ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর অবাধ বিচরণক্ষেত্র এবং এদের আক্রমণে বহু জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস হয়; পাচারকারী ও জলদস্যুরা এখানে সুবিধাজনকভাবে আশ্রয় পায় এবং এর সমুদ্র বরাবর উপকূলে ডুবে যাওয়া জাহাজের নাবিকরা ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ও নিরাশ্রয় হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।”[৭৮]

১৮৭৮ এর অরণ্য আইন চালু হয়ে ছিল ১৮৬৫ এর আইন চালু হবার ১৩ বছর পর। যদিও অনেক বাধা-প্রতিবন্ধকতার পর এই আইন কার্যকরী করা হয়েছিল। এই আইনের মাধ্যমে পরিত্যক্ত এলাকা কঠোরভাবে রাষ্ট্রের আওতায় চলে আসে। ১৮৭৮ এর এই অরণ্য আইনের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল। আইনটি তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে অরণ্যের স্বার্থে আঘাত সৃষ্টি করেছিল। আইনের তিনটি বিভাগ হল- প্রোটেক্টেড ফরেস্ট, রিজার্ভড ফরেস্ট, ভিলেজ ফরেস্ট। অরণ্যকে উপরিলিখিত তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করার পেছনে ব্রিটিশদের উদ্দেশ্য ছিল রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করা। মূলত ১৮৭৮ এর অরণ্য আইন কার্যকরী করার উদ্দেশ্যই ছিল অরণ্যচারী মানুষদেরকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাছাড়া উপনিবেশিক শাসনকে আরও বেশি মজবুত করেছিল এই আইন। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ আরও জোরদার করতেই এই আইন তৈরি করা হয়েছিল। প্রোটেক্টেড ফরেস্টের ওপর স্থানীয় জনগণের কোন অধিকারকে স্বীকার করা হয়নি। অন্যান্য অঞ্চলের ওপর যদিও বা অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তবে তা যে কোন সময় কেড়ে নেওয়া হত। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব যাতে আরও জোরালো ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তারই কারণে ১৯২৭ সালে ভারতীয় অরণ্য আইন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে। অরণ্যচারী মানুষদের সাথে বনের যে সম্পর্ক ১৯২৭ এর অরণ্য

আইন সেই সম্পর্ক নিঃশেষ করতে সচেস্ট হয়। ১৯২৭ এর এই অরণ্য আইন যে সংশোধনী আনল তাতে দেখা গেল, অরণ্যের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ যেমন বাড়ল, জঙ্গলের ওপর আদিবাসীদের কর্তৃত্ব ততই হ্রাস পেল।[৭৯] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ঔপনিবেশিক সরকার ভারতীয় অরণ্যের ব্যবহার্য উৎপাদনগুলির সংরক্ষণ এবং ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে যে পরিমাণ উৎসাহ দেখিয়েছিল, অরণ্যগুলির বন্যপ্রাণীর সুরক্ষার দিকে তাদের কোন দায়বদ্ধতা ছিল না। স্বাধীনোত্তরকালেও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে এদেশে সচেতনতা অনেক পরে তৈরি হয়েছিল। ১৯৬৯ সাল নাগাদ IUCN অর্থাৎ আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ সংগঠন ভারতের বন্যপ্রাণীগুলি সম্পর্কে ভারত সরকারকে সতর্ক করে।[৮০] পরে ১৯৭০ এর দশকে ভারত সরকার এই বিষয়ে সমীক্ষা ও অনুসন্ধান শুরু করেছিল।

আসলে অরণ্য আইন গুলো বিশ্লেষণ করলে এটা বোঝা যায় যে, রাজস্ব আদায়ের জন্য ব্রিটিশরা জমিদারদের উৎসাহিত করছে, অরণ্য সংস্কার করে কৃষি জমির পরিমাণ বাড়িয়ে তোলার। তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আমরা ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন আন্দোলন গুলোর দিকে তাকালে বুঝতে পারি। ঔপনিবেশিক সময়কালে অরণ্যকেন্দ্রিক যে নীতি গুলি আইনে পরিণতি লাভ করেছিল তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের শিল্পায়ন ও বাণিজ্যিক সফলতা অর্জন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর বনকেন্দ্রিক যে সমস্ত পলিসি বা আইন তৈরি হয়েছিল তাতে ভারতীয় স্বার্থ বজায় ছিল বলে মনে হয়। কারণ পরিবেশ বাঁচাতে হলে দরকার বনকে স্বাভাবিক রাখা, যে কারণে পরিবেশের সুস্থ স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখতে আন্তর্জাতিক স্তরে ১৯৭২ সালে সুইডেন-এর স্টকহোম-এ বসে প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ সম্মেলন। এই সম্মেলনের মূল বক্তব্য হল— "Man has the fundamental right to freedom, equality

and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment and present and future generations."[৮১]

১৯৭২ সালের ১৬ই জুন রাষ্ট্রসংঘের মানব পরিবেশ-সংক্রান্ত এই সম্মেলনে মানব পরিবেশ প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত যে ২৬টি নীতি সম্বলিত ঘোষণাপত্র গৃহীত হয়েছিল, সেগুলি হল—

১। স্বাধীনতা, সমতা ও উপযুক্ত জীবনযাপনের অবস্থা, অর্থাৎ ভালোভাবে ও সম্মানের সাথে জীবনযাপনের পরিবেশ প্রত্যেকটি মানুষের মৌলিক অধিকার এবং তার দায়িত্ব বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের জন্য এই পরিবেশকে রক্ষা ও উন্নত করা। এই প্রসঙ্গে বর্ণবৈষম্যের সমর্থন ও ক্রমব্যবহার, জাতিগত বিচ্ছিন্নকরণ, বৈষম্য, ঔপনিবেশিক ও অন্যান্য ধরণের নিপীড়ন এবং বিদেশী কর্তৃত্বের নীতিগুলিকে নিন্দা করা হচ্ছে।

২। বর্তমান ও আগামী প্রজন্মের স্বার্থে হাওয়া, জল, স্থলভাগ, উদ্ভিদ ও প্রাণী সমেত পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদ এবং বিশেষত প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের নিদর্শনস্বরূপ নমুনাগুলিকে যথোপযুক্ত সাবধানতাসহ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রক্ষা করতে হবে।

৩। জরুরী পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদসমূহ উৎপাদনে পৃথিবীর ক্ষমতাকে স্থিতাবস্থায় রাখতে হবে এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তা পুনরুদ্ধার বা উন্নত করতে হবে।

৪। বন্যপ্রাণী এবং তাদের বাসস্থলের যে পরম্পরা বিভিন্ন ক্ষতিকারক ঘটনার সমন্বয়ে আজ বিপদগ্রস্ত তাকে রক্ষা করার ও বিচক্ষণতার সঙ্গে নিয়ন্ত্রিত করার বিশেষ দায়িত্ব মানুষের রয়েছে।

৫। ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হবার বিপদ থেকে বাঁচিয়ে পৃথিবীর অ-পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদগুলিকে ব্যবহার করতে হবে এবং এই ব্যবহারের সুফল যাতে সমগ্র মানবজাতিই ভোগ করতে পারে তাও নিশ্চিত করতে হবে। সেজন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাতে বন্যপ্রাণী সমেত প্রকৃতি-সংরক্ষণ বিশেষ ভাবে গুরুত্ব পাবে।

৬। বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক অথবা অপরিবর্তনীয় ক্ষতিরোধ নিশ্চিত করার জন্য এমন গাঢ়ত্বের বিষাক্ত বা অন্যান্য পদার্থের নিঃসরণ বা তাপ বর্জন বন্ধ করতে হবে, যা পরিবেশের দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা যায় না। দূষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণের ন্যায়-সংগ্রামকে সমর্থন করতে হবে।

৭। বিভিন্ন পদার্থ দ্বারা সমুদ্রের দূষণ যা মানব স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপদজ্জনক, সামুদ্রিক অন্যান্য জীব সম্পদের পক্ষে ক্ষতিকারক এবং সমুদ্রের অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারের বিরুদ্ধে বাধাস্বরূপ। সেগুলি বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসমূহ সমস্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৮। জীবনযাপন ও কর্মক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করবার জন্য এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উপযোগী অবস্থা পৃথিবীতে গড়ে তোলার জন্য প্রধান প্রয়োজন হল অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন।

৯। অনুন্নত অবস্থা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত দুর্বলতা গভীর সমস্যা তৈরি করেছে এবং এর সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় হল উন্নয়নশীল দেশগুলির নিজস্ব প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসেবে যথেষ্ট অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত সাহায্য হস্তান্তরের মাধ্যমে দ্রুত উন্নয়ন এবং প্রয়োজনে সময়মতো সাহায্য প্রদান।

১০। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশগত পরিচালন ব্যবস্থার জন্য প্রধান প্রয়োজন মূল্যমানের স্থায়িত্ব এবং প্রাথমিক উপাদান ও কাঁচামালের থেকে পর্যাপ্ত আয়, কারণ অর্থনৈতিক ব্যাপার ও বাস্তুতান্ত্রিক প্রক্রিয়া দুটোকেই হিসেবের মধ্যে রাখতে হবে।

১১। সমস্ত দেশগুলির পরিবেশ নীতি উন্নয়নশীল দেশগুলির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নকেই ত্বরান্বিত করবে, সবার জন্য উন্নত জীবনযাত্রার মান অর্জনেও বাধা সৃষ্টি করবে না। পরিবেশগত ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সমস্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলো যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে।

১২। উন্নয়নশীল দেশগুলির অবস্থা ও বিশেষ প্রয়োজন বিবেচনা করে ও তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিবেশ রক্ষাকারী ব্যবস্থার প্রয়োগের ব্যয়ভারের জন্য এবং পরিবেশ রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সম্পদের সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে। তাদের অনুরোধ অনুসারে বাড়তি আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

১৩। সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার ও পরিবেশের উন্নয়নকে ফলপ্রসূ করতে হলে দেশগুলিকে তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনসাধারণের স্বার্থে মানব পরিবেশ রক্ষা ও উন্নতির সহায়ক একটি সুসংহত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে।

১৪। উন্নয়ন এবং পরিবেশ রক্ষার যে কোনো বিরোধ সমাধানের মূল সহায়ক হচ্ছে যুক্তি সম্মত পরিকল্পনা।

১৫। পরিবেশকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে এবং সবার জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সর্বাধিক সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে মানব বসতি ও জাতিগত প্রভুত্বের জন্য সৃষ্ট প্রকল্পগুলিকে বাতিল করতে হবে।

১৬। জনসংখ্যা নীতি রূপায়ন ও প্রয়োগের ফলে মৌল মানবাধিকার যাতে ক্ষুন্ন না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সমস্ত অঞ্চলের পরিবেশের উপর ঘন জনবসতির বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে, সরকারের উচিত সেইসব অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৭। পরিবেশের মনোন্নয়নের জন্য দেশের পরিবেশ সম্পদের পরিকল্পনা, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব উপযুক্ত জাতীয় প্রতিষ্ঠানের ওপর ন্যস্ত করতে হবে।

১৮। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যে অবদান রয়েছে তাকে মানবজাতির কল্যাণ এবং পরিবেশগত সমস্যার সমাধানে ও পরিবেশগত বিপদগুলির চিহ্নিতকরণ, তার পরিহার ও নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়োগ করতে হবে।

১৯। মানবিক প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন সম্পর্কে জনমত গঠনের জন্য তরুণ প্রজন্ম এবং বয়স্কদের জন্য পরিবেশ সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করা।

২০। সব দেশে বিশেষত উন্নয়নশীল দেশগুলিতে পরিবেশ সম্পর্কিত জাতীয় ও বহুজাতিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উন্নতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে পরিবেশ সমস্যার সমাধানকল্পে আধুনিক বৈজ্ঞানিক তথ্যের আদান-প্রাদান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে সহায়তা করতে হবে; উন্নয়নশীল দেশগুলির পরিবেশ সম্পর্কিত প্রযুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে যা উন্নয়নশীল দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক বোঝা না চাপিয়ে ব্যাপকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

২১। পরিবেশ নীতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো নিজেদের এক্তিয়ার অতিক্রম করবে না এবং একটি রাষ্ট্রের কার্যকলাপ অন্য রাষ্ট্রের জাতীয় এক্তিয়ারের উপর হস্তক্ষেপ করবে না। সম্মিলিত

জাতিপুঞ্জের সনদ এবং আন্তর্জাতিক আইনের নীতি অনুযায়ী প্রতিটি রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে নিজেদের সম্পদকে পরিবেশ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সঠিক ব্যবহার করবার।

২২। রাষ্ট্রের এক্তিয়ারভুক্ত ও নিয়ন্ত্রণাধীন কার্যাবলীর ফলে যদি রাস্ত্রসীমা-বহির্ভূত অঞ্চলে কোনো পরিবেশজনিত ক্ষতি হয় সেক্ষেত্রে ঐ রাষ্ট্রকে দায়ভার গ্রহণ করতে হবে এবং দূষণ-আক্রান্তদের ক্ষতিপূরণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইনকে আরও পূর্ণায়ত করতে রাষ্ট্রগুলিকে সহযোগিতা করতে হবে।

২৩। আন্তর্জাতিক সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত মানের প্রতি অশ্রদ্ধা না জানিয়েও একথা বলা যেতে পারে যে, প্রতিটি দেশের পরিবেশ-নীতির মান নির্ধারণের সময় সেই দেশের বিদ্যমান মূল্যবোধকে বিবেচনা করে দেখতে হবে।

২৪। ছোট বড় সমস্ত দেশগুলির সমান গুরুত্ব ও সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে পরিবেশ রক্ষা ও উন্নতি-সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলি কার্যকর করবে। বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ফলে উদ্ভূত পরিবেশ দূষণের বিরূপ প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ হ্রাস ও দূরীকরণের জন্য দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক সমঝোতা বা উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ আবশ্যক। অবশ্যই সেক্ষেত্রে সব রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বা স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখতে হবে।

২৫। পরিবেশের রক্ষা ও উন্নতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি যাতে সমন্বয়মূলক, দক্ষ ও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে রাষ্ট্রও তা সুনিশ্চিত করবে।

২৬। পারমাণবিক অস্ত্র ও অন্যান্য গণ-বিধ্বংসীকর প্রভাব থেকে মানুষ ও তার পরিবেশকে মুক্ত রাখতে হবে। এধরনের অস্ত্রাদির ধ্বংস ও বিলোপের জন্য রাষ্ট্রগুলি উপযুক্ত আন্তর্জাতিক মঞ্চে দ্রুত সমঝোতায় আসতে চেষ্টা করবে।[৮২]

আসলে পরিবেশ বিষয়ে এই সম্মেলনের নীতিগুলির মূল উপজীব্যই হল— "সমস্ত বিশ্বব্যাপী মানুষকে দিয়ে এমন ভাবে কাজ করতে হবে যাতে পরিবেশ বিনষ্ট না হয়। পরিবেশের স্বার্থে প্রত্যেক নাগরিক, গোষ্ঠী, সরকার, প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উদ্যোগ প্রভৃতি সকলকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। এই সম্মেলনের মাধ্যমে সকল সরকার ও জনগণকে মানবীয় পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে কাজ করতে আহ্বান জানানো হয়েছিল, মানুষ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বার্থে।"[৮৩] এই সম্মেলন থেকে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণে ভারতীয় পরিবেশ তথা অরণ্য আইনের উপর একটা ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পরিলক্ষিত হয়। ১৯৭২-এ স্টকহোমে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসংঘের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারতে প্রণয়ন করা হয় ১৯৮৬ সালের পরিবেশ সংরক্ষণ আইন। ভারতীয় প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই আইনটি কার্যকরী হয়। এই আইনের ৭ নং ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান পরিবেশের গুণমান নষ্ট করতে পারবে না।[৮৪] ১৯৭২ এর সম্মেলন থেকে ভারতে পরবর্তী সময়ে যে সব আইন তৈরি হল তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল বন কেটে, বা বন ধ্বংস করে নয় বন রেখে বনের মধ্যে হোক কৃষি। ফলত বন ধ্বংস নয় বনসৃজনই হবে বাস্তুতন্ত্রকে বাঁচানোর একমাত্র পন্থা। ১৯৭৬ সালে ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে পরিবেশ সংক্রান্ত অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে ৪৮ক ও ৫১ক ধারা আনয়নের মধ্য দিয়ে এর অন্তর্ভুক্তি সুনিশ্চিত করা হয়েছিল। ৪৮ক ধারায় বলা হয়— "Protection and improvement of Environment and safeguarding of Forests and Wildlife : The State shall

endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country."[৮৫] একইভাবে এই বন্যপ্রাণীদেরকে রক্ষার ব্যাপারে জনগণের সচেতনতার উপরেও গুরুত্ব প্রদান করে ৫১ক ধারায় বলা হয়েছিল– "It shall be the duty of every citizen of India.... to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassaion for living creatures."[৮৬]

সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ মানব সমাজের কাম্য। বিপন্ন পরিবেশে সমস্ত কিছুই ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ভারতীয় সংবিধান রাজ্য সরকারগুলিকে তাদের বনগুলোর পরিচালনা করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল।[৮৭] সেই সূত্র ধরেই ১৯৭২ সালের পর থেকে ভারতীয় সুন্দরবনকে সুরক্ষিত রাখতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হতে থাকে। ১৯৭৩ সালে গড়ে ওঠে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ, এছাড়া এই বছরেই গড়ে ওঠে সুন্দরবন ব্যাঘ্র সংরক্ষণ প্রকল্প। এরপর থেকে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের হাত ধরেই সুন্দরবনকে নতুন ভাবে গড়ে তোলার কাজও শুরু হয়েছিল। ১৯৭৬ সালে পাথরপ্রতিমার ভগবতপুরে গড়ে তোলা হয় সুন্দরবন কুমির প্রকল্প, তাছাড়া ঐ বছরেই সজনেখালী, লোথিয়ান ও হ্যালিডে দ্বীপকে সুন্দরনবন বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়।[৮৮] এরপর ১৯৮৪ সালের ৪ঠা মে সুন্দরবনকে জাতীয় উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৮৯ সালে সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর সুন্দরবন ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৮৯] ২০০১ সালে ইউনেস্কো সুন্দরবনের এই বনাঞ্চলকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক অফ বায়োস্ফিয়ার এর আওতায় নিয়ে আসে।[৯০] ২০১৩ সালে সুন্দরবনকে পশ্চিম সুন্দরবন অভয়ারণ্য বা West Sundarban Wildlife

Sanctuary হিসেবে ঘোষণা করা হয়।[৯১] সুন্দরবনের এই সব সুরক্ষা সত্ত্বেও (IUCN) রেড লিস্ট অফ ইকোসিস্টেম ফ্রেমওয়ার্কের অধীনে ২০২০ সালের মূল্যায়নে ভারতীয় সুন্দরবনকে বিপন্ন বলে মনে করা হয়েছিল।[৯২] এই বিপন্নতাকে নির্ভর করেই সুন্দরবনে বসবাসকারী মৎস্যজীবী মানুষেরা সেই সময় থেকে বর্তমান দিন পর্যন্ত সুন্দরবনের অরণ্য ও নদী-জলাশয়কে আশ্রয় করে তারা জীবিকা নির্বাহ করছে।

মৎস্যজীবীদের বিপন্নতা

১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটা তারতম্য লক্ষ্য করা যায়; আদমশুমারির তথ্যে ধারাবাহিক ভাবে সেই পরিসংখ্যান খুঁজে পাওয়া যায়। দেখা গেছে স্বাধীনতার পরবর্তী কালে ১৯৫১ সালের জনগণনার তথ্যে সুন্দরবনের জনসংখ্যা ছিল ১১,৫৯,৫৫৯ জন, বর্তমানে সুন্দরবনের জনসংখ্যা চারগুন বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৪৪,২৬,২৫৯ জন।[৯৩] স্বাভাবিক কারণেই সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে যেমন চাপ বেড়েছে তেমনই এখানকার জীবিকার উপরও জনসংখ্যার বিরূপ প্রভাব পড়েছে। সুন্দরবনের এই জনবিস্ফোরণ পেশাজীবী হিসেবে মৎস্য কেন্দ্রিক জীবিকায় তাদের জীবন অতিবাহিত করছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালীন সময়ে নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা সাবেকি মৎস্য নির্ভর জীবিকায় থাকলেও বর্তমানে তা সুন্দরবনের অনেক মানুষের পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৮৮-৮৯ সালে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীর সংখ্যা ছিল ২৫,৩০০ জন, ১৯৮৯-৯০ সালে হয় ২৫,৫৫০ এবং ১৯৯০-৯১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৬,৪০০ জন।[৯৪] পশ্চিমবঙ্গ সরকারের Hand Book of Fisheries Statistics এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালের নিরিখে দুই চব্বিশ পরগণার মোট মৎস্যজীবীর সংখ্যা ছিল ৮,৮২,৫২০ জন, ২০১৭-১৮ সালে তা বেড়ে হয় ৯,৯৭,৩২৬ জন।[৯৫] ২০২১ সালে কেবলমাত্র সুন্দরবনের মৎস্যজীবীর সংখ্যা হল ৪,১৭,৯৭০

জন।[৯৬] সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে ঘিরে মৎস্যজীবীদের এই সংখ্যা বৃদ্ধি মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক পরিবেশকে আরও বেশি করে বিপন্ন করে তুলেছে। স্বাধীনতার পূর্বে ঔপনিবেশিক সরকার বিহার, উড়িষ্যা ও সাঁওতাল পরগণা থেকে সুন্দরবনে আবাদ পত্তন ও লবণ শিল্পের কাজের জন্য কম মজুরিতে শ্রমিক নিয়ে আসেন।[৯৭] কালক্রমে সুন্দরবনের প্রতিকূল পরিবেশকে মানিয়ে নিয়ে এই নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা হয়ে উঠে ছিল সুন্দরবনের আদি বাসিন্দা। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে উদ্বাস্তু ও শরণার্থী হয়ে বর্তমান বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ এদেশে আসে, এবং বাসস্থানের জন্য সুন্দরবনের বিভিন্ন দ্বীপগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাদের কাছে প্রাথমিক পর্বে কৃষিকাজের পাশাপাশি মাছ সংগ্রহ হয়ে উঠেছিল প্রধান পেশা, যার ধারাবাহিকতা আজও রয়েছে। প্রথমে দাঁড় টানা ডিঙ্গি নৌকায় করে মৎস্যজীবীরা মাছ ধরত, তার জায়গায় যন্ত্রচালিত নৌকা, ট্রলার মাছ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়। মাছ ধরার সরঞ্জাম প্রস্তুত করে নদী-সমুদ্রে যেতে প্রচুর খরচ, গরিব মৎস্যজীবীদের কাছে তা খুবই ব্যয়বহুল ব্যাপার তাই তারা মহাজনদের শরণাপন্ন হয়। সাইদারি, মহাজনী শোষণ মৎস্যজীবীদেরকে একটা চক্রের মধ্যে আবদ্ধ করে রেখেছে। সুন্দরবনের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও মৎস্য চাষ ক্ষেত্র কমে যাওয়ার কারণে মৎস্যজীবীদের জীবিকার উপর চাপ বেড়ে চলেছে।

সুন্দরবনে ১৯৭০-এর দশক থেকে সুন্দরবনে বাগদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে হয়ে উঠেছিল এখানকার মীন সংগ্রাহকদের একটা অর্থনৈতিক পেশা। ক্যানিং, গোসাবা, বাসন্তী, সন্দেশখালি, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, সাগর প্রভৃতি এলাকার মানুষেরা রাতের অন্ধকার থেকে শুরু করে দিনের আলোর প্রতিটি ক্ষণে নদীর জল থেকে এই মীন সংগ্রহ করে ভেড়ি-ফিশারি প্রভৃতি স্থানে সরবরাহ করে সুন্দরবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রতিটি মানুষ দুবেলা অন্যের সংস্থান করতো।

কিন্তু বর্তমানে বনদপ্তর থেকে তা নিষেধ করায়, এই কাজে বাধা পড়েছে। কেননা যে জাল ব্যবহার করে মৎস্যজীবীরা এই মীন সংগ্রহ করে তাতে কেবলমাত্র বাগদার মীন নয়, অন্যান্য মাছের পোনাও উঠে আসে ফলের সুন্দরবনে মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। "ওই যে সব নাইলন জাল চালু হয়েছে এখন। চিংড়ির মীন– মানে বাগদা চিংড়ির পোনা– ধরে ওতে করে। জালের ফুটো গুলো এত ছোট যে তাতে মীনের সঙ্গে অন্য সব মাছের ডিম ও উঠে আসে।"[৯৮] এর ফলে একদিকে যেমন জলের জীবজ বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হচ্ছে, আবার নদীবাঁধ থেকে নদীর পাড়ের ম্যানগ্রোভ বৃক্ষ এই মীন সংগ্রাহকদের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে Society for Direct Initiative for Social and Health Action (DISHA) দেওয়া তথ্যে উল্লেখ করেছে "A survey conducted by the S. D. Marine Biological Research Institute of the district in 1994 revealed that for collecting 519 prawn seeds, at least 5103 gm of other seed varieties of different categories of fish are destroyed."[৯৯]

প্রতি বছর জুন থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত মাছ ধরার কাজ বন্ধ থাকলে মাছের উৎপাদন বাড়তে পারে কিন্তু এই তিন মাস তারা মৎস্য ধরতে না পারায় আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। তাছাড়া সরকারী ভাবে বনদপ্তরকে দেওয়া কঠোর বিধি নিষেধ মৎস্যজীবীদেরকে বিপাকে ফেলেছে। আগের মতো সহজে আর মীন সংগ্রহ করতে পারে না এই মানুষেরা। সুন্দরবনের এক শ্রেণীর মৎস্যজীবীরা গভীর সমুদ্রে যেতে পারে না। নদীর কোলে ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের ফল খেতে এসে প্রচুর মাছ এখানে আশ্রয় নেয়, সেই মাছ সংগ্রহের কাজ করে মৎস্যজীবীরা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। হরপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর "The Mystery of the Sundarbans" গ্রন্থে দেখিয়েছেন– "Fruits are an essential item of food for fish. During August-

October, tonnes of fruits fall on water from trees when the fishes concentrate near the bank to feed on them. Kan magur and Pangas fishes are very much fond of the fruits of the Keora and Bain."[১০০] তাছাড়া তিনি আরও দেখিয়েছেন যে "One Pangas fish weighing 12 kgs was found to have about 1 kg of Bain fruit in its stomach."[১০১] নদীর ভূমিক্ষয়ের কারণে সুন্দরবনের নদীর কোলের ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হয়ে যাওয়াতে একদিকে যেমন নদীগুলি দ্বীপের ভেতরে প্রবেশ করে মৎস্যজীবীদের আশ্রয়কে বিপন্ন করে তুলেছে অন্যদিকে নদীর মাছও সমুদ্রমুখী হচ্ছে, যা কিনা মৎস্যজীবীদের কাছে অর্থনৈতিক বিপন্নতা। সুন্দরবনের নদী-নালা গুলিতে মাছের সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণগুলোর মধ্যে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি যেমন গুরুত্বপূর্ণ একইভাবে নদীর জলের দূষণের মাত্রা বৃদ্ধিও সমান ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আগে পাল-দাঁড় দিয়ে মাছ ধরার কাজ হলেও বর্তমানে যান্ত্রিক নৌকার মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে যার কারণে নৌকার তেল গিয়ে সরাসরি ভাবে নদীর জলে মেশে। তাছাড়া শহর কারখানার নোংরা বর্জ্য নদী বাহিত হয়ে সুন্দরবনে গিয়ে পড়ে। বিদ্যাধরী নদী দিয়ে কলকাতার ময়লা জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গৃহীত হয় উনিশ শতকের প্রারম্ভে। এই ময়লা জলের সঙ্গে লেপটে থাকা জেলি জাতীয় কঠিন পদার্থ ক্রমশ জমতে থাকে নদীর বুকে। ১৮৭৫ সালে শহরের ময়লা জলের পরিমাণ ছিল দৈনিক ১৫,০০০,০০০ গ্যালন। ১৯৪৩ সালে সেই ময়লা জলের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় গড়ে দৈনিক ১৪৩,০০০,০০০ গ্যালন। সেই অপরিশোধিত দূষিত জল ধারণ করতে-করতে বিদ্যাধরী নীলকণ্ঠ হয়ে যায়।[১০২] এই দূষণের কবলে কেমলমাত্র বিদ্যাধরী নদী একাই নয়, সুন্দরবনের প্রতিটি নদীতে ধীরে ধীরে দূষণের পরিমাণ বাড়ছে। বর্জ্য মিশ্রিত জল বিদ্যাধরী থেকে ঝিল্লা হয়ে বয়ে যায় কালিন্দী-রায়মঙ্গল-হাড়িভাঙা নদীতে। কলকাতা

থেকে বর্জ্য নিয়ে আসা খালগুলোতে শুধুমাত্র জনজীবন এলাকার নোংরা থাকে না, থাকে পূর্ব কলকাতার কলকারখানার উপজাত ধাতব-বর্জ্য পদার্থ। ধাতু মিশ্রিত এই বর্জ্য পদার্থ উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহে ঢোকে তারপর জৈব বিবর্ধন প্রক্রিয়ায় ক্ষতিসাধন করে। তাছাড়া বাসন্তী, গোসাবা, রামগঙ্গা, ক্যানিং, পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, রায়দীঘি প্রভৃতি এলাকা থেকে নালার বর্জ্য পদার্থ নদীর জলে গিয়ে মেশে। ফলে নদীর জল দূষিত হয়।[১০৩] স্বাভাবিক ভাবেই এই দূষণ প্রক্রিয়া নদীর মাছেদের জীবন চক্রে পরিবর্তন এনেছে। মাছের উৎপাদন ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। নদীর রূপালি শস্য নামে পরিচিত ইলিশ। ১৯৮০, ১৯৯০ এর দশকে সুন্দরবনের কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, বকখালি, ফ্রেজারগঞ্জ, পাথরপ্রতিমা প্রভৃতি এলাকার মৎস্যজীবীরা প্রচুর পরিমাণ ইলিশ নদী-সমুদ্রের থেকে সংগ্রহ করতো, অর্থনৈতিক গুণসম্পন্ন হওয়ায় মৎস্যজীবীদের কাছে এর গুরুত্ব অনেক বেশি, কিন্তু বর্তমানে সেই এই মৎস্যের পরিমাণ কমে গেছে। মৎস্যজীবীদের দ্বারা নানা জাতের পর্যাপ্ত ইলিশ উত্তোলনের কারণে সরকারিভাবে আইন করে কেবলমাত্র বড় মাছ ধরার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। Indian Fisheries Act of 1897, Bengal Act of 1882, and Indian Forest Act 1927 আইন গুলো মাছ, মৎস্যজীবী ও জাতির স্বার্থে প্রণয়ন করা হয়েছিল। ১৯৮৪ সালের The West Bengal Inland Fisheries Act এর দ্বারা বর্তমানে মাছ সংরক্ষণ ও বংশ বিস্তারে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই আইনে ৫০০ গ্রাম ওজনের ছোট ইলিশ ধরা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।[১০৪] একদিকে এই আইনে বাধা পড়ে রয়েছে মৎস্যজীবীরা, অন্য দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের রপ্তানিমুখী ও অবাধনীতির জন্য লাইসেন্স প্রাপ্ত বিদেশী ট্রলারগুলো অবাধে যথেচ্ছভাবে সমুদ্রের মাছ লুট করে চলেছে এবং চারা মাছ নষ্ট করছে, যার প্রভাব এসে পড়েছে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের উপরে। ১৯৪৭ সালের পর থেকে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষেরা

এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতো, মাছ-কাঁকড়া, বনের কাঠ, ও মধু সংগ্রহে বাধা-নিষেধ বিশেষ ছিল না। ১৯৬৯ সালের পূর্ব পর্যন্ত জেলেরা খাঁড়ি-নদী-মোহনা-সাগরে মাছ-কাঁকড়া ধরত, কিন্তু ১৯৬৯ সালের পর থেকে পরিবেশ সুরক্ষার উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এই ব্যাপার আইনের মোড়কে আচ্ছাদিত হয়ে গেল। বাস্তুতন্ত্র রক্ষায় প্রাণী সংরক্ষণ—১৯৬৯, ব্যাঘ্র সংরক্ষণ—১৯৭৩, জল (দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ)—১৯৭৪, কুমীর সংরক্ষণ, অভয় অরণ্য—১৯৭৬, অরণ্য সংরক্ষণ—১৯৮০, বায়ু (দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ)—১৯৮১, জাতীয় উদ্যান—১৯৮৪, ওয়ার্ল্ড ন্যাচারাল হেরিটেজ—১৯৮৭, জীব-পরিমণ্ডল, বর্জ্য সংরক্ষণ—১৯৮৯, ইকো-ট্যুরিজম—২০০৬ প্রভৃতি আইনে সুন্দরবন প্রকৃতির প্রশাসন থেকে মুক্ত হয়ে মনুষ্য প্রশাসনে যুক্ত হল।[১০৫] সুন্দরবনের এই সব নিয়মে মৎস্যজীবীরা অরণ্যের সংরক্ষিত এলাকা থেকে অবাধে আর মাছ-কাঁকড়া, মধু-কাঠ সংগ্রহ করতে পারে না। এই কারণে সুন্দরবনের কোর এলাকায় লুকিয়ে মাছ ধরতে গিয়ে অধিকাংশ সময়ে বাঘ-কুমিরের খাদ্যে পরিণত হতে হয় মৎস্যজীবীদেরকে। ২০২১ সালে জুলাই মাসে ঝিলা তিন নম্বর জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়ে গোসাবার চরঘেরির বিধান কলোনির বাসিন্দা ৫৪ বছর বয়স্ক ধরণী মণ্ডল বাঘের আক্রমণে নিহত হন।[১০৬] ২০১১ সালের South Twenty Four Parganas, District Census Handbook থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ১৯৮৫ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত ৭৫ জন মধু সংগ্রহকারী সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছে।[১০৭] মাছ-কাঁকড়া শিকারের উপর নিয়ন্ত্রণের জন্য বনদপ্তর ১৯৮০ সাল থেকে নৌকার মালিকদের জন্য বোর্ট লাইসেন্স সার্টিফিকেট বা বি এল সি চালু করেছিল, পরিবেশ রক্ষার জন্য ১৯৮০ সালে ৪৭১৬টি বি এল সি ইস্যু হয়েছিল, পরে আর কোন বি এল সি সরকার থেকে ইস্যু করা হয়নি। সেই কারণে মাছ-কাঁকড়া শিকারীরা আড়তদারের কাছ থেকে ৩০,০০০ থেকে

৩৩,০০০ টাকার বিনিময়ে বি এল সি ভাড়ায় নিত। মৎস্যজীবীরা এক একটা ট্রিপে সমস্ত খরচ বাবদ ২০০০-৩০০০ টাকা আয় করতো। বেশি আয়ের জন্য মৎস্যজীবীরা কোর এলাকায় প্রবেশ করতো, ধরা পড়লে বনদপ্তর তাদের কাছ থেকে ৫০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা নিত।[১০৮] ফলত আইনের জালে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীরা নানা ভাবে বিপন্নতার শিকার হচ্ছে। সুন্দরবনে বাঘ-কুমির ও মানুষের খাদ্য-খাদক সম্পর্কের বাইরে আর এক খাদক হল সুন্দরবনের জলদস্যু, যাদের ভয়ে মৎস্যজীবীরা সর্বদাই তটস্থ থাকে। অতর্কিত আক্রমণ করে এই জলদস্যু মৎস্যজীবীদের সর্বস্ব লুট করে তাদের সর্বস্বান্ত করে দেয়। মাতলা, ঠাকুরান, বিদ্যাধরী, হাড়িভাঙার মোহনায় আর বাংলাদেশের সীমানায় বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি জলদস্যুরা লুটপাট করে মৎস্যজীবীদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন করে তোলে।[১০৯]

সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অংশ হিসাবে মানব সম্পদ উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে বেঁচে থাকার জন্য। নানান কাজের মধ্যেও এরা নানান পেশাকে জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছে। অনেকেই নদীর মাছ ধরে জীবন কাটায়, আবার অনেকেই মীন ধরে। এতে কি হয় নদী-সমুদ্রের মৎস্য সম্পদ যেগুলি প্রয়োজন, বাকিরা নষ্ট হয়। ছোট ছোট মীন মাছ নষ্ট হচ্ছে। এর ফলে মাছের বংশবৃদ্ধির হ্রাসজনিত সমস্যা দেখা দিচ্ছে। ছোট মাছের মীনের সন্ধানে গিয়ে সুন্দরবনের মানুষ নদীর পাড়ের ছোট ছোট ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের ক্ষতি করছে। নদী বাঁধের ক্ষতি করছে। সব মিলিয়ে মানুষের সচেতনতার অভাবে বিলুপ্ত হচ্ছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ। সুন্দরবনকে বাঁচানো বা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার চিন্তা ভাবনা যে আমার মতো গবেষক করছে তাও কিন্তু নয়। বিশ্বের দরবারেও এসবের একটা সমীক্ষা, একটা বাতাবরন তৈরির চেষ্টা চলছে। ধরিত্রীর বুকে যে বাস্তুতন্ত্র রচিত হয়েছে এবং সেখানেও যে বিভিন্ন প্রজাতির

প্রাণীও উদ্ভিদের বিলুপ্তি হচ্ছে না তাও কিন্তু নয়। জাতিসঙ্ঘের রোমভিত্তিক খাদ্যসংস্থা এফ. এ. ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁরা বলেছেন প্রতিটি সপ্তাহে কমপক্ষে দুটি প্রজাতির পশু-প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া তাদের রিপোর্টে বলছেন এইভাবে ১৩৫০ টি প্রাণী আজ বিলুপ্তির পথে। তাঁদের মতে সাধারণত যেগুলি খামারে পালিত হয়, অর্থাৎ কিনা খামার প্রাণী। জাতিসংঘের এই সংস্থার মতে বিগত ২৫ বছরে ৩০০ প্রজাতির পশু-প্রাণী হারিয়ে গেছে পৃথিবী থেকে। কেবলমাত্র খামার প্রাণী নয় বিলুপ্তির পথে পা রেখেছে বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদও। তাঁদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে মানুষ ১০ হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণা করতো, কাজ করতো, সেই সংখ্যাটা আজ ১১২০ তে এসে দাঁড়িয়েছে। এদের পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসাটা খুবই মুশকিল। নানান গবেষণা ও কৃত্রিম প্রজনের প্রচেষ্টার দিকেই আমাদের নজর রাখতে হবে, যদি কিছু মিরাক্কেল ঘটে। সুন্দরবন ব-দ্বীপ এলাকা। প্রতিটি বদ্বীপ একে অন্যের সঙ্গে নদীর দ্বারা সংযুক্ত। কোথাও সরু নদী আবার কোথাও চওড়া। এই ভাবে সজ্জিত সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের ব-দ্বীপ সমূহ। সুন্দরবনবাসী তাদের জীবনধারণের জন্য মৎস্য সম্পদ সংগ্রহকে অধিক কার্যকরী ও ইতিবাচক দিক বলেই মান্যতা দেয়। সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রে নদী-খাঁড়ি বা নদী মোহনায়, সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় অর্থের উপার্জনের কারণে বিভিন্ন প্রকার মাছ ধরার জাল ব্যবহার করে। সেখানে নদী-সমুদ্রের বিভিন্ন প্রকার, বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ধরা পড়ে। বেন্টি জাল, খ্যাপলা জাল, ইলিশ ধরা জাল, কলসি জাল, আটন জাল ইত্যাদি ব্যবহার করে মৎস্য তুলে আনে নদীর গভীর থেকে। এতে বেশ কিছু প্রজাতির মাছ বিলুপ্ত হয়েছে। মৎস্যজীবীদের মতে বিশ্বে ৩০ হাজার প্রজাতির মধ্যে ২০ হাজারের ১১ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে। পরিবেশ মন্ত্রক ৫০ প্রজাতির মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এছাড়াও পাবদা, ভেদা, চিতল, খয়রা, শোল, বোয়াল, শিঙ্গি,

মৌরলা, পাঁকাল, কই ইত্যাদি প্রায় ৪০ প্রজাতির নোনা মিঠে মাছ আজ লুপ্ত প্রায়। বিকল্প কিছুর ব্যবস্থা না থাকলেও এর সমাধান সম্ভব নয়। বাগদার মীন বাঁচানোর যে চেষ্টা তা কার্যকরী হচ্ছে না। ‘‘ওই যে সব নাইলন জাল চালু হয়েছে এখন। চিংড়ির মীন মানে বাগদা চিংড়ির পোনা-ধরে ওতে করে। জালের ফুটো গুলো এত ছোট যে তাতে মীনের সঙ্গে অন্য সব মাছের ডিম ও উঠে আসে’’।[১১০] মানুষের সীমাহীন লালসা ও হনন প্রবৃত্তি বাস্তুতন্ত্রের শৃঙ্খলাকে ধ্বংস করেছে। মনুষ্য সমাজের কৃতকর্মের ফলশ্রুতি হিসাবে বাংলা বা বাংলাদেশ থেকে ঋতুর অবলুপ্তি ঘটেছে। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-শীত নিয়ে প্রচন্ড চরমভাবাপন্নের মধ্যে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃতি বিরাজ করছে। একটা ঋতু যদি তার সময়কালের থেকে একটু বেশি কনফিডেন্স দেখায় তবে অন্য ঋতুর পরমায়ু সংক্ষিপ্ত আকার ধারণ করে। তাছাড়া জলে লবণের মাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধির অসমতা, জলবায়ুর তারতম্য, নদীর নাব্যতা হ্রাস, জীবজন্তুর খাদ্য-খাদ্যকতা ও বিচরণ ক্ষেত্রের সংক্ষিপ্তায়ন, ব্যাপক যন্ত্রযানের তেল ও শব্দ দূষণ জনিত অত্যাচার, জনবিস্ফোরণ, শিল্পের নামে, নগরায়নের নামে এবং চোরাগোপ্তা আক্রমন ও যথেচ্ছ শিকার প্রভৃতি কারণে আজ বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন। এছাড়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়, ঝড়-ঝঞ্ঝা ও এই ক্রমবিবর্তনের ধারাতে যুক্ত হয়েছে। ফলে উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগৎ ও প্রায় সম্পূর্ণ বিপন্ন। আবার বেশ কিছু বিলুপ্তির পথে। ২০০৯ সালের মে মাসে ‘আয়লা’ যে ভয়ংকরতা দেখিয়েছে তাতে বেশ ভয়ংকর ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত সুন্দরবনসহ সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র। এই আয়লা গোটা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দিয়েছে। সম্পদের ওপর প্রবল সংকট তৈরি করে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়। বিগত এই ৪০০ বছরে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে সুন্দরবন ১০৪ বার বিপর্যস্ত, ১৭৩৭ সালে কেবলমাত্র ৩ লক্ষ মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়ে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী এর কারণেও সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে বিলুপ্তির পথে

চলে যায়। ভয়াবহ বন্যাও সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রকে নানা ভাবে বিপর্যস্ত করেছে। কেবলমাত্র মানুষ নয়, নানান ভাবে নানান কারণে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র থেকে ক্রমাগত হারাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের সম্পদ। মূলত বাস্তুতন্ত্র থেকে ম্যানগ্রোভ ধ্বংস হচ্ছে বলেই প্রাকৃতিক সম্পদের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। যে কারণে বিপন্ন ও বিলুপ্তির পথে নিম্ন লিখিত প্রাণী ও উদ্ভিদ সম্পদ।

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন বিপন্ন করার হাতিয়ার হল দূষণ। দূষণের প্রকোপে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রের অবস্থা বেশ কাহিল। এই অঞ্চলে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রাচুর্য যে কমের দিকে, তার কারণ খুঁজতে খুব কষ্ট করতে হবে না। নর্দমার জল, শিল্প কারখানার দূষিত জল, ময়লা, কৃষি থেকে সার ও কীটনাশক, তেল শোধনাগারের দূষণ, পলি জমা ইত্যাদি সবকিছুই সুন্দরবনের নদী ব্যবস্থার বাস্তুতন্ত্রকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার জন্য দায়ী। এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য বর্তমান সরকার সচেষ্ট।

সূত্রনির্দেশ

১। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোর খুলনার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড (কলিকাতাঃ চক্রবর্ত্তী চ্যাটার্জী এন্ড কোং, ১৩২১), পৃ-৪১।

২। Dr. Madhumita Mukherjee (Ed), Sundarban Wetlands, Department of Fisheries, Aquaculture, aquatic Resource and Fishing Harbours, Government of West Bengal, 2007, P-27.

৩। Barun De (Ed), West Bengal District Gazetteers, South 24 Parganas, Government of West Bengal, 1994, P-175.

৪। Government of West Bengal, Department of Sundarban Affairs Website, www.sundarbanaffairswb.in, last visited 07-02-2022.

৫। Dr. Madhumita Mukherjee (Ed), Ibid, P-3.

৬। Ibid, p-3.

৭। A. K. Mondal and R. K. Ghosh, Sundarbans: A socio Biological Study (Calcutta: Bookland Private Ltd., 1989), P-45.

৮। সুধীন সেনগুপ্ত, সুন্দরবন জীবপরিমন্ডল (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১২), পৃ-১৮।

৯। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন (কলকাতাঃ লোক, ২০১৩),পৃপৃ-৭০-৮৯।

১০। ডাঃ কুমুদরঞ্জন নস্কর, সুন্দরবনের উদ্ভিদবিদ্যার কিছু আদিকথাঃ ম্যানগ্রোভ ও অন্যান্য উদ্ভিদ, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র, তৃতীয় সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০০৮), পৃপৃ-৫-৬।

১১। সুভাষ মিস্ত্রী, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ (কলকাতাঃ পুস্তক বিপণি, ১৪২৪), পৃপৃ-৪৬-৪৭।

১২। তদেব, পৃ-৪৮।

১৩। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৬।

১৪। তদেব, পৃপৃ-৬৭-৬৮।

১৫। তদেব, পৃ-৬৮।

১৬। সুভাষ মিস্ত্রী, সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০

১৭। তদেব, পৃ-৫০।

১৮। তদেব, পৃ-৫১।

১৯। তদেব, পৃ-৫৮।

২০। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৭৫।

২১। L. S. S. O'Malley, Bengal District Gazatteers-24 Parganas (Calcutta: Government of West Bengal, 1998), P-251.

২২। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪।

২৩। সুধীন সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃপৃ-১৩-১৪।

২৪। শচীন দাশ, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ১৯৯৭), পৃপৃ-৩৯-৪০

২৫। তদেব, পৃ-৪০।

২৬। Board of Revenue, Proceedings No 89, 15 June, 1827, WBSA.

২৭। শচীন দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ-৪০।

২৮। শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবনে আর্জান সর্দার (কলকাতাঃ দীপায়ন, ১৩৬২), পৃ-১০৪।

২৯। সুধীন সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ-৬৮।

৩০। তদেব, পৃ-৬৯।

৩১। অমলেন্দু চক্রবর্তী, বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা.), সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-১ (বারুইপুরঃ সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, ২০১৫), পৃ-২৩৮।

৩২। Mahua Sarkar, Social Systems, Science and The Indigenous Beliefs: A Case-study of the People of the Sundarbans in Contemporary West Bengal, Amit Bhattacharyya and Mahua Sarkar (Ed), History and The Changing Horizon Science, Environment and Social Systems (Kolkata: Setu Prakashani, 2014), P-113.

৩৩। A. K. Das and N. C. Nandi, Fauna of the Indian Sundarbans Mangal and their Role in the Ecosystem, D. N. Guha Bakshi, P. Sanyal and K. R. Naskar (Ed.), Sundarbans Mangals (Calcutta: Naya Prokash, 1999), Pp-419-421.

৩৪। সুধীন সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ-১৮।

৩৫। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-৯৬।

৩৬। শচীন দাশ, প্রাগুক্ত, পৃ-৫০।

৩৭। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-১৩৭।

৩৮। তদেব, পৃপৃ-১০১-১০২।

৩৯। অমিতাভ ঘোষ, ভাটির দেশ, অনুবাদ অচিন্ত্যরূপ রায় (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৬), পৃ-১২৫।

৪০। Madhumita Mukherjee, About Sunderban Wetlands: Resource Identification, Potentiality and Threats, Dr. Madhumita Mukherjee (Ed.), Sundarban Wetlands, Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resource and Fishing Harbours, Government of West Bengal, 2007, P- 29.

৪১। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৪।

৪২। A. K. Das and N. C. Nandi, Fauna of the Indian Sundarbans Mangal and their Role in the Ecosystem, D. N. Guha Bakshi, P. Sanyal and K. R. Naskar (Ed.), প্রাগুক্ত, পৃ-৪২০।

৪৩। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্ট ক্যানিং (কলকাতাঃ লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭), পৃ-৫৭।

৪৪। সুধীন সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ-৬১।

৪৫। Census of India 1951, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৪৬। Census of India 1981, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৪৭। Census of India 2001, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৪৮। Census of India 2011, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas.

৪৯। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮।

৫০। জয়ন্ত কুমার মল্লিক, সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ ও বিপন্ন প্রাণী, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী (সম্পা), শুধু সুন্দরবন চর্চা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, হুগলী, ১৫ই অক্টোবর, ২০১৫, পৃ-৩১।

৫১। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯।

৫২। শঙ্করকুমার প্রামাণিক, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন (কলকাতাঃ সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮), পৃ-৫৪।

৫৩। মত্তদুদুর রহমান, জীবন জীবিকা ও জীব বৈচিত্র্যের ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন (খুলনাঃ সেন্টার ফর কোষ্টাল এনভায়রনমেন্ট কনজারভেশন, ২০১৫), পৃ-২৮।

৫৪। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৮।

৫৫। জয়ন্ত কুমার মল্লিক, সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ ও বিপন্ন প্রাণী, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী (সম্পা), প্রাগুক্ত, পৃ-৩১।

৫৬। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের ইতিহাস (কলকাতাঃ পাণ্ডুলিপি, ২০১৭), পৃ-১২৯।

৫৭। সুভাষ মিস্ত্রী, লোকায়ত সুন্দরবন, প্রাগুক্ত, পৃ-১০৯।

৫৮। Colonel Gastrell, The Sundarbans, 1859, The Calcutta Review, Vol-XXXII, January-June, PP-1-25, District Handbook 24 Parganas, Census of India.

৫৯। কল্যাণ রুদ্র, ভূখন্ড সুন্দরবন শতাব্দীর বিবর্তন, শুধু সুন্দরবন চর্চা, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী (সম্পা.), হুগলী, জুলাই-অক্টোবর-২০২১, পৃ-৭।

৬০। সাক্ষাৎকারঃ নাম- অসীম কুমার কোরা, পিতা- শ্রীধর চন্দ্র কোরা, বয়স- ৪২, পেশা- সমাজসেবক, গ্রাম- উত্তর সুরেন্দ্রগঞ্জ, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, তারিখ- ১৩/১০/২০২১।

৬১। কল্যাণ রুদ্র, ভূখন্ড সুন্দরবন শতাব্দীর বিবর্তন, শুধু সুন্দরবন চর্চা, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী (সম্পা.), হুগলী, জুলাই-অক্টোবর-২০২১, পৃ-৭।

৬২। কুমুদরঞ্জন নস্কর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬, পৃ-৪১৪।

৬৩। অমলেন্দু চক্রবর্তী, বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা- ১ যুগ্ম সংখ্যা, নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা.), সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, জীবন মণ্ডল হাট, জুলাই-ডিসেম্বর-২০১৫, পৃ-২৩৫।

৬৪। সুন্দরবনের ঘটনাপঞ্জি, ভূখন্ড সুন্দরবন শতাব্দীর বিবর্তন, শুধু সুন্দরবন চর্চা, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী (সম্পা.), হুগলী, জুলাই-অক্টোবর-২০২১, পৃ-৮৮।

৬৫। অমলেন্দু চক্রবর্তী, বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা- ১ যুগ্ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃপৃ- ২৩২-২৩৩।

৬৬। কুমুদরঞ্জন নস্কর, পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনঃ প্রকৃতি ও পরিচিতি, তারাপদ ঘোষ (সম্পা.), প্রাগুক্ত, পৃ- ৪১৬।

৬৭। নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবনের আয়লার স্মৃতি উস্কে দিল ফনী, দিনদর্পন পত্রিকা, মে ৪, ২০১৯, পৃ-৫।

৬৮। www.bn.wikipedia.org/wiki/ঘূর্ণীঝড়_মাতমো-বুলবুল

৬৯। সুন্দরবনের ঘটনাপঞ্জি, ভূখন্ড সুন্দরবন শতাব্দীর বিবর্তন, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৭।

৭০। অমলেন্দু চক্রবর্তী, বিশ্ব জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে সুন্দরবনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন, সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা- ১ যুগ্ম সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ-২৩৫।

৭১। মিলন দত্ত, অন্তহীন দুর্ভোগে সুন্দরবনের মানুষ, বিপন্ন পরিবেশ, নাগরিক মঞ্চ, ২০১৬, পৃ-১৫৯।

৭২। Ramachandra Guha and Madhav Gadgil, This Fissured Land, An Ecological History of India (New Delhi: Oxford University Press, 1992), P-124.

৭৩। Ibid, P-123.

৭৪। Irfan Habib, Man and Environment, The Ecological History of India (New Delhi: Tulika Books, 2010), P-132.

৭৫। RD, July, 1874, Proceedings No. 12B, 30 July 1874, and November 1874, No. 2291, From GOB to GOI in the Revenue, Agriculture and Commerce, dt. Calcutta, 16th November, 1874.

৭৬। গোকুলচন্দ্র দাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত (কলকাতাঃ প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০২১), পৃ-২০০।

৭৭। Ranjan Chakrabarti, Local People and Global Tiger: An Environment History Of Sundarbans, http://www.globalenvironment.it/CHAKRABARTI.pdf. Last Visited 20-02-2022.

৭৮। RD, 14^{th} April, 1853, No. 33, GOB to BOR, dt 9^{th} April, 1853.

৭৯। https://www.drishtiias.com/to-the-points/Paper2/indian-forest-act-1927

৮০। A. K. Mondal and R. K. Ghosh, প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩।

৮১। Report of the United Nations Conference on The Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972, A/Conf.48/14/Rev.1, United Nations Publication, P-4.

৮২। Ibid, Pp-4-5.

৮৩। ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার (কলকাতাঃ আন্তরিক, ২০১০), পৃ-৪০

৮৪। নুরুল আমিন বিশ্বাস, বিশ্ব পরিবেশ ভাবনা (কলকাতাঃ বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন, ২০১০), পৃ-৭০।

৮৫। The Constitution of India, Article 48A, Government of India, Ministry of Law and Justice, New Delhi, 2005, P-19.

৮৬। ডালিম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত, পৃ-৫। এই বিষয়ে আরও দ্রস্তব্য— pib.gov.in/newsite/printreliase.aspx? relid=105411, last visited 02-02-22.

৮৭। J. Razzaque, "Case Law Analyasis: Application of Public Turst Doctrine in Indian Environmental Cases" (2001), 13(2), Journal of Environmental Law 231.

৮৮। পূর্ণেন্দু ঘোষ, প্রাগুক্ত, পৃ-৫৭।

৮৯। গোকুলচন্দ্র দাস, প্রাগুক্ত, পৃ- ২২৬। এই বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য—

www.bn.wikipedia.org/wiki/সুন্দরবন

৯০। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (একখন্ডে) (গড়িয়াঃ মাস এন্টার্টেন্মেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৫), পৃ-৭২৫।

৯১। গোকুলচন্দ্র দাস, প্রাগুক্ত, পৃ-২২৪।

৯২। www.bn.wikipedia.org/wiki/সুন্দরবন

৯৩। Census of India, 1951, 2011.

৯৪। Barun De, West Bengal District Gazetteers, South 24 Parganas, Government of West Bengal, March, 1994.

৯৫। Hand Book of Fisheries Statistics, Government of West Bengal, Departent of Fisheries, Directorate of Fisheries 2017-18, P-110.

৯৬। Report of Fisheries Department of Desired by the District Magistrate South 24 Parganas Fishermen Population (Approximate) as on 01/01/2022, Block Development Office, Patharpratima.

৯৭। W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, District of the 24 Parganas and Sundarbans, Vol-I, (London: Trubner & Co, 1875), Pp-318-19.

৯৮। অমিতাভ ঘোষ, ভাটির দেশ, অনুবাদ অচিন্ত্যরূপ রায় (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৬), পৃ- ১১৮।

৯৯। Traditional Fisheries in the Sundarban Tiger Reserve, A Study on Livelihood Practice Under Protected Area, Society for Direct Initiative for Social and Health Action (DISHA), Kolkata, 2009, P-17.

১০০। Haraprashad Chattapadhayay, The Mystery of the Sundarbans (Calcutta: A Mukherjee & Co PVT Ltd, 1999), P-86.

১০১। Ibid, P-86

১০২। পূর্ণেন্দু ঘোষ, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্টক্যানিং (কলকাতাঃ লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭), পৃ-১২।

১০৩। সুকুমার সিং, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস, একখন্ডে (গড়িয়াঃ মাস এন্টার্টেন্মেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০), পৃ-৮৫৪।

১০৪। সূর্য্যেন্দু দে, মাছ জল মৎস্যজীবী (১ম) (কলকাতাঃ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ, ১৪২৪), পৃপৃ-১৩-১৪।

১০৫। কানাইলাল সরকার, সুন্দরবনের শ্রমজীবী সম্প্রদায়ঃ জীবন, জীবিকা ও সংস্কৃতি, বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং- ১, ২০১০), পৃ-২৬।

১০৬। ভূখন্ড সুন্দরবন শতাব্দীর বিবর্তন, সুন্দরবনের ঘটনাপঞ্জি, জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী (সম্পা.), শুধু সুন্দরবন চর্চা জুলাই-অক্টোবর- ২০২১, হুগলী, পৃ-৮৮।

১০৭। Census of India 2011, West Bengal, District Census Handbook, South Twenty Four Parganas, Series-20, PartXII-A, P-16.

১০৮। সেমন্তী দাশ, গোসাবা ব্লকে নদী তীরবর্তী নির্বাচিত কিছু মৌজার মাছ ও কাঁকড়া শিকারীরা কেমন আছেন? একটি সমীক্ষা, নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পা.), সুন্দরবন সমস্যা ও সম্ভাবনা- ২, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশনা, জীবন মন্ডল হাট, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৬, পৃ-১৯২।

১০৯। প্রসেনজিৎ কোলে, জল-ডাকাতির সেকাল ও একাল, বরেন্দু মণ্ডল (সম্পা.), দ্বীপভূমি সুন্দরবন (কলকাতাঃ ছোঁয়া, ২০২০), পৃ-৫৭১।

১১০। অমিতাভ ঘোষ, ভাটির দেশ, অনুবাদ- অচিন্ত্যরূপ রায় (কলকাতাঃ আনন্দ, ২০১৬), পৃ-২৮।

আশা-নিরাশার দোলাচলে মৎস্যজীবীরা

"…..পাইল না শক্ত কোনো অবলম্বন। কঠিন কোনো পা রাখিবার স্থান। তাই তারা ভাসমান। পৃথিবীর বুকে মিশিয়া যতই তারা, জেলেরা, গাছপালা বাড়িঘরের সঙ্গে মিতালি করুক, তারা বাষ্পের মত ভাসমান। যতই তারা পৃথিবীর বুক আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকুক, ধরার মাটি তাহাদিগকে সর্বদা দুই হাতে ঠেলিয়া দিতেছে, আর বলিতেছে, ঠাঁই নাই, তোমাদের ঠাই নাই। যতদিন নদীতে থাকে জল, ততদিন তারা জলের উপর ভাসে। জল শুখাইলে তারা জলের সঙ্গে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়"।[১]

ভারতে সুপ্রাচীনকাল থেকে সমাজের গঠনে শ্রম বিভাজনের একটা ধারা লক্ষ্য করা যায়। যারা যে পেশায় নিযুক্ত থাকতেন তাদের বংশধররাও একই পেশার অনুগামী হয়ে পারদর্শী হয়ে উঠতেন। এইভাবে গড়ে উঠেছিল এক একটি পেশাভিত্তিক সম্প্রদায়, যারা এক একটি বিশেষ কাজে দক্ষ ছিলেন। মূলত বিষয়গুলি বেশিরভাগ কায়িক শ্রমের বিনিময়ে হয় বলে তাদের গ্রামীণ কারিগর বা আর্টেশন বলা হয়— যা আজও সমাজে 'সমাজবন্ধু' হিসাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এদের পরিষেবা ছাড়া সমাজে মানুষ বাঁচতে পারে না। এখানে একটা বিরাট বৈষম্য চলে এসেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে, বর্তমানে মানুষের টিকে থাকার স্বার্থে পরিবেশ বাঁচানোর উদ্যোগ চলছে। এই পরিবেশ রক্ষা করার ক্ষেত্রে গবেষকের মূল্যায়নে, মৎস্য দপ্তর এবং সর্বোপরি মৎস্য চাষিরা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই মৎস্যজীবীদের 'সমাজ বন্ধু' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া সমাজের প্রত্যেকের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। পরিবেশ রক্ষায় সবথেকে বড়ো ভূমিকা পালন করে জলাভূমি আর এই জলাভূমিকে নিজেদের জীবিকার টানে সুরক্ষিত রাখছে মৎস্যজীবীরা, তাই সমাজ বন্ধু হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্যজীবীরা সর্বোচ্চ দাবিদার। কিন্তু সেই মর্যাদা তো তারা পায় না, পক্ষান্তরে এই সমাজে আজও তারা বঞ্চিত, অবহেলিত ও শোষিত।

সুন্দরবন হল নদী-খাঁড়ি-মোহনা দ্বারা গঠিত একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল। ঔপনিবেশিক সরকার ১৭৭০ সালে সুন্দরবন পুনরুদ্ধারের যে নীতি বাস্তবায়ন করেছিল সেই পর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে নিয়ে এসে এই দুর্গম স্থানের সংস্কার করিয়েছিল। ১৯৪৭ সালের দেশ ভাগের পরে মালো, রাজবংশী, জালিয়া, নমঃশূদ্র প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু বহু মানুষ সুন্দরবনে তাদের বাসস্থান গড়ে তুলেছিল। ক্রমে কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের তাগিদে মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পোদ, কৈবর্ত, বাগদি, চামার, কাওরা, তেলি, তাঁতি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা এই প্রত্যন্ত এলাকায় ভিড় জমিয়েছিল, যাদের পেশা ছিল মৎস্য শিকার। কালক্রমে এদেরই অবহেলিত অংশ সুন্দরবনের সমাজে মৎস্যজীবী হিসেবে পরিচিত। এখানকার মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান ভিত্তি কৃষিকাজ। তাসত্ত্বেও বর্তমানে সুন্দরবনের প্রায় ৫ লক্ষাধিক মৎস্যজীবী মানুষ তাদের বেঁচে থাকার অবলম্বন হিসাবে মৎস্য সম্পদকে কেন্দ্র করে জীবিকা নির্বাহ করে চলেছে।

মৎস্যজীবীরা হলেন এমনই এক সম্প্রদায় যারা মাছধরার জন্য জাল, নৌকা, আটোল, ঘুনি ও নানা সরঞ্জাম তৈরি করা, মেরামত করা থেকে বিভিন্ন ভাবে নানা প্রজাতির মাছ ধরার কাজে দক্ষ ছিলেন এবং সংগৃহীত মাছ দাদনদারদের কাছে বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। আগেকার দিনে মৎস্যজীবীরা শুধু মাছ ধরতেন প্রাকৃতিক জলাশয়, নদ-নদী, খাল, বিল, বাঁওড় এমন কি সমুদ্রের মতো প্রাকৃতিক জলভান্ডার থেকে। এক এক জায়গায় জলাশয়ের পাড়ে বসতি গড়ে তুলতেন। আবার বসতি বাড়লে আর দিন দিন সেই জায়গার জলাশয়ে প্রাকৃতিক মাছ কমতে থাকলে নতুন জলাশয়ের সন্ধান চলতো। আবার সেই নতুন জলাশয়ের পাড়ে সংসার পাতা, আবার মাছ ধরা জীবিকা নির্বাহের সংগ্রাম চলতো। যেন সেই সাইবেরিয়ার পাখিদের মত—যেখানে মাছের

সমারোহ, সেখানেই জেলেদের বাস। নানা কারণে জলাশয়ের সংকোচণ, দূষিত জলের আধিক্য আর মৎস্যজীবীদের চাপে জলাশয় মাছশূন্য হয়ে ওঠার সাথে সাথে এই সমাজ বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করল। প্রাকৃতিক জলাশয়গুলি চলে গেল জমিদারদের অধিকারে। তবু সেদিন জলাশয়গুলি ছিল। মৎস্যজীবীরা জমিদারদের থেকেই মাছ ধরার অধিকার ও জলাশয়কে ঘিরে বসতি গড়ার অধিকারও পেতেন।

স্বাধীনোত্তর পর্বে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের আর্থ-সামাজিক জীবন ও তাদের সাংস্কৃতিক রূপান্তরকে একটি পরিকাঠামোর মধ্যে রেখে আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে খোঁজা হয়েছে মৎস্যজীবীদের একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। যে ইতিহাসের মধ্যে রয়েছে মৎস্যজীবীদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, সংস্কৃতির ধরণ, সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি, মাছ সংগ্রহ সম্পর্কিত অনুশীলন, আধুনিক প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীলতা ও প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সহাবস্থান। বিশ্বের প্রাচীন সভ্যতাগুলি যেমন সিন্ধু, মেসোপটেমিয়া, মিশরীয় প্রভৃতি সভ্যতা নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, একইভাবে সুন্দরবনের নদীকে কেন্দ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকা গড়ে উঠেছে। জীবনের ঝুঁকি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে উপেক্ষা করে সুন্দরবনের মৎস্যজীবী মানুষেরা তাদের পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য মাঝ সমুদ্রে পাড়ি দেয়। গঙ্গা দেবীর কৃপা হলে কেউ ফিরে আসে, আবার কেউ সমুদ্রেই থেকে যায়। "রুজির টানে মাছ ধরতে ওরা পাড়ি দেন দূর সমুদ্রে। অনেক দিনের পথ। ফেরার অপেক্ষায় বসে থাকে স্ত্রী-ছেলে-মেয়ের ভুখা সংসার। দিন কেটে যায়। তারপর হয়তো খবর আসে, আর ফিরবে না বাড়ির রোজগেরে পুরুষটি। সমুদ্রে ডুবে গিয়েছে মাছ ধরার ট্রলার"।[২] সুন্দরবনের মৎস্যজীবী পরিবারগুলির জীবনের এটাই বাস্তব চিত্র। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে অধিকাংশ সময় নদীবাঁধ ভেঙে সুন্দরবন লোনা জলে প্লাবিত হয়, কয়েক বছর কৃষিকাজ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, ভরসা

সেই নদী। পুরুষদের পাশাপাশি সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, নামখানা, সাগর, ফ্রেজারগঞ্জ, ক্যানিং, বাসন্তী, গোসাবা, সন্দেশখালি, মিনাখাঁ প্রভৃতি এলাকার মহিলারাও জাল টেনে মীন ধরে, নৌকা নিয়ে নদীর মাছ-কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। "আয়লা-পরবর্তী সুন্দরবনের দুর্ভোগ আরও বাড়িয়েছে আমফান, ইয়াসের মতো একের পর এক ঘূর্ণিঝড়। স্বাদু জলের ভাঁড়ার কমে যাচ্ছে জল-জমিতে নুনের আধিক্য বাড়ছে, চাষবাস কার্যত বন্ধ। অধিকাংশ পুরুষ পাড়ি দিয়েছেন ভিন রাজ্যে কাজের খোঁজে, ফেলে গিয়েছেন বৌদের। সংসার, সন্তান আর বয়স্কদের দায়িত্ব চাপিয়ে। অনিয়মিত টাকা পাঠানোর উপর ভরসা না করে সংসার চালাতে মেয়ে-বৌ'রা নদীকেই আঁকড়ে ধরেন। কোমর সমান নোনা জলে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে বাগদা, মাছ, কাঁকড়া ধরার পরিণতি— জরায়ুর রোগ। চর্মরোগেরও আধিক্য বেড়েছে"।[৩] মৎস্যজীবীদের কাছে চিকিৎসক বলতে ওঝা-গুনিনের কবচ-তাবিজ, মন্ত্র-তন্ত্র, জড়িবুটি ও গাছগাছড়ার শেকড়-বাকড়। "সুন্দরবনের ক্যানিং-এর নদী পার হয়ে ডকের কাছে একজন চিকিৎসক চটা দিয়ে বেঁধে এবং গাছের নির্যাস ব্যবহার করে অনেক মানুষের হাড় জুড়ে দিচ্ছেন। ভেঙে যাওয়া হাড়ে গাছগাছড়া বেটে মণ্ড দিয়ে হাড় সেটিং করে চিকিৎসক প্রচুর মানুষকে সুস্থ জীবন দান করছেন"।[৪] চটজলদি সমধান নিয়ে আবার নদীতে ফেরার পালা। সারা দিন রাতের পরিশ্রমেও অন্ন জোগাড় করতে তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়ে। বর্তমানে মাছের অনিয়মিত উৎপাদনে মৎস্যজীবীদের আয় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। যে কারণে মাছ ধরার নিজস্ব সরঞ্জাম ছেড়ে চুক্তিভিত্তিতে অনেকে পাথরপ্রতিমা, নামখানা, কাকদ্বীপ, ফ্রেজারগঞ্জ প্রভৃতি এলাকার যন্ত্রচালিত নৌকা ও ট্রলারে কাজ করছে। যদিও এতে পারিশ্রমিক কম তবুও এই কম নির্দিষ্ট আয় তাদের পরিবারকে অভুক্ত থাকা থেকে রক্ষা করে।[৫]

সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের কাছে আশা-ভরসার জায়গা হল নদীর মৎস্য সম্পদ। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমানে তারা এই অর্থকরী সম্পদ থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিচ্ছে। তার অবশ্য অন্য অনেক কারণ রয়েছে। তবে জনসংখ্যার একটা চাপ কিন্তু প্রথম থেকেই মৎস্যজীবীদেরকে কোণঠাসা করছে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকে সুন্দরবনে মানুষের আনাগোনা বেড়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রভাব এসে পড়েছিল এই জীবিকার উপরে। ঔপনবেশিক সময়ে ও স্বাধীনোত্তর পর্বেও দেখা গেছে নিম্নবিত্ত হিন্দু সমাজের তপশিলি জাতির মানুষেরা মাছ ধরার কাজে বেশি পরিমাণে এগিয়ে এসেছিল। ১৯৬০ থেকে ১৯৭০ এর দশকে দেখা গেছে জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় জনিত কারণে মুসলিম ভূমিহীন মজুর ও প্রান্তীয় কৃষকের সংখ্যা বেড়ে যায়, অনেক মুসলিম তাদের সাবেকি পেশা পরিত্যাগ করে মাছধরার পেশায় চলে আসে। যা হিন্দু মৎস্যজীবীদের উপর অতিরিক্ত একটা চাপ তৈরি করেছিল। ফলে তারা সংখ্যালঘুর মধ্যে আরও সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছিল।[৬] কে সি সাহা উল্লেখ করেছেন হাজার হাজার ধীবর তাদের দীর্ঘদিনের পেশা ত্যাগ করে ভূমিহীন কৃষক হিসেবে কৃষিতে যোগ দেয়।[৭] ধান তোলার পর কৃষকদের হাতে সেরকম কোন কাজ থাকে না, তাই তারা জল সেঁচে কাদাজলে মাছ ধরে সামান্য আয় করে, যা তাদের ভীষণ কাজে লাগে।[৮] প্রসঙ্গত একথা বলা যুক্তিযুক্ত যে মাছের প্রতি মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের মানুষের একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল, যার ধারা আজও বর্তমান রয়েছে।

সুন্দরবনের সোনার ফসল চিংড়ি, কাঁকড়া, পার্সে, ট্যাংরা, ভেটকি প্রভৃতি মাছের মধ্যে সারা বিশ্বে খাদ্য রসিকদের কাছে পছন্দের মাছ হল বাগদা চিংড়ি। কোটি কোটি টাকা রপ্তানির সুবাদে দেশের অর্থনীতিতে বাগদা চিংড়ি ধরা বা চাষ করার ক্ষেত্রে অপরিসীম গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ২০ বছরে বদলে গেছে চিংড়ি চাষিদের অবস্থা। এই চিংড়ি উৎপাদন এবং আনুষঙ্গিক ব্যবসা চলে

গেছে বিত্তবান জাতি বর্হিভূত মৎস্যজীবীদের হাতে। পরিণামে দেখা গেছে প্রথাগত দরিদ্র মৎস্যজীবীরা এই সমস্ত বিত্তবানদের তৈরি করা ভেড়িতে দিনমজুরের কর্মচারীতে পরিণত হয়েছে, নয়তো তারা নৌকা, জাল, দড়ি বিক্রি করে দিয়ে ভ্যান চালাচ্ছে অথবা গুজরাট, কেরালা, চেন্নাই প্রভৃতি রাজ্যে পাড়ি দিয়েছে জীবিকার তাগিদে। আর ওপর দিকে বাড়ির মা-বোনেরা সারা বছর ধরে সমুদ্রে, খাঁড়িতে, নদীতে ধরছে বাগদার মীন। এখনও প্রায় কয়েক হাজার নারী-পুরুষ এই কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এভাবে অনিয়ন্ত্রিত মাছ ধরার ফলে কুফল দেখা দিয়েছে, আগের মত পার্সে, ভেটকি, ট্যাংরা, চিংড়িদের পাওয়া যাচ্ছে না। শুধুমাত্র বাগদা চিংড়ির মীন বেছে বেছে সংগ্রহ করে বাকি হাজার হাজার অন্য বাচ্চাদের নির্মম ভাবে বালিতে ফেলে দিয়ে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে রোজ। উন্নত ধরণের নাইলন জাতীয় জাল দিয়ে ছেঁকে নেওয়া হচ্ছে সমস্ত রকম ছোট বড় মাছ। অপরদিকে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত বিদেশী ট্রলার বারে বারে এসে মাছ ও চিংড়ি ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাদের উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে সমুদ্রের একেবারে তলা পর্যন্ত তোলপাড় করে তারা মাছ ধরছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার প্রজনন উপযোগী চিংড়ি ও মাছ। এভাবে রিক্ত হয়ে পড়ছে নদী-নালার পাকে ঘেরা সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র। তবে আশার কথা এই যে বেশ কিছু নতুন প্রজাতির মাছ ইদানীং পাওয়া যাচ্ছে। সুন্দরবনের সমগ্র জনসংখ্যার একটা অংশ নদীর মাছ-কাঁকড়া সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। এই মৎস্যজীবীরাই সময়ে সময়ে বনের কাঠ-মধু সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কেবলমাত্র নদী নয়, খাল-বিল-জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহ করা গেলেও ভেড়ি-ফিশারি থেকে মাছ উৎপাদনের প্রতিও মৎস্যজীবীদের আকর্ষণ অনেক বেশি। জমির মালিকেরা মনে করেন ধানজমিকে ভেড়িতে রূপান্তরিত করা বেশি লাভজনক।[৯] স্বাধীনতার পরবর্তী দশকে দেখা গেছে সুন্দরবনের মোট ফিশারি এলাকার ৫৩,৩% সম্পূর্ণ কৃষিজমি থেকে রূপান্তরিত

ফিশারি।[১০] ১৯৮০র দশকে এই সমস্ত ফিশারিগুলিতে উৎপাদিত চিংড়ি মাছের জন্য, সুন্দরবনের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নদীর বাগদা মীন সংগ্রহ করে ফিশারিগুলিতে সরবরাহ করতো। সুন্দরবনের মৎস্যজীবী এই মীন সংগ্রাহকদের কাছে অর্থ উপার্জনের নতুন জীবিকা ছিল এটাই। কিন্তু নদীর পাড়ের অবক্ষয়ের কারণে, ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের ধ্বংসের কারণে সরকারিভাবে বনদপ্তর মীন সংগ্রহের উপর বাধা আরোপ করলে মৎস্যজীবীদের মধ্যে জীবিকার সংকট প্রকট হয়ে ওঠে।

বর্তমানে মৎস্যজীবীদের কাছে নদী-সমুদ্রের বিভিন্ন মাছের মধ্যে ইলিশ মাছের গুরুত্ব অধিক। অর্থনৈতিক গুণ সম্পন্ন ইলিশের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে। নদী-খালের মাছের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে ইলিশ মাছ ধরার প্রবণতা অনেক বেড়েছে মৎস্যজীবীদের। বঙ্গোপসাগরের দ্বীপাঞ্চল পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদীর মোহনা থেকে প্রতি বছর প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ ধরা হয়। ইলিশ সামুদ্রিক মাছ কিন্তু এই মাছ বড় নদীতে ডিম দেয়; ডিম ফুটে গেলে, বাচ্চা বড় হলে ইলিশ মাছ সাগরে ফিরে যেতে থাকে, সাগরে ফিরে যাওয়ার পথে ছোট বড় করে বেশ কয়েক টন ইলিশ মাছ মৎস্যজীবীদের হাতে ধরা পড়ে। মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার জন্য নৌকা ও ট্রলার নিয়ে সমবায় অফিসে বছরের হিসেবে ১০০০ টাকা ও ৩০০০ টাকা জমা দিয়ে অনুমতি নিয়ে, নাম নথিভুক্ত করে তবেই মাছ ধরতে যেতে হয় । তাই বর্ষার মরশুম এলে সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে সাড়া পড়ে যায়, মৎস্যজীবীদের মধ্যে সাজো সাজো রব উঠে। নৌকো অর্থাৎ ট্রলার বা ট্রলি গুলোকে ঝাড়-পোঁছ করে, ভেতরের আসবাবপত্র গুলোকে ঠিক ঠাক করে, জাল-দড়ি গুলোকে সাজিয়ে, পনেরো দিনের জন্য ষোল সতেরো জনের খাবার দাবার, জল, ঔষধ ও তেল নিয়ে মাঝ দরিয়ায় বেরিয়ে পড়ে। মৎস্যজীবীরা নিজেদের জীবন বাজি রেখে ছেলে-মেয়ে-বউ-আত্মীয় পরিজনদের থেকে অনেক অনেক দূরে এক অনাস্বাদিত উপার্জনের আশায় পাড়ি জমায়। আকাশে মেঘ দেখলে

আমাদের অনেকেরই মনে নানারকম চিন্তাভাবনা ভিড় করে, ঝড়-বৃষ্টির দিনকে কিভাবে উপভোগ করা যায়। বর্ষায় বাঙালির রসনা তৃপ্তির সেরা আইটেম ইলিশের খোঁজে মৎস্যজীবীরা টানা ৭ থেকে ১০ দিনের জন্য সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউয়ের নাচনের মাঝে মাছসংগ্রহের কাজে ব্যস্ত থাকে। আশা একটাই– যদি ইলিশ ওঠে দেখা যাবে টাকার মুখ, তাতেও রয়েছে নিরাশা। বয়স্ক মৎস্য সংগ্রাহকদের কথায়– 'আগে আগে ইলিশের বগলা (ঝাঁক) দেখা যেত সমুদ্রে, যতদূর চোখ যেত ঝাঁকে ঝাঁকে ইলিশ চোখে পড়তো, আর এখন ইলিশ ধরা অনেকটা লটারিতে টাকা পাওয়ার মত হয়ে গেছে তবুও পেটের টানে ছুটতে হয়, যদি ওঠে জালে'।[১১] কাজহীন বঙ্গের সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চলে শুধু অল্প শিক্ষিত বেকার নয়, উচ্চ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও দিন দিন হু হু করে বাড়ছে। ২০২০ সালে করোনা মহামারী, লকডাউন এই বেকারত্বকে যেমন ত্বরান্বিত করেছে তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও প্রত্যেকে দারুন ভাবে ভেঙে পড়েছে। তাই এই শিক্ষিত বেকারেরা চাকরির আশা বাদ দিয়ে পেট চালানোর জন্য, পরিবারকে বাঁচানোর জন্য বাড়ি ছেড়ে বিভিন্ন রাজ্য সহ দেশের বাইরে যেমন পাড়ি দিচ্ছে। তেমনি অনেক শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত বেকাররাও এই বর্ষার মরশুমে একটু রোজগারের আশায় জীবনকে তুচ্ছ করে মাঝ দরিয়ায় পাড়ি দেয় ইলিশ মাছ ধরার আশায়। সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল– নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, কাকদ্বীপ, সাগর, মৌসুনি, বকখালি, পাথরপ্রতিমা, রায়দীঘি, ক্যানিং, গোদখালি, ধামাখালি, হিঙ্গলগঞ্জ, এল-প্লট, জি-প্লট, রাক্ষসখালি ইত্যাদি আরও অনেক স্থান থেকে এই বর্ষার মরশুমে হাজার হাজার ট্রলার মাঝ দরিয়ায় পাড়ি দেয় ইলিশ মাছ ধরার জন্য। এই ট্রলার গুলো বঙ্গোপসাগরের মোহনা থেকে প্রায় পনেরো থেকে কুড়ি ঘন্টা দক্ষিণে নেমে যায় ইলিশ মাছ ধরার জন্য। কোন কোনটি আরও পাঁচ সাত ঘণ্টা গভীরে চলে যায় একটু বেশি মাছের আশায়। নৌকার মাঝিরা বেশ অভিজ্ঞ হয়। তারা বারে বারে গিয়ে ঐ কুল

কিনারা হীন অথৈ জলরাশির মাঝে ঠিক বুঝতে পারে কোথায় ভালো মাছ পাওয়া যাবে। আবার অনেক সাহসী মাঝি আছে যারা এই বর্ষার মরশুমে ভারতের সমুদ্র সীমানা ছাড়িয়ে বাংলাদেশের সীমানায় ঢুকে গিয়ে চোরাগোপ্তা ভাবে গোপনে অনেক সময় প্রচুর পরিমাণে বড় বড় সাইজের (এক একটার ওজন প্রায় দু আড়াই কেজি) ইলিশ মাছ ধরে নিয়ে এসে কোটি কোটি টাকা ব্যবসা করে থাকে। ধৃত মাছের উপর মালিক ও মাঝিদের লাভ বেশি থাকে। ভাগাভাগির বিষয়ে নানান নিয়ম বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন। তাই মাছ বেশি পরিমাণে পড়লেও ভাগা ভাগির মার প্যাঁচে বাকি মৎস্যজীবীরা তেমন বেশি কিছু হাতে পায় না। এই রকম অবস্থা আজ সমগ্র সুন্দরবন অঞ্চল জুড়ে সমস্ত মৎস্যজীবীদের। উচ্চতর পড়াশোনা সম্পন্ন গ্রামাঞ্চলের প্রান্তিক শিক্ষিত বেকার যুবকেরা হোক কিংবা সাধারণ মৎস্যজীবী হোক প্রত্যেকে এই বর্ষার মরশুমে কিছু পয়সা রোজগারের আশায় পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জীবনকে বাজি রেখে মাঝ দরিয়ার নিজেদেরকে অথৈ সলিলে ভাসিয়ে দেয়; কূল-কিনারাহীন তরঙ্গায়িত লবণাক্ত জলে নাকানি চোবানি খেয়ে, রোদে পুড়ে-জলে ভিজে, হাড় ভাঙা কায়িক পরিশ্রম করে অনেক সময় প্রায় মৎস্যহীন বিফল মনোরথ হয়ে শূণ্য হাতে অনেক ট্রলারকে ফিরতে হয়। আগের মতো ট্রলার গুলোতে আর উপচে পড়া মাছ হয় না। ধৃত মাছের পরিমাণ এখন সুন্দরবনের প্রতিটি ট্রলারে কমে এসেছে। কেননা সামুদ্রিক জলের দূষণ, যথেচ্ছ পরিমাণের খোকা ইলিশ ধরে ইলিশ মাছকে নিঃশেষ করা, বিদেশী বড় বড় আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত ট্রলারগুলি আরও গভীরে গিয়ে ছোট ও বড় সব ধরণের ইলিশ মাছ ধরে নেওয়া ইত্যাদি বিবিধ কারণ গুলো থাকার কারণে সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের ট্রলার গুলোতে ইলিশ মাছের পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। যে পরিমাণ মাছ মৎস্যজীবীরা সমুদ্র থেকে

তুলে আনে তার সঠিক দাম তারা পায় না। “যাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের পুষ্টি জোগান দেন, তাঁদেরই পুষ্টি জোগাড় হয় না”।[১২]

বর্তমানে শুকনো মাছকে কেন্দ্র করে মৎস্যজীবীদের একটা বড় সমস্যার জায়গা তৈরি হয়েছে। কাঁচা মাছকে শুকনো মাছে পরিণত করতে অত্যধিক পরিমাণে কীটনাশকের ব্যবহার করতে হয়। তা না হলে পচন ধরে মাছ নষ্ট হয়ে যায়। এই কীটনাশকের ব্যবহার সাম্প্রতিক বছরগুলিতে শুকনো মাছের ব্যবসায় ব্যাপকভাবে সমস্যার সৃষ্টি করছে। বেশিরভাগ বিদেশী দেশগুলি পশ্চিমবঙ্গ থেকে শুকনো মাছের আমদানি বন্ধ করে দিয়েছে। তার প্রভাব সরাসরি সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের সংকটকে বাড়িয়ে তুলেছে। কাকদ্বীপ, বকখালি, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, সাগর প্রভৃতি এলাকার শুকনো মাছের ব্যবসায়ীরা আজ চরম অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এর থেকে পরিত্রাণের আশায় মৎস্যজীবীরা সতত চিন্তিত। ১৯৮০র দশক থেকে সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের জন্য যান্ত্রিক নৌকার ব্যবহার শুরু হলে মাছের উত্তোলনে জোয়ার আসে। বর্তমানে ব্যবসায়ীরা কোটি কোটি টাকা বিনিয়োগ করে আরও উন্নত প্রথায় সমুদ্রের মাছ সংগ্রহের বন্দোবস্ত করে চলেছে। সেখানে ছোট নৌকার মৎস্যজীবীরা মহাজন-আড়তদারদের কাছ থেকে সুদে টাকা ধার নিয়ে তাদের নৌকাগুলিকে যান্ত্রিকভাবে রূপান্তরিত করেও গভীর সমুদ্রে যেতে পারছে না। সুন্দরবনের নদী-খাঁড়ি-মোহনায় তাদের সীমাবদ্ধ থাকতে হচ্ছে, মাঝে মাঝে একটু বেশি মাছ পাওয়ার আশায় সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করে। এরফলে হয় বাঘের শিকারে নয়তো বা বনদপ্তরের জরিমানার অধীনে পড়তে হচ্ছে। সুন্দরবনের ঝড়খালি গ্রামের মিলন বিশ্বাস বলেন— তারা কোন ভাবেই নদীতে মাছ ধরতে যেতে পারছে না, বনদপ্তর থেকে নির্দেশ জলে কেন? ডাঙ্গায় আয় কর। তিনি আরও বলেন সংরক্ষিত এলাকার কাছে কোন ভাবেই দেখলে হয় মারধর

করে, আটকে রেখে জরিমানা আদায় করে। তারা তিন পুরুষ এই মাছের উপরে জীবিকা নির্বাহ করছে, এখন মাছ ধরা বন্ধ করে দিলে খাবে কি? বড় নৌকাও তাদের নেই যে সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরবে। দিনমজুরের কাজ ছাড়া উপায় নেই।[১৩] বিশ্বায়নের প্রভাব বর্তমানে মাছ ধরার শিল্পকে দ্রুত ভারসাম্যহীন করে তুলছে। "Fruits of fishing industries are generally comsuming by the non-fishermen fish farmers and the owners of the fishing implements. The traditional fishermen have been transformed to water labourers."[১৪] তাসত্ত্বেও বিকল্প কিছু ভাবনার পরিকল্পনা দেখা যায়নি মৎস্যজীবীদের মধ্যে। মৎস্যজীবীদের কর্মে গতি সঞ্চার করতে সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থাগুলিকে সঙ্গে নিয়ে প্রান্তীয় এই মানুষগুলোর জন্য সহযোগিতা করছে। মৎস্যজীবীদের মাছ ধরার জালনেট সরবরাহ করা থেকে শুরু করে অন্তর্দেশীয় মৎস্য উৎপাদনে প্রশিক্ষণ দেওয়া, মাছের বীজ প্রদান প্রভৃতি সরকারি সহায়তা তাদের মধ্যে আশার আলো দেখিয়েছে।

> "ঘরে ঘরে জাগিয়া উঠিল কর্মচাঞ্চল্য। এখানে হাট-বাজার নাই। মালোরা দূরের হাট-বাজারে মাছ বেচিয়া আসে। সূতাকাটা, বাঁশের জাল বোনা, ছেঁড়া জাল গড়া, জালে গাব দেওয়া, —কারো বাড়িতে অবসর নাই। সন্ধ্যায় আবার জাল দড়ি কাঁধে করিয়া নৌকায় গিয়া ওঠে। বিরাম নাই"।[১৫]

আমার গবেষণাতে মৎস্যজীবীদের জীবন কিভাবে আরও গতিময় হয়ে উঠতে পারে সেই পথের সন্ধান পাওয়ার চেষ্টা করেছি। আশা করি, নানা প্রতিবন্ধকতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রান্তিক এই মৎস্যজীবী মানুষদের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে এই গবেষণাপত্রটি ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাছে সহায়ক তথ্য রূপে বিবেচিত হবে।

সূত্রনির্দেশ

১। অদ্বৈত মল্লবর্মণ, তিতাস একটি নদীর নাম (কলকাতাঃ পুঁথিঘর, ১৩৬৫), পৃ-৪১৬।

২। দিলীপ নস্কর, ইলিশ ধরতে গভীর সমুদ্রে, সম্বল কেবল ঝুঁকি, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে আগষ্ট, ২০১৩, পৃ-৯।

৩। পৌলমী দাস চট্টোপাধ্যায়, উষ্ণায়নে বেশি বিপদে মেয়েরা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই জুলাই, ২০২৩, পৃ-4।

৪। প্রদীপ মণ্ডল, লোক ঔষধঃ ভেষজ ও গুণাগুণ, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতি পত্র, অষ্টম সংখ্যা বিমলেন্দু হালদার (সম্পা.), (সোনারপুরঃ বিবেকানন্দ রোড বাই লেন নং-১, ২০১১), পৃ-৪৭।

৫। S. K. Pramanik, Fishermen Community of Coastal Villages in West Bengal (Jaipur: Rawat Publications, 1993), Pp-128-129.

৬। Bob Pokrant, Peter Reeves and John McGuire, Bengal Fishers and Fisheries: A Historiographic Essay, Bengal: Rethinking History, Essays in Historiography, Sekhar Bandyopadhyay (Ed.), Delhi, 2001, P-111.

৭। K C Saha, Fisheries of West Bengal, West Bengal Government Press, Alipore, 1970, Pp-101-102.

৮। H. L. Hora, Mud-Fishing in Lower Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, No-XXVIII, 1932. এই বিষয়ে আরও দ্রষ্টব্য—সূর্য্যেন্দু দে, মাছ, জল মৎস্যজীবী (১ম), (কলকাতাঃ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ, ১৪২৪), পৃ- ৪১।

৯। K. G. Gupta, Reports on the Results of Enquiry in the Fisheries of Bengal and into the Fishery Matters in Europe and Amerika, Government of West Bengal, Alipore, 1908, P-86.

১০। সূর্য্যেন্দু দে, মাছ, জল মৎস্যজীবী (কলকাতাঃ গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ, ১৪২৪), পৃ-৪০।

১১। সাক্ষাৎকারঃ নাম- দীপক দাস, পিতা- চিত্ত দাস, বয়স- ৫০, পেশা- নৌকার মাঝি, গ্রাম- ব্রজবল্লভপুর, থানা- পাথরপ্রতিমা, তারিখ- ২১/০৩/২০২৩।

১২। রমেশ গায়েন, সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্যজীবীদের সংগ্রাম, শ্রীখন্ড সুন্দরবন, দেবপ্রসাদ জানা (সম্পা.), (কলকাতাঃ দীপ প্রকাশন, ২০০৪), পৃ-৩৮৯।

১৩। সাক্ষাৎকারঃ নাম- মিলন বিশ্বাস, বয়স-৪০, পেশা- মৎস্যজীবী, গ্রাম- ঝড়খালি, থানা- বাসন্তী, তারিখ- ২১/০৭/২০২৩।

১৪। Rup Kumar Barman, Fisheries and Fishermen: A Socio-Economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial Bengal and Post-Colonial West Bengal (Delhi: Abhijeet Publications, 2008), P-149.

১৫। অদ্বৈত মল্লবর্মন, তিতাস একটি নদীর নাম (কলকাতা: পুঁথিঘর, ১৩৬৫), পৃ-২৯৬।

পরিশিষ্ট ১

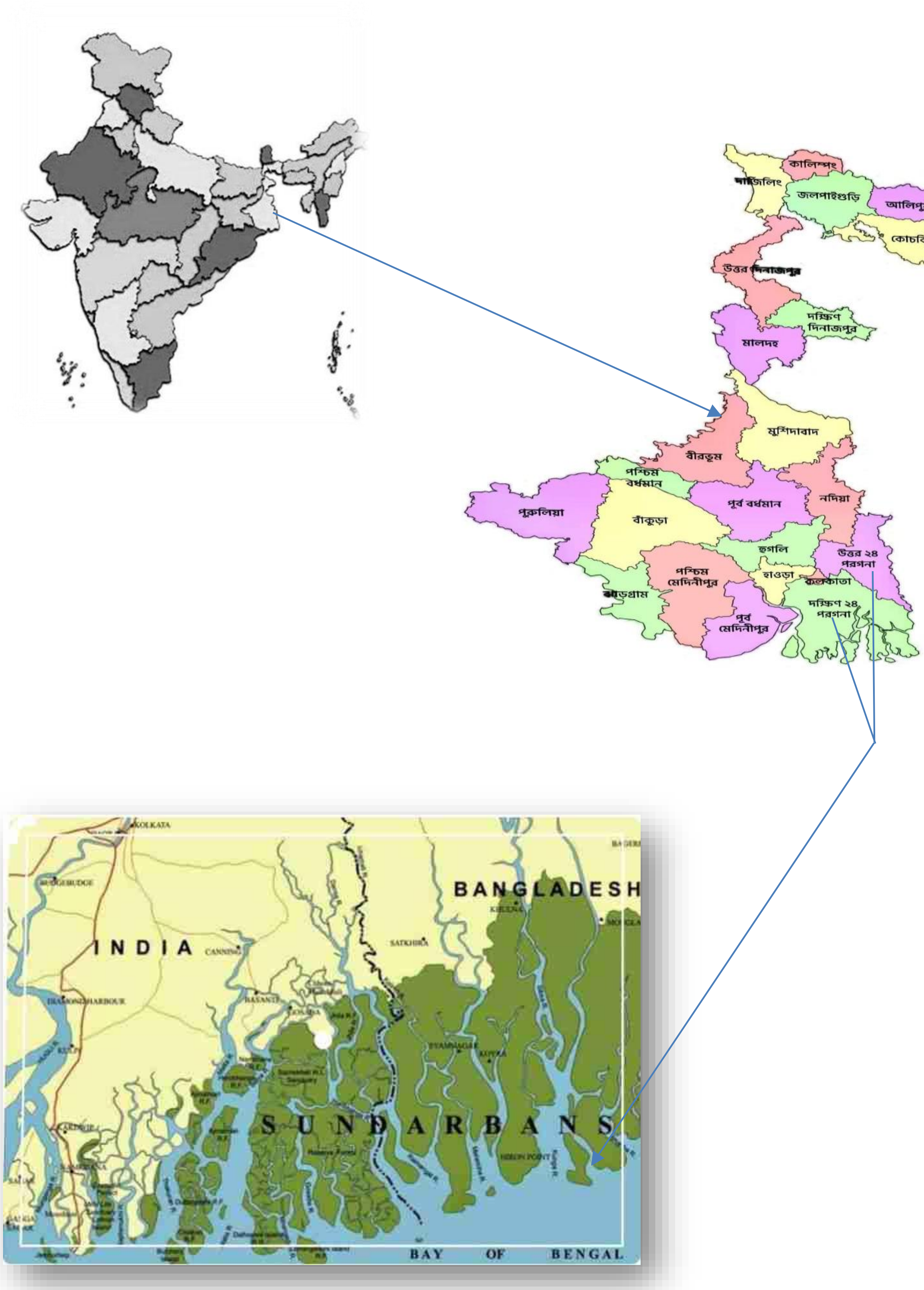

গবেষণা এলাকা

সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল

সুন্দরবনের অবক্ষয়ের চিত্র

মৎস্য সংগ্রহের দেশী নৌকা

যন্ত্রচালিত মাছ ধরার সামুদ্রিক ট্রলার

সুন্দরবনের নদীতে মীন ধরার চিত্র

কঠিন বাস্তবের সঙ্গে মৎস্যজীবী মানুষের লড়াই।

সামুদ্রিক মৎস্য সংগ্রহের জাল

সুন্দরবনের মৎস্যজীবী- দোন শিকারি

নদীর মৎস্য সংগ্রহের চিত্র

অসহায় নারীদের মাছ বিক্রয়ের চিত্র

সুন্দরবনের পথে বরফের বাক্সে করে মাছ বিক্রয়

মাছের আড়ত

পরিশিষ্ট ২

গবেষণার ক্ষেত্রসমীক্ষার নমুনা প্রশ্নপত্র

সুন্দরবনের মৎস্যজীবী সমাজের সমীক্ষা পত্র

নামঃ **বয়সঃ**

স্বামী/পিতার নামঃ

জাতিঃ

ঠিকানাঃ গ্রাম- **পোষ্ট-**

থানা- **ব্লক-**

জেলা- **রাজ্য-**

ফোন নম্বর-

শিক্ষাগত যোগ্যতা-

পরিবারে কতজন সদস্য?

পরিবারে সবাই কি পড়াশোনা করছে? হ্যাঁ/না।

পরিবারের কেউ কি চাকরি করে? হ্যাঁ/না।

আপনি কি প্রথম প্রজন্মের মৎস্যজীবী? হ্যাঁ/না।

যদি হ্যাঁ হয় তবে কত বছর এই মাছ ধরার কাজে যুক্ত আছেন?

আপনার পরিবার কত প্রজন্ম ধরে মাছ ধরছে? ২/৩/৪।

মাছ ধরতে নৌকা-জাল ব্যবহার করেন? হ্যাঁ/না।

আপনার কি ধরণের নৌকা ব্যবহার করেন? ডিঙ্গি নৌকা/যন্ত্রচালিত নৌকা?

আপনি মাছ ধরতে কোথায় যান? নদীতে / সমুদ্রে।

আপনার পরিবার সুন্দরবন এই এলাকায় কবে এসেছেন?

আপনি কি মাছ ধরেন, না কাঁকড়া ধরেন অথবা দুটি পেশাতেই ব্যস্ত থাকেন?

কাঁকড়া সংগ্রহের জন্য আপনি কোথায় কোথায় যান?

আপনি কোথায় মাছ ধরেন? নদী/সমুদ্রে।

আপনি কি মাছ ধরার জন্য নৌকা ব্যবহার করেন? হ্যাঁ/ না-

নৌকায় দলের সাথে মাছ ধরতে যান? হ্যাঁ/ না

যদি হ্যাঁ, কোন মাছ ধরার স্বাভাবিক সময়কাল কত? ৬/৭/৯/১২/১৫ দিন।

আপনি কোন ধরণের জাল ব্যবহার করেন? বেন্টি / খ্যাপলা/ অন্যান্য

মাছ ধরতে তিথি বিচার করেন? হ্যাঁ / না।

আপনার দৃষ্টিতে বছরের পর বছর ধরে মাছ ধরার প্রবণতা কী ছিল?

মাছের পরিমাণ বাড়ছে? হ্যাঁ / না।

মাছের পরিমাণ কমে যাচ্ছে? হ্যাঁ / না।

মাছের পরিমাণ হ্রাসের কারণগুলি কি হতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

আপনার নৌকা কি মৎস্য বিভাগে নিবন্ধিত? হ্যাঁ / না।

আপনি কি আপনার ফিশিং লাইসেন্সটি নবায়ন করেন? হ্যাঁ / না।

আপনার কি বন বিভাগের সাথে যোগাযোগ করতে হবে? হ্যাঁ / না

১০০ দিনের কাজে নাম আছে? হ্যাঁ / না

এই কাজের পারিশ্রমিক ঠিক পান? হ্যাঁ / না

বাড়ির মহিলা অন্য কোন কাজ করে? হ্যাঁ / না

বাড়ির অন্য সদস্য দেশের বাইরে কাজে যায়? হ্যাঁ / না

কোথায় যায়?

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য এখানে কোন ব্যবস্থা আছে? হ্যাঁ / না

কোন সরকারি সাহায্য পান? হ্যাঁ / না

মৎস্যজীবী ভাতা পান? হ্যাঁ / না

সরকারি কোন কোন প্রকল্প এখানে আছে?

মাছ চাষের জন্য জলাশয় আছে? হ্যাঁ/ না

অন্যের ভেড়িতে কাজ করেন? হ্যাঁ / না

বন বিভাগের সাথে আপনার অভিজ্ঞতা ভালো? হ্যাঁ / না।

ঝাড়ফুক-তুকতাক বিশ্বাস করেন? হ্যাঁ / না।

ওঝা-গুনিনে বিশ্বাস আছে? হ্যাঁ / না।

প্রতিমা পূজা করেন? হ্যাঁ / না।

দেব-দেবী হিসেবে কাদের পূজা করেন?

মাটি পূজা করেন? হ্যাঁ / না।

গাছের পূজা করেন? হ্যাঁ / না।

কোন কোন গাছের পূজা হয়?

গোয়াল পূজা করেন? হ্যাঁ / না।

বাড়িতে কেউ অসুস্থ হলে কোথায় যান? কোয়াক ডাক্তার / হাসপাতাল।

হাসপাতাল বাড়ির কাছাকাছি? হ্যাঁ/ না

বিশেষ অভিমত

যে ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়া হল তার স্বাক্ষর ও তারিখ

পর্যবেক্ষকের স্বাক্ষর

পরিশিষ্ট ৩

সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লকের নির্বাচিত গ্রামের মৎস্যজীবীদের নাম ও পরিবারের প্রধানদের নামের তালিকা

পাথরপ্রতিমা

ক্রমিক নং	নাম	পিতা / স্বামীর নাম
১।	অরবিন্দ শাসমল	ভুতনাথ শাসমল
২।	অনিল হালদার	মনোরঞ্জন হালদার
৩।	অজিতাভ গিরি	অশোক গিরি
৪।	বাসন্তী সর্দার	স্বামী- সাধু সর্দার
৫।	প্রসেনজিৎ মণ্ডল	দিলীপ মণ্ডল
৬।	বারি গাজী	নাজেম গাজী
৭।	দীপক দাস	স্বর্গীয় চিত্ত দাস
৮।	শঙ্কর দাস	নরেন দাস
৯।	ভোলানাথ দাস	স্বর্গীয় মন্টু দাস
১০।	প্রনব পাত্র	স্বর্গীয় জরেন পাত্র
১১।	দেবকুমার মাইতি	স্বর্গীয় ধীরেন মাইতি
১২।	পুণ্য দাস	হরেন দাস
১৩।	নারায়ণ সিংহ	কানাই সিংহ
১৪।	রঞ্জিত ঘাউরি	জহর ঘাউরি
১৫।	ঝলা দাস	স্বর্গীয় মন্টু দাস
১৬।	খগেন্দ্রনাথ পট্টনায়েক	নিরঞ্জন পট্টনায়েক
১৭।	গৌরহরি ভূঞ্যা	গোপাল ভূঞ্যা
১৮।	অদ্বৈত মণ্ডল	পরমেশ্বর মণ্ডল
১৯।	শ্রীকান্ত দাস	পরেশ দাস
২০।	অনিমেষ মণ্ডল	বঙ্কিম মণ্ডল
২১।	কানাইলাল পাত্র	হরিপদ পাত্র
২২।	সৌরসেন মাইতি	বলাই মাইতি
২৩।	অচিন্ত্য নাইয়া	শ্রীপতি নাইয়া
২৪।	ভাগ্যধর মাল	বরেন্দ্র মাল
২৫।	শ্রীমন্ত কুমার দাস	হরিহর দাস

কাকদ্বীপ

ক্রমিক নং	নাম	পিতা / স্বামীর নাম
১।	সমীর গায়েন	বাসুদেব গায়েন
২।	গোপাল ঘড়া	বঙ্কিম ঘড়া
৩।	নিতাই তুং	তরনী তুং
৪।	রতন দাস	সুধীর দাস
৫।	রাজু দাস	কৃষ্ণ দাস
৬।	শঙ্কর দোলই	অনিল দোলই
৭।	অমিত কুমার মান্না	সন্তোষ কুমার মান্না
৮।	রবীন সাঁতরা	পঞ্চানন সাঁতরা
৯।	হিরালাল দাস	হরিচরণ দাস
১০।	বিজয় দাস	মাহিন্দ্র দাস
১১।	চিত্তরঞ্জন দাস	চিন্তাহরণ দাস
১২।	মন্টু দাস	কালাচাঁদ দাস
১৩।	জয়ধন দাস	ভজেন্দ্র দাস
১৪।	কৈলাস দাস	অজিত দাস
১৫।	গঙ্গারানী দাস	স্বামী- সাগর দাস
১৬।	অশোক আড়ি	ভবেন আড়ি
১৭।	বাবলু আড়ি	ধনঞ্জয় আড়ি
১৮।	সবিতা কাঞ্জি	অশ্বিনী কাঞ্জি
১৯।	সন্ন্যাসী খাঁ	গুরুপদ খাঁ
২০।	জয়া রানী বর	স্বামী-ভগীরথ বর
২১।	গান্ধারী বর	স্বামী- শরৎ বর
২২।	শম্ভু চরণ বর	বিনোদ বর
২৩।	জয়দেব বাইচার	অভিরাম বাইচার
২৪।	হরিপদ বেরা	বঙ্কেশ বেরা
২৫।	গোপীনাথ মণ্ডল	সতীশ মণ্ডল

নামখানা

ক্রমিক নং	নাম	পিতা / স্বামীর নাম
১।	সেখ নেজাম	সেখ কিনু
২।	হিমাংশু ঘোড়ই	নরেন ঘোড়ই
৩।	লক্ষ্মণ জানা	ভগীরথ জানা
৪।	পাখী ডিঙ্গাল	স্বামী- নন্দ ডিঙ্গাল
৫।	পশুপতি দাস	গৌরহরি দাস
৬।	উত্তম নস্কর	প্রফুল্ল নস্কর
৭।	বিজয় প্রামাণিক	শ্যামাচরণ প্রামাণিক
৮।	গোপাল বেরা	প্রফুল্ল বেরা
৯।	কানাই বেরা	বিহারী বেরা
১০।	ননী রাম মণ্ডল	খগেন্দ্রনাথ মণ্ডল
১১।	গণেশ মণ্ডল	মহাদেব মণ্ডল
১২।	ভরত মাইতি	কুমোর মাইতি
১৩।	কাজল মাল	স্বামী- কার্ত্তিক মাল
১৪।	প্রতাপ মান্না	খগেন্দ্রনাথ মান্না
১৫।	রীনা বর	স্বামী- বাবলু বর
১৬।	বিশ্বনাথ শিট	শিব শিট
১৭।	অজয় সাহু	শ্রীদাম সাহু
১৮।	আনসুর আলি সেখ	উমর মহম্মদ সেখ
১৯।	জয়নাল সেখ	মইজুদ্দিন সেখ
২০।	বলরাম আদক	মাখন আদক
২১।	গৌরাঙ্গ গুড়িয়া	বিভূতি ভূষণ গুড়িয়া
২২।	আশীষ জানা	রবীন জানা
২৩।	সুকুমার জানা	অশ্বিনী জানা
২৪।	রেজ্জাক খাঁ	রফিক খাঁ
২৫।	সুকুমার গিরি	গোবর্ধন গিরি

সাগর

ক্রমিক নং	নাম	পিতা / স্বামীর নাম
১।	দীপক সিং	শুকদেব সিং
২।	রাধাগোবিন্দ মণ্ডল	ভূতেশ্বর মণ্ডল
৩।	দীপক রঞ্জিত	হরিপদ রঞ্জিত
৪।	গোবিন্দ দাস	শতদল দাস
৫।	অসিত দাস	রাসবিহারী দাস
৬।	বিশ্বজিৎ মণ্ডল	সত্যরঞ্জন মণ্ডল
৭।	প্রভাত মণ্ডল	ভূতনাথ মণ্ডল
৮।	গোপাল মণ্ডল	পরেশ মণ্ডল
৯।	অসীম মিদ্যা	সুধাংশু মিদ্যা
১০।	দেবব্রত দাস	একাদশী দাস
১১।	সেখ সাবীর আলি	সেখ মহম্মদ
১২।	বরুন বেরা	মেঘনাথ বেরা
১৩।	বুদ্ধদেব দাস	মুরারি দাস
১৪।	বুলা মাইতি	অশ্বিনী মাইতি
১৫।	পাঁচুগোপাল সাহু	সুদর্শন সাহু
১৬।	রাজারাম গিরি	দুলাল গিরি
১৭।	বাদল সাহু	কৃত্তিবাস সাহু
১৮।	তাপস কান্তি করণ	লক্ষ্মীনারায়ণ করণ
১৯।	তপন কুমার খাটুয়া	জহরলাল খাটুয়া
২০।	গোবর্ধন জানা	মথন জানা
২১।	কাঞ্চন কাজলী	স্বামী- জগদীশ কাজলী
২২।	নারায়ণ গুড়িয়া	করুনাময় গুড়িয়া
২৩।	অশোক গুড়িয়া	গুনধর গুড়িয়া
২৪।	রাধারানী গুড়িয়া	স্বামী- নারায়ণ গুড়িয়া
২৫।	সাবিত্রী দাস	স্বামী- তপন কুমার দাস

ক্যানিং, গোসাবা ও বাসন্তী

ক্রমিক নং	নাম	পিতা / স্বামীর নাম
১।	বিজয় সর্দার	কালো সর্দার
২।	সুজিত গায়েন	সমরেন্দ্র গায়েন
৩।	ভোলানাথ পাণ্ডে	হরিদাস পাণ্ডে
৪।	সঞ্জয় মৃধা	শুকদেব মৃধা
৫।	মুচিরাম সর্দার	জঙ্গলী সর্দার
৬।	জয়দেব খাটুয়া	সর্বেশ্বর খাটুয়া
৭।	দেবব্রত মণ্ডল	সুভাষ মণ্ডল
৮।	মনসুর মোল্লা	অসমত মোল্লা
৯।	কৃষ্ণপদ বিশ্বাস	নিত্যানন্দ বিশ্বাস
১০।	মোহন রায়	বিষ্ণু রায়
১১।	দীপক মণ্ডল	মোতি চন্দ্র মণ্ডল
১২।	গঙ্গাধর মণ্ডল	দুরন্ত মণ্ডল
১৩।	প্রফুল্ল সর্দার	ফিলিপ সর্দার
১৪।	রাম নস্কর	জিতেন নস্কর
১৫।	ছবিতা মাহাতো	স্বামী- দেবকুমার মাহাতো
১৬।	দুলাল দাস	মধু দাস
১৭।	শ্যামল মণ্ডল	ভোলা মণ্ডল
১৮।	শিবু মল্লিক	নারান মল্লিক
১৯।	বাপী সর্দার	পবন সর্দার
২০।	রসিদ ঢালী	জুলমদ ঢালী
২১।	বাবলু অধিকারী	বটকৃষ্ণ অধিকারী
২২।	অনাথবন্ধু অধিকারী	সনাতন অধিকারী
২৩।	যদুনাথ পাইক	কার্ত্তিক পাইক
২৪।	গোপাল নস্কর	সুরেন নস্কর
২৫।	রতিকান্ত পুরকাইত	ভরত পুরকাইত

২০০১ সালের জনগণনায় সুন্দরবন অঞ্চলের মোট তপশিলী উপজাতি জনসংখ্যা

ক্রম নং	ব্লক অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট মহিলা
১।	গোসাবা	২০৫৬০	১০৩১৬	১০২৪৪
২।	বাসন্তী	১৭৪৬২	৮৯৭৩	৮৪৮৯
৩।	ক্যানিং ১নং	৩০৭৫	১৫৩৬	১৫৩৯
৪।	ক্যানিং ২নং	১১৬৫৪	৫৯০০	৫৭৫৪
৫।	কুলতলি	৪৮৪৪	২৪৮৮	২৩৫৬
৬।	জয়নগর ১নং	১৪৫	৭৪	৭১
৭।	জয়নজর ২নং	৯৭৪	৫৩৭	৪৩৭
৮।	মথুরাপুর ১নং	৫৮৯	৩১৭	২৭২
৯।	মথুরাপুর ২নং	৩৩০৮	১৬৮৫	১৬২৩
১০।	পাথরপ্রতিমা	২৮৩৪	১৩৮৮	১৪৪৬
১১।	সাগর	৬৯১	৩৮৩	৩০৮
১২।	কাকদ্বীপ	১৯৪১	১০২৮	৯১৩
১৩।	নামখানা	৭১০	৩৫৭	৩৫৩
১৪।	সন্দেশখালি ১নং	৩৬৪৮৮	১৮৫৫২	১৭৯৩৬
১৫।	সন্দেশখালি ২নং	৩০২১৪	১৫৩২৩	১৪৮৯১
১৬।	হাসনাবাদ	৬০১২	৩০৮১	২৯৩১
১৭।	হিঙ্গলগঞ্জ	১০৪১৯	৫২৫৭	৫১৬২
১৮।	মিনাখাঁ	১৭৫৪৭	৮৯৬৯	৮৫৭৮
১৯।	হাড়োয়া	১০৯৬২	৫৬১২	৫৩৫০
	মোট	১,৮০,৪২৯	৯১,৭৭৬	৮৮,৬৫৩

সূত্রঃ- Census of India 2001, West Bengal, series 20, volume-II, Primary Census Abstract, P-83, 184, 185, 186, 192, 197, 198, 199, 200, 200, 2002.

২০১১ সালের জনগণনায় সুন্দরবন অঞ্চলের মোট তপশিলী উপজাতি জনসংখ্যা

ক্রম নং	ব্লক অঞ্চল	মোট জনসংখ্যা	মোট পুরুষ	মোট মহিলা
১।	গোসাবা	২৩৩৪৩	১১৭৬৬	১১৫৭৭
২।	বাসন্তী	২০০৬০	১০১৯০	৯৮৭০
৩।	ক্যানিং ১নং	৩৭১০	১৮৯১	১৮১৯
৪।	ক্যানিং ২নং	১৪৯১০	৭৫৪৪	৭৩৬৬
৫।	কুলতলি	৫৬৭২	২৯০২	২৭৭০
৬।	জয়নগর ১নং	৮০	৪৪	৩৬
৭।	জয়নজর ২নং	১০৪৬	৫৫৩	৪৯৩
৮।	মথুরাপুর ১নং	৪৯৬	২৪৪	২৫২
৯।	মথুরাপুর ২নং	৪৬৪৩	২৩৭৫	২২৬৮
১০।	পাথরপ্রতিমা	২৬৪০	১৩২৯	১৩১১
১১।	সাগর	৮৫৪	৪৫২	৪০২
১২।	কাকদ্বীপ	১৮৩৬	৯০৭	৯২৯
১৩।	নামখানা	৭৪১	৩৫৮	৩৮৩
১৪।	সন্দেশখালি ১নং	৪২৬৭৪	২১৬৩৫	২১০৩৫
১৫।	সন্দেশখালি ২নং	৩৭৬৯৫	১৮৯১১	১৮৭৮৪
১৬।	হাসনাবাদ	৭৪৯২	৩৭৮৬	৩৭০৬
১৭।	হিঙ্গলগঞ্জ	১১৭৪৩	৬৪১৪	৬৩২৯
১৮।	মিনাখাঁ	১৮৫৬৪	৯৪৫৮	৯১০৬
১৯।	হাড়োয়া	১২৭২৮	৬৫৩১	৬১৯৭
	মোট	২,১১,৯২৭	১,০৭,২৯০	১,০৪,৬৩৭

সূত্রঃ- Census of India 2011, Primary Census Abstract Report- 2011.

পরিশিষ্ট ৪

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিস অ্যাক্ট

রাজ্যে বহুসংখ্যক বহু মালিকানাধীন পুকুর এখনও পতিত/অর্ধপতিত রয়েছে অর্থাৎ যথোপযুক্ত ভাবে মাছ চাষের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে চলছে পুকুর ভরাট করে বাড়ি তৈরি বা কোন কাজে ব্যবহার করার প্রয়াস। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে কারণে প্রণয়ন করেছেন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিস অ্যাক্ট ১৯৮৪', এর পরবর্তীকালে আইনকে আরও বলিষ্ঠ করে সংশোধিত আইন। নীচে এই আইনের বিধি ও উপবিধি বিবৃত করা হল।

১। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিস অ্যাক্ট ১৯৮৪

বহু মালিকানাধীন জলাশয় যদি উপযুক্তভাবে রক্ষণাবেক্ষণ না করা হয় এবং যথাযথ ভাবে মাছ চাষ না করা হয় এই আইনের ৮ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ (মৎস্য দপ্তরের জেলার ভারপ্রাপ্ত সহ অধিকর্তা) জলশয়টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন কর্তৃক ২৫ বছরের জন্য নিয়ে নিতে পারবে। পরবর্তী সময়ে জলাশয়টিকে উক্ত কর্তৃপক্ষ মাছ চাষের জন্য রেজিস্ট্রিকৃত সংস্থাকে/গোষ্ঠীকে কমপক্ষে ১০ বছর মেয়াদ কালের জন্য ইজারা দেওয়ার ব্যবস্থা করবে।

২। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৯৩

এই সংশোধিত আইনের বলে ১৯৮৪ সালের আইনের সঙ্গে ১৭(ক) ধারা সংযোজিত হয়েছে। এই সংশোধিত আইনে কোন পুকুরের মালিকদেরকে জলাশয় খন্ডিকরণ বা ভরাট করা থেকে নিবৃত করা হয়েছে। নিষেধাজ্ঞাগুলি নিম্নরূপ— ১) পঞ্চায়েত এলাকায়/শহরাঞ্চলে/পৌরসভা অন্তর্গত অঞ্চলে যে কোন পরিমাণ জলা ভরাট করা যাবে না। ২) রেকর্ডভূক্ত পুকুর/ডোবা না হয়ে

যদি স্থানটি কেবল নীচু জমি হয় এবং বছরের ছয় মাসের অধিক সময় জলধারণ করে থাকে তবে সেই জমিও ভরাট করা যাবে না। ৩) কোন বড় জলাশয়কে কৃত্রিমভাবে বাঁধ দিয়ে যে কোন মাপের জলাশয়ে বিভক্ত করাও নিষিদ্ধ। ৪) জলশয়টি কেবলমাত্র মাছচাষের জন্য ব্যবহার করা যাবে, অন্য কোনভাবে নয়। কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিরা যদি আইন লঙ্ঘন করে জলাশয়টি ভরাট করে তবে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ এই আইনের ২ নং উপধারা অনুযায়ী আইন ভঙ্গকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যা জামিন অযোগ্য বলে আইনে উল্লেখ করা আছে। আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত দণ্ডবিধানের অধিকারী, যেমন— ক) আইন ভঙ্গকারীকে নিজ ব্যয়ে জলাশয়টি আবার সংস্কার করে দিয়ে ভরাট করার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে। খ) জলাশয়টিকে পূর্বাবস্থায় সংস্কার করে ফিরিয়ে না আনলে কর্তৃপক্ষ জলাশয়টির নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের দায়িত্ব নিয়ে নেবে এবং সংস্কার সাধন করবে। সংস্কারের ব্যয় জলাশয়ের মালিককে বাধ্যতামূলক ভাবে বহন করতে হবে। গ) জলাশয়টি সংস্কারের পর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ মাছ চাষের জন্য মৎস্য উৎপাদক গোষ্ঠীকে দীর্ঘমেয়াদের (অনুমান ১০ বছর) ইজারা দিতে পারবে। এই আইন লঙ্ঘনকারী ব্যক্তি দোষী প্রমাণিত হলে শাস্তি হিসেবে ২ বছরের জন্য কারাবাস অথবা অনধিক ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে।

৩। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৯৭

এই সংশোধনী বলে ১৯৮৪ সালের আইনের ১৭(ক) ধারার সঙ্গে ১২ নং উপধারা সংযোজিত হয়েছে। এই সংশোধনী অনুসারে পঞ্চায়েত এলাকায় ৫ কাঠা বা তার বেশি মাপের পুকুর/ ডোবা/জলাভূমি ভরাট করার অপরাধকে জামিন অযোগ্য আদালত গ্রাহ্য অপরাধ বলে গণ্য করা

হবে। কিন্তু শহরাঞ্চলে যে কোন পরিমাণ জলা ভরাট করা অপরাধ ও উক্ত আইনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইনল্যান্ড ফিশারিস (অ্যামেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট ১৯৯৮

এই সংশোধিত আইনের বলে ১) কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ নদী, খাল, বিল এবং জলাশয়ে ১২ মিমি বা তার কম ফাঁসের জাল বছরের যে কোন সময়ে মাছ ধরার জন্য ব্যবহার করতে পারবে না। ২) নদী বা প্রবাহমান জলে মাছ সংরক্ষণের জন্য বছরের ১৫ই জুন থেকে ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৫ মিমি বা তার কম ফাঁসের জাল উক্ত প্রবাহমান জলে ব্যবহার করা যাবে না। ৩) প্রবাহমান জলে বা খাস জলাশয়ে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত সংস্থার নিকট থেকে যথাযথ অনুমতি ছাড়া ছিপ দ্বারা কোন মাছ ধরতে পারবে না। ৪) কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ ৩৫ সেমি কম মাপের কিংবা ১ কিলোগ্রাম কম ওজনের বা ১.৫ বছরের কম বয়সের মাছ প্রজনন করাতে পারবে না। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নীরিক্ষার ক্ষেত্রে এই আইনের ছাড় দেওয়া হয়েছে। ৫) একমাত্র ৫০ মিমি বা ১০০ মিমি মাপের বাটি, মাছের ডিমপোনা বিক্রির জন্য ব্যবহার করা যাবে। অন্য কোন মাপ আইন বিরুদ্ধ।

পশ্চিমবঙ্গ মৎস্য উৎপাদক লাইসেন্স ১৯৯৪

এই সংশোধিত আইনের বলে ১) মিঠা জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ৫ হেক্টর বা ৩৭.৫ বিঘা পর্যন্ত জলাশয় থাকলে মৎস্য উৎপাদক লাইসেন্সের আওতায় আসবে না। কিন্তু ৫ হেক্টরের বেশি জলাশয় থাকলে সেই ক্ষেত্রে মৎস্য উৎপাদককে এককালীন একর প্রতি ৫০ টাকা হারে লাইসেন্স ফী জমা দিতে হবে। ২) ময়লা জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে একর প্রতি ৫০ টাকা হারে লাইসেন্স ফী

জমা দিতে হবে। ৩) নোনা জলে মাছ চাষের ক্ষেত্রে ৫ একর পর্যন্ত একর প্রতি ৫০ টাকা হারে মৎস্য উৎপাদক লাইসেন্স ফী জমা দিতে হবে। কিন্তু ৫ একরের উর্ধ্বে প্রতি একর ২০০ টাকা হারে উৎপাদক লাইসেন্স ফী জমা দিতে হবে। ৪) প্রাপ্ত লাইসেন্স প্রতি বছর নভেম্বর মাসে নবীকরণ করতে হবে। অন্যথায় ৫০ টাকা হারে জরিমানা ধার্য করা হবে। ৫) অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন (১৯৫৫) অনুযায়ী বিনা লাইসেন্সে মৎস্য চাষ করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। এই ক্ষেত্রে জামিন অযোগ্য জেল/জরিমানা হতে পারে।

সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জন্য আন্তর্জাতিক ভারতীয় সমুদ্র জলসীমা সংক্রান্ত বিশেষ সতর্কীকরণের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের জানানো যাচ্ছে যে, বর্তমানে অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক ভারতীয় সমুদ্র জলসীমা অতিক্রম করে বাংলাদেশের জলসীমাতে প্রবেশ করে মাছ ধরার প্রবণতা ক্রমশ বেড়ে চলেছে, যা ভারতীয় আইনবিধি এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী দণ্ডনীয় অপরাধ। মৎস্য দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক বারবার নিষেধ করা সত্ত্বেও মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশের জলসীমায় অবৈধভাবে প্রবেশ করে চলেছেন। সহ মৎস্য অধিকর্তার করন, (সামুদ্রিক) ডায়মন্ড হারবার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা কর্তৃক পুনরায় সকল মৎস্যজীবীদের উদ্দেশ্যে জানানো যাচ্ছে যে, যারা অবৈধভাবে বাংলাদেশের জলসীমাতে প্রবেশ করবেন তাদের প্রতি ভারতীয় আইনবিধি এবং সামুদ্রিক মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে শাস্তি দেওয়া হবে যা তারা মানতে বাধ্য থাকবেন।

এতদ্বারা সকল যন্ত্রচলিত নৌকার মালিক ও মাঝিদের অনুরোধ জানানো যাচ্ছে যে ভারতীয় সমুদ্র জলসীমা সুনির্দিষ্ট করে তার অধীনে থেকে মাছ ধরার জন্য তারা যেন তাদের নৌকার জি পি

এস যন্ত্রটিকে সর্বক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত অক্ষ্যাংশ ও দ্রাঘিমাংশ অনুযায়ী সেট করে রাখেন এবং যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

সীমানা	অক্ষ্যাংশ (Latitude)	দ্রাঘিমাংশ (Longitude)
স্থল সীমার জন্য-১	২১°৩৮'৪০.২"N	৮৯°০৯'২০.০"E
জল সীমার জন্য-২	২১°২৬'৪৩.৬"N	৮৯°১০'৫৯.২"E
জল সীমার জন্য-৩	২১°০৭'৪৪.৮"N	৮৯°১৩'৫৬.৫"E

নিজেদের জীবনকে সুরক্ষিত রেখে নদী/সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে নিযুক্ত থাকার জন্য সকল মৎস্যজীবীদের আহ্বান করা হচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গের সামুদ্রিক মৎস্য শিকারের জন্য নির্ধারিত আইন ও তার প্রয়োগবিধি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বিষয়

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল রেখা ১৫৮ কিমি। এই উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর পশ্চিমবঙ্গ সামুদ্রিক মৎস্য শিকার নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯৩ এবং ঐ আইনের প্রয়োগবিধি ১৯৯৫ ও সংশোধিত প্রয়োগবিধি ১৯৯৮ ও ২০১৩ এর আইন ও তার প্রয়োগবিধির জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হল।

সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে নিযুক্ত নৌকা রেজিষ্ট্রিকৃত করার নিয়মাবলী

১) সহ মৎস্য অধিকর্তা, ডায়মন্ড হারবার মেরিন অফিস থেকে আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফর্ম–E. Reg Form-I & II

রেজিষ্ট্রেশন ফিঃ ক) ৩০ হর্সপাওয়ার পর্যন্ত ক্ষমতাবিশিষ্ট যন্ত্রচালিত নৌকার জন্য– ৩০/- (তিরিশ) টাকা। খ) ৩০ হর্সপাওয়ারের বেশি ক্ষমতাবিশিষ্ট যন্ত্রচালিত নৌকার জন্য- ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা। গ) হস্তচালিত নৌকার ক্ষেত্রে কোনো রেজিষ্ট্রেশন ফি লাগে না।

২) দেশী অথবা যন্ত্রচালিত নৌকার আকার আকৃতি অথবা ইঞ্জিনের কোন প্রকার পরিবর্তন করতে হলে আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফর্‌ম– MFR– 7

৩) দেশী অথবা যন্ত্রচালিত নৌকার মালিকানা পরিবর্তন করতে হলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফর্ম- MFR– 5 ও MFR- 4

৪) বিনা রেজিষ্ট্রেশনের দেশী এবং যন্ত্রচালিত নৌকার দ্বারা মৎস্য শিকার করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

সামুদ্রিক মৎস্য শিকারে নিযুক্ত নৌকার লাইসেন্স গ্রহণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী

প্রতি বছর মৎস্য শিকারে নিযুক্ত নৌকাগুলির লাইসেন্স পাইবার জন্য সহ মৎস্য অধিকর্তা, ডায়মন্ড হারবার মেরিন অফিস থেকে আবেদনের জন্য নির্ধারিত ফর্ম- MFR– 8

লাইসেন্স ফিঃ ক) ৩০ হর্সপাওয়ার পর্যন্ত- ৩০ (তিরিশ) টাকা প্রতি বছর। খ) ৩০ হর্সপাওয়ার উর্দ্ধে– ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা প্রতি বছর। গ) দেশী যন্ত্রবিহীন নৌকার জন্য কোন লাইসেন্স ফি লাগবে না। কিন্তু লাইসেন্স অবশ্যই করতে হবে। জরিমানার হার- ক) ৩০ হর্সপাওয়ার পর্যন্ত যন্ত্রচালিত নৌকার জন্য– ৩০ (তিরিশ) টাকা প্রতি মাস। খ) ৩০ হর্সপাওয়ারের বেশি ক্ষমতাবিশিষ্ট যন্ত্রচালিত নৌকার জন্য– ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা প্রতি মাস। বিনা রেজিষ্ট্রেশন এবং বিনা লাইসেন্সে দেশী এবং যন্ত্রচালিত নৌকার দ্বারা সমুদ্রে, নদী ও খাঁড়িতে মৎস্য শিকার দণ্ডনীয়

অপরাধ বলে গণ্য হবে। সমুদ্রে শিকারের নৌকার মৎস্যজীবী ও নৌকা/সরঞ্জামের নিরাপত্তা নির্দেশিকা- ১) নৌকাতে Wireless, DAT, GPS, Compus, Mobile Phone ও ট্রানজিস্টার রেডিও সেট থাকা বাধ্যতামূলক। ২) নৌকার প্রত্যেক আরোহীর জন্য একটি করে লাইফ জ্যাকেট। ৩) প্রতি নৌকায় দুটি করে লাইফ বয়া। ৪) ইঞ্জিন ঘরে অগ্নি নির্বাপণের ব্যবস্থা রাখা। ৫) তল্লাশি ও উদ্ধার কার্যের জন্য একটি ট্রান্সপন্ডার (SART)। ৬) মৎস্য শিকারে যাওয়ার পূর্বে লগবুক (LOG BOOK) যথাযথ পূরণ করা এবং মাছ ধরে ফেলার পরে তাতে ফেরার খবর।

মৎস্য শিকারে নিষেধাজ্ঞা

এই আইনের বলে ক) ২৩ সেন্টিমিটারের কম দৈর্ঘ্যের ইলিশ মাছ শিকার, অধিকারে রাখা ও বাজারজাতকরণ ও পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা জারি আছে। খ) ৯০ মিলিমিটারের কম মাপের কোন প্রকার ফাঁস জাল ব্যবহার করে ইলিশ মাছ ধরা যাবে না। গ) প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত সময়ে ইলিশের পরিযায়ী পথের উপর থেকে জাল, সংগ্রাহক জাল, ছোট মাপের ফাঁস জাল প্রভৃতি ব্যবহার করা যাবে না। ঘ) ভারত সরকারের সামুদ্রিক মৎস্য শিকার আইন অনুযায়ী প্রতি বছর ১৪ই এপ্রিল থেকে ১৪ই জুনের মধ্যে সমুদ্র বা নদীতে মৎস্য শিকার আইনত নিষিদ্ধ। ঙ) প্রজনন ও বংশবৃদ্ধির সহায়তার কারণে নিষেধাজ্ঞা প্রতি বছর ১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে অক্টোবর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পূর্ণিমার পাঁচ দিন আগে পরে ইলিশ ধরা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। চ) বাসস্থান সুরক্ষা সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা- ইলিশ মাছকে বাঁচিয়ে রেখে তাদের বংশবৃদ্ধির প্রক্রিয়া সুনিশ্চিত করতে উপকূলের বারোটি নটিকাল মাইল পর্যন্ত মহাদেশীয় ঢালে তলদেশীয় ট্রলিং বা টানা জাল ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (১ নটিকাল- ১৮৫২ মিটার বা ৬০৮০ ফুট) মৎস্য শিকারে নিয়োজিত নৌকার মালিকগণকে সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের “পশ্চিমবঙ্গ সামুদ্রিক মৎস্য

শিকার নিয়ন্ত্রণ আইন ও নিয়মাবলী” মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ক) নৌকার ওরিজিনাল রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স ছাড়া কোন শিকারের নৌকা মৎস্য শিকারে পাঠাবেন না। খ) মৎস্যজীবীদের সচিত্র পরিচয় পত্র (বায়োমেট্রিক আইডেনটিটি কার্ড) ব্যতীত মৎস্য শিকারে যাওয়া নিষিদ্ধ। গ) দুর্ঘটনা জনিত জীবনবীমা সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের বাধ্যতামূলক ভাবে করতে হবে। ঘ) সমুদ্রে মৎস্য শিকারে যাওয়ার সময়ে নৌকা ও সরঞ্জামের জন্য নিরাপত্তার নির্দেশিকা আবশ্যিক ভাবে পালন করতে হবে। ঙ) মৎস্য শিকারের নৌকার মৎস্যজীবী , নৌকা ও সরঞ্জামের জন্য নিরাপত্তার নির্দেশিকা আবশ্যিক ভাবে পালন করতে হবে। চ) রেজিষ্ট্রিকৃত যন্ত্রচালিত নৌকাগুলির কেবিনঘর ও ইঞ্জিনঘর কমলা রঙের । শীর্ষদেশ ঘন কমলা রঙের এবং তলদেশ কালো রঙের অবশ্যই করতে হবে। ছ) রেজিষ্ট্রিকৃত যন্ত্রচালিত নৌকাগুলির কেবিনের দুইপাশে ছাদের নীচে কালো রঙ দিয়ে ৬ ইঞ্চি সাইজের ইংরেজি হরফে রেজিস্ট্রেশন নম্বর লিখতে হবে এবং গলুই-এর দুপাশে ডালির নীচে অনুরূপ ভাবে নৌকার নাম লিখতে হবে। একই সাথে প্রত্যেকটি নৌকায় ভারতের জাতীয় পতাকা এঁকে রাখতে হবে। জ) বরাদ্দকৃত যন্ত্রটি সবসময় মৎস্য শিকারের নৌকায় রাখতে হবে এবং যন্ত্রটি কোন অবস্থাতেই প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহার নিষিদ্ধ। ঝ) সচিত্র পরিচয়পত্র (বায়োমেট্রিক আইডেনটিটি কার্ড), মৎস্য শিকারের নৌকার রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স এর জন্য সহ-মৎস্য অধিকর্তা (মেরিন) ডায়মন্ড হারবার- এর কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। ঞ) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তরের আদেশ নম্বর- 2784-Fish/e-vl 8T- 2/04 তাং ২৯/১২/২০১০ মোতাবেগ পশ্চিমবঙ্গ সমুদ্র উপকূলে মাছ ধরার জন্য প্রত্যেক বোটের জলবীটের উপরের অংশ কমলা এবং জলবীটের অংশ কালো রং করে মোটা এবং বড় অক্ষরে রেজিস্ট্রেশন নং লিখতে হবে যাতে উপর থেকে নিরাপত্তা রক্ষাকারীদের নজরে আসে।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রাথমিক উপাদান

Archival Source

Land Revenue Administration of Bengal, Land and Land Revenue, Department, Government of West Bengal, West Begal State Archive, Kolkata.

Official Reports

Administrative Report 2008-09, Sundarban Affairs Department, Government of West Bengal, Mayukh Bhavan, kolktata.

Annual Report, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Salt Lake, Kolkata.

Annual Administrative Report 2004-05. Sundarbans Development Board, Government of West Bengal, Mayukh Bhavan, Kolkata.

Annual Fishery Administrative Report, Meen Bhavan, Kolkata.

A Note on Fisheries in Sundarbans, Government of West Bengal, Department of Land and Land Revenue, 1958, Annex Building, Alipore.

Ascoli F D, A Revenue History of the Sundarbans 1870-1920, Calcutta: The Bengal Secretariat Book Depot, 1921.

Census Reports of 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011, Annex Building, Alipore, Kolkata.

De Barun, West Bengal District Gazetteers, South 24 Parganas, Government of West Bengal, March 1994.

Evaluation of Fish Farmers Development Agency Schemes in West Bengal, 1990, Part-I, Indian Statistical Institute, Calcutta.

Gupta K. G., Reports on the Results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into fishery Matters in Europe and America, The Bengali Secretariat Book Depot, 1908.

Hand Book of Fisheries Statistics 2017-18, 2016-17, 2014-15, 2013-14, 2012-13, 2009-10, 2004-05, 2003-04, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Salt Lake, Kolkata.

Hunter W. W, A Statistical Account of Bengal 24 Parganas and Sundarbans, Vol-1, London: Trubner and Company, 1875.

Lahiri Anil Chandra, Final Report on the Survey and Settlement Operation in the District of 24 Parganas, Calcutta, 1936.

Mukherjee Dr. Anuradha (Ed.), Sundarban Wetlands, Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours, Government of West Bengal, Kolkata, 2007.

O'Malley L S S, Eastern Bengal District Gazetteer: 24 Paraganas, Calcutta, 1914.

Report form Department of Sundarban Affairs, Government of West Bengal.

Report of Housing for Fishermen in West Bengal, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, North 24 Parganas.

Report of Government Scheme for Fishermen in Sundarban, Department of Fisheries, Government of West Bengal, Meen Bhawan, Barasat, North 24 Parganas.

Report of Fisheries Department, District Magistrate, South 24 Parganas, Office of B. D. O., Patharpratima.

Saha Dr. K C, Fisheries of West Bengal, Superintendent, Government Printing, Alipore: West Bengal Government Press, 1970.

Southwell T, Certain Facts Relating to the Fisheries of Bengal, and Bihar and Orissa, Annex Building, Alipore, Kolkata.

The Imperial Gazetteer of India: Provincial Series, Bengal, Vol-I, Calcutta: Superintendent of Government Printing, 1909.

সরকারি কার্যবিবরণী (Proceedings)

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Thirty Fifth Session, February-April, 1963, Vol- XXXV—No. 2, Alipore, West Bengal Government Press, 1963.

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Thirty Six Session, July-September, 1963, Vol-XXXVI—No. 1, Alipore, West Bengal Government Press, 1963.

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Thirty Nine Session, July-October, 1964, Vol-XXXIX—No. 1, Alipore, West Bengal Government Press, 1964.

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Fortith Session, February-May, 1965, Vol-XL—No. 3, Alipore, West Bengal Government Press, 1965.

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Forty First Session, November-January, 1965-1966, vol-XLI—No. 3, Alipore, West Bengal Government Press, 1966.

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Forty Third Session, August-September, 1966, Vol-XLIII, Alipore, West Bengal Government Press, 1966.

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Forty Second Session, February-Maech, 1966, Vol-XLII—No. 2, Alipore, West Bengal Government Press, 1966.

Assembly Proceedings (Official Report): West Bengal Lagislative Assembly, Eighty Eight Session, June-July, 1987, Vol- 88, No. III, Alipore, West Bengal Government Press, 1987.

দৈনিক সংবাদপত্র

আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগান্তর, এই সময়, গণশক্তি, সেচপত্র, দি স্টেটসম্যান, দ্য হিন্দু, যোজনা মাসিক পত্রিকা, দিনদর্পন পত্রিকা।

সহায়ক উপাদান ইংরাজি

Agarwal Dr. Satish Chandra, History of Indian Fishery, Delhi: Daya Publishing House, 2006.

Arnold David and Ramachandra Guha (Ed.), Nature, Culture, Imperialism: Essays on the Environmental History of South Asia, Delhi: Oxford University Press, 1995.

Banerjee Anuradha, Environment Population and Human Settlements of Sundarban Delta, New Delhi: Concept Publishing Company, 1998.

Bagchi K, The Ganges Delta, Calcutta: Calcutta University Press, 1944.

Bal D V, and K V Rao, Marine Fisheries of India, New Delhi: Tata McGraw Hill, 1990.

Bandyopadhyay Sekhar (Ed.), Bengal: Rethinking History, Essay in Historiography, New Delhi: Manohar, ICBS Publications, 2001.

Barman Rup Kumar, Fisheries and Fishermen A Socio-economic History of Fisheries and Fishermen of Colonial and Post-Colonial West Bengal, Delhi: Abhijit Publication, 2008.

Basu M N, Economic Adjustment and Suggestions for Improvement of Fish, Fishing and Fishermen in a Bengali Village, The Calcutta Review, March 1946.

Bhattacharyya Amit, Sarkar Mahua (Edited), History And The Changing Horizon, Science, Environment, and Social System, Kolkata: Setu Prakashani, September 2014.

Biswas K P, Text Book of Fish, Fisheries and Technology, Delhi: Narendra Publication, 1990.

Bose A N, et al. (ed.), Coast Zone Management o f West Bengal, Kolkata: Sea Explorers Institute, 1989.

Chandy M, Fishes, New Delhi: National Book Trust, 1970.

Chakrabarti N C, The Problems of (1) Small Agricultural Holdings in Bengal and (2) Improvement of Fisheries in Bengal, Government of Bengal, Board of Economic Enquiry, Publication No. 7 (B), Calcutta: Bengal Government Press, 1939.

Chakrabarty Prafulla, The Marginal Men: The Refuges and the Left Political Syndrome in West Bengal, Kalyani: Lumiere Books, 1990.

Chakrabarti Ranjan, Taming the Man-eaters of the Sundarbans 1880-1947, Visva Bharati Annals: New Series, April 2004.

………………………………: Local People and Global Tiger: An Environmental History of Sundarbans, http://www.globalenvironment.it/CHAKRABARTI.pdf., last visited 20/02/2022.

Chattapadhyay Haraprasad, The Mystery of the Sundarbans, Calcutta: A Mukherjee & Co PVT Ltd, , 1999.

Chatterjee Biswajit and Debi Chatterjee (Ed.), Dalit Lives and Dalit Visions in Eastern India, Kolkata: Centre for Rural Resource, 2007.

Chatterjee Jaya, The Spoils of Partition: Bengal and India 1947-1967, New York: Cambridge University Press, 2007.

Choudhury Tanmay, The Sundarbans, The Hinterland of Wilderness, Kolkata: Charchapada, 2011.

Das Amal Kumar, Sankarananda Mukherjee and Manas kamal Chowdhuri (Ed.), A focus on Sundarban, Calcutta: Edition Indians, 1981.

Das Gautam Kumar, Hazards and Livelihoods of the Sundarbans, Kolkata: Sopan Publisher, 2018.

Das T C, The Cultural Significance of Fish in Bengal, Man in India, Vol 11, Ranchi, 1931, Pp- 275-303.

.................: The Cultural Significance of Fish in Bengal, Man in India, Vol 12, Ranchi, 1932, Pp- 96-115.

Day F, The Fishes of India, New Delhi: Today and Tomorrow Book Agency, (Reprint), 1971.

Dey Surjendu, Fishermen of the Coastal District of Bengal, Kolkata: Purushottam Publishers, 2012.

Fraser T M, Rusembilan: A Malay-Fishing Village in Southern Thailand, New York: Cornell University Press, 1962.

Firth R, Malay-Fishermen: Their Peasant Economy, London: Trubner and Co, 1946.

Guha Bakshi D N, P Sanyal and K R Naskar, Sundarbans Mangal, Calcutta: Naya Prokash, June 1999.

Guha Bakshi D N and K R Naskar, Mangrove swamps of the Sundarbans -An ecological perspective, Kolkata: Naya Prokash, 1987.

Guha Ramachandra and Madhav Gadgil, This Fissured Land: An Ecological History of India, Delhi: Oxford University Press, 1993.

Gupta K G, Reports on the Results of Enquiry into the Fisheries of Bengal and into fishery Matters in Europe and America, Calcutta: The Bengali Secretariat Book Depot, 1908.

Guha Ramachandra, Environmentalism: A Global History, London: Longmans Publications, 2000.

Gupta V K, Marine Fish Marketing in India (Vol-6), Ahmedabad: Indian Institute of Management, 1984.

Ghoshal Anindita, Refugees Boarder and Identities: Rights and Habitat in East and Northeast India, South Asian Edition, Routledge, 2021.

Ghosh Asish, Environmental Conservation Challenges & Actions, New Delhi: APH Publishing Corporation, 2008.

Hamilton B, An Account of the Fishes found in the River Ganges and its Branches, Edianburg, 1882.

Hora S L, Mud-Fishing in Lower Bengal, Journal of the Asiatic Society of Bengal, No. XXVIII, Kolkata, 1932.

……………………: Ancient Hindu Conception of Correlation between form and Locomotion of Fishes, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 3rd Series, Vol-I, 1935.

…………………: Knowledge of the Ancient Hindus Concerning Fish and Fisheries of India, Journal of the Royal Asiatic Society of Bengal, Science Vol-XIV, No-1, 1954.

………………: Symposium of Hilsa and its Fisheries, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Science, Vol-XX, No-1, 1954.

Hunter W W, A Statistical Account of Bengal District of the 24 Parganas and Sundarbans, Vol-I, London: Trubner and Company, 1875.

Jalais Annu, Forests of Tigers: People, Politics and Environment in the Sundarbans, New Delhi: Routledge, 2010.

Jhingran V G, Fish and Fisheries of India, Delhi: Hindustan Publishing Corporation, 1982.

Kanjilal Tushar, Who Killed the Sundarbans? Kolkata: Tagore Society for Rural Development, 2000.

Klausen A M, Kerala Fishermen and Indo Norwegian Pilot Project, London: Allen and Unwin, 1968.

Mandal A K and N C Nandi, Fauna of Mangrove Ecosystem, West Bengal, India: Zoological Survey of India, 1989.

Mitra A, The Tribes and Caste of Bengal, Alipore, Calcutta: Government of West Bengal Press, 1953.

Mukherjee R, The Changing Face of Bengal: A Study in Riverine Economy, Calcuuta: University of Calcutta, 1938.

Mukherjee Dr. Madhumita (Ed.), Sunderbna Wetlands, Department of Fisheries, Aquaculture, Aquatic Resources and Fishing Harbours, Govt. of West Bengal, 2007.

Nandi N C, S R Das, S Bhuinya and J M Dasgupta, Wetland Faunal Resources of West Bengal.I. North and South 24-Parganas District, Calcutta: Zoological Survey of India, August 1993.

O'Malley L S S, Eastern Bengal District Gazetteer: 24 Paraganas, Calcutta: Bengal Secretariat Book Depot, 1914.

Pargiter Frederick Eden, A Revenue History of the Sundarbans, Vol-I (From 1765-1870), West Bengal District Gazetteers, Government of West Bengal, Higher Education Department, Bikash Bhavan, Kolkata, 2002.

Pramanik S K, Fishermen Communities of Coastal Villeges of West Bengal, Jaipur: Rawat Publication, 1993.

Pramanik S K and N C Nandi, Women Fisherworkers and their Role in the Inshore Fishing Areas of Sundarbans, Man in India, Ranchi, 2001.

........................: Women Dry Fisherworkers in Sundarban- A Look into Working Sprite and Level of Involvement, Man in India, Ranchi, 2004.

........................: Indegenous Knowledge of Fisherfolk of Coastal Sundarban, Folklore Research Journal, 2005.

Pokrant Bob, Peter Reeves and John McGuire, Bengal Fisher and Fisheries: A Historiographic Essay, Sekhar Bandyopadhyay (Ed.), Bengali: Rethinking History, Essay in Historiography, New Delhi: Manohar, International Centre For Bengal Studies, 2001.

Reeves Peter, Inland Waters and Freshwater Fisheries: Some Issues of Control, Access and Conservation in Colonial India, Arnold David and Ramachandra

Guha (Ed.), Nature Cilture Imperialism: Essays on the Environmental History of South Asia, Delhi: Oxford University Press, 1995.

Roychaudhuri Bikash, The Moon and the Net: Study of a Transient Community of Fishermen at Jambudwip, Calcutta: Anthropological Survey of India, 1980.

................: Some Fishing Communities of Bengal, 49 (3), Pp- 241-246, Man in India, Ranchi, 1969.

Risley H H, The Tribes and Castes of Bengal, Vol-I & II, Calcutta: Bengal Secretariat Press, 1891 & 1892.

Saha K C, Fisheries of West Bengal, Alipore, Calcutta: West Bengal Government Press, 1970.

Samanta Suman Kalyan, Community and Change of the Traditional Fishing Communities: A Study of Purba Medinipur Coast, New Delhi: Aayu Publications, 2022.

Sarkar Mahua (Ed.), Environment and History Recent Dialogues, Delhi:Kalpaz Publications, 2008.

Sarkar Sutapa Chatterjee, The Sundarbans Folk Deities, Monsters and Mortals, New Delhi: Orient BlackSwam, 2010.

Sharma B C, Lower Sundarban: Role of Fisheries in its Sustainable Development, Calcutta: The Asiatic Society, 1994.

Srivastava U K and M Dharma Reddy, Fisheries Development in India. New Delhi: Concept Publishing Company, 1983.

Talwar P K and R K Kacker, Commercial Sea Fishes of India, Kolkata: Zoological Survey of India, 1984.

Webester J E, Easter Bengal and Asam District Gazetteers, Noakhali, Allahabad: Pioneer Press, 1911.

Yadav B N, Fish and Fisheries, Delhi: Daya Publishing House, 1993.

<u>সহায়ক উপাদান বাংলা</u>

আহমেদ রাজিব সম্পাদিত, সুন্দরবনের ইতিহাস (প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড), ঢাকা: গতিধারা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১২।

কাঞ্জিলাল তুষার, সুন্দরবনের গপ্পোসপ্পো, কলকাতা: আজকাল প্রকাশন, এপ্রিল ২০১৬।

কুন্ডু সুরেশ, সুন্দরবন অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ, কলকাতা: নান্দনিক পাবলিকেশন, জানুয়ারি ২০১৯।

গুড়িয়া মহাদেব, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সমগ্র, কলকাতা: পাণ্ডুলিপি, ২০১৩।

গুহ বুদ্ধদেব, বনবিবির বনে, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, অক্টোবর ১৯৯৫।

ঘোষ অমিতাভ, ভাটির দেশ, অনুবাদ অচিন্ত্যরূপ রায়, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, সেপ্টেম্বর ২০১৬।

ঘোষাল ইন্দ্রাণী, সুন্দরবনের মৎস্যজীবীদের জীবন, তাদের লোকসংস্কৃতি এবং লোকসাহিত্য, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, জুলাই ২০০৬।

ঘোষ তারাপদ সম্পাদিত, পশ্চিমবঙ্গ দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা সংখ্যা, কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬।

ঘোষ পূর্ণেন্দু, ইতিহাসের আলোকে সুন্দরবন ও পোর্টক্যানিং, কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, ২০১৭।

ঘোষ প্রভাত কুমার, গঙ্গারিডি ও বিঙ্গভূমি, কলকাতা: জে এস প্রকাশনী, ১৯৮৮।

চট্টোপাধ্যায় সাগর, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার পুরাকীর্তি, প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৫।

চৌধুরী কমল, চব্বিশ পরগণা উত্তর দক্ষিণ সুন্দরবন, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ডিসেম্বর ১৯৯৯।

.....................: উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭।

.....................: দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত, কলিকাতা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৭।

চক্রবর্তী গৌরাঙ্গ, কাকদ্বীপে তেভাগার লড়াই, কলকাতা: সেরিবান, ডিসেম্বর ২০০৪।

চক্রবর্তী রঞ্জন ও ইন্দ্র কুমার মিস্ত্রী, সুন্দরবনের অর্থনীতি জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ, কলকাতা: রীসা রিডার্স সার্ভিস, জানুয়ারি ২০০৭।

চক্রবর্তী প্রফুল্লকুমার, প্রান্তিক মানবঃ পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তুজীবনের কথা, কলকাতা: প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস্ প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৭।

চক্রবর্তী সত্যরঞ্জন, স্বাধীনতা উত্তর পশ্চিমবঙ্গ ১৯৫০-২০১১, কলকাতা: শ্রীময়ী প্রকাশনী, ২০১৫।

জলিল এ এফ এম আব্দুল, সুন্দরবনের ইতিহাস, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, জানুয়ারি ২০১৪।

জলিল এ এফ এম আব্দুল, সুন্দরবনের ইতিহাস, কলকাতা: নয়া উদ্যোগ, ২০০০।

জানা ডঃ মণীন্দ্রনাথ, সুন্দরবনের সমাজ ও সংস্কৃতি, কলকাতা: দীপালি বুক হাউস, জানুয়ারি ১৯৮৪।

জানা দেবপ্রসাদ সম্পাদিত, শ্রীখণ্ড সুন্দরবন, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, নভেম্বর ২০০৪।

তুষার কাঞ্জিলাল, সুন্দরবনের সাতকাহন, কলকাতা: কৃতি, জানুয়ারি ২০১৯।

দত্ত কালিদাস, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার অতীত, (প্রথম খন্ড ও দ্বিতীয় খন্ড), বারুইপুর: সুন্দরবন সংগ্রহশালা, মার্চ ১৯৮৯।

দত্ত সৌমেন, প্রেক্ষাপট সুন্দরবন, কলকাতা: আজকাল, জানুয়ারি ২০১০।

দাস গোকুল চন্দ্র, চব্বিশ পরগণার আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি, কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, নভেম্বর ২০০৪।

দাস ডঃ নির্মলেন্দু, সুন্দরবনের লোকসংস্কৃতি, কলকাতা: জ্ঞান প্রকাশন, ১৯৯৬।

দাস গৌতম কুমার, কথা সুন্দরবন, কলকাতা: সোপান, ২০১৮।

দাস মলয়, সুন্দরবনের জনজীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী, এপ্রিল ২০১১।

দাস শশাঙ্ক শেখর, বনবিবি, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, কলকাতা: তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, মার্চ ২০০৪।

দাশ শচীন, জল জঙ্গল ও জনজীবনে সুন্দরবন, কলকাতা: দীপ প্রকাশন, জানুয়ারি ১৯৯৭।

দে রথীন্দ্রনাথ, সুন্দরবন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ডিসেম্বর ১৯৯১।

দে সূর্য্যেন্দু, মাছ জল মৎস্যজীবী, কলকাতা: গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষদ, ১৪২৪।

নস্কর কুমুদরঞ্জন, ভারতের সুন্দরবন ও ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, আগস্ট ১৯৯৮।

.......................: প্রকৃতির প্রতিশোধ-সুন্দরবন, কলকাতা: গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৬।

নস্কর ধূর্জটি, সুন্দরবনের লোকায়ত দর্পন, কলকাতা: শ্যামলী পাবলিকেশন, জানুয়ারি ১৯৯৭।

পন্ডা রাজকুমার, বাংলার মৎস্যজীবীদের জীবন কথা, পূর্ব মেদিনীপুর: সংক্রান্তি প্রেস এন্ড পাবলিকেশান, ২০১৭।

পাত্র অশোক কুমার, প্রতিমা কথা কয়, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা: চক্রবর্তী অ্যান্ড সন্স পাব্লিকেশন, ২০২১।

প্রামাণিক শঙ্করকুমার, সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন, কলকাতা: সাহিত্য প্রকাশ, ডিসেম্বর ২০১৪।

...........................: সুন্দরবনের কাঁকড়ামারা, কলকাতা: বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, জানুয়ারি ২০১৪।

...........................: সুন্দরবন জনজীবন কাঁকড়ামারা মাছধরা আর মৌলে, কলকাতা: গাঙচিল, জানুয়ারি ২০১৭।

...........................: সুন্দরবনের বাঘ বিধবা, কলকাতা: গাঙচিল, ২০২১।

বর্মন সন্তোষ সম্পাদনা, স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটন ও গোসাবা, কলকাতা: কথা প্রকাশন, নভেম্বর ২০১২।

বর্মন সন্তোষ কুমার, আদি সুন্দরবনের ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি (লোনা মাটির মিঠেকথা), কলকাতা: পাণ্ডুলিপি, অক্টোবর ২০১৩।

বাসন্তী মায়া, সুন্দরবন স্বাধীনতার আগে ও পরে, কলকাতা: জোনাকি পাবলিশার্স, বৈশাখ ১৪২৩।

বন্দ্যোপাধ্যায় সন্দীপ, মরিচঝাঁপিঃ দন্ডকারণ্য থেকে সুন্দরবন, কলকাতা: ঋতাক্ষর, ২০১০।

বন্দ্যোপাধ্যায় ডালিম ও অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবেশ, পরিবেশ আইন ও মানবাধিকার, কলকাতা: আন্তরিক, ২০১০।

বন্দ্যোপাধ্যায় মানিক, পদ্মানদীর মাঝি, কলকাতা: বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮।

বসু সমরেশ, গঙ্গা, কলকাতা: আনন্দ, ২০০০।

বসু গোপেন্দ্রকৃষ্ণ, বাংলার লৌকিক দেবতা, কলিকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৯৬৬।

বিনয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, কলকাতা: পুস্তক প্রকাশক, ১৯৫০।

ভৌমিক শেখর সম্পাদিত, সাম্প্রতিক ইতিহাস চর্চা, কলকাতা: ইন্দিরা প্রকাশনী, ২০০৫।

মল্লবর্মন অদ্বৈত, তিতাস একটি নদীর নাম, কলকাতা: পুঁথিঘর, ১৪১৮।

মণ্ডল অঞ্জলি বিকাশ, সুন্দরবন সেকাল-একাল, কলকাতা: রূপকথা, জুলাই ২০১১।

মণ্ডল অনুকূল, সুন্দরবনের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি, কলকাতা: দি সী বুক এজেন্সী, জুলাই ২০১৪।

মণ্ডল বরেন্দু, সুন্দরবন ও আমাদের কথা, কলকাতা: গাঙচিল, অক্টোবর ২০১৫।

..................: দ্বীপভূমি সুন্দরবন, কলকাতা: ছোঁয়া, ২০২০।

মণ্ডল কৃষ্ণকালী, দক্ষিণ চব্বিশপরগনার বিস্মিত অধ্যায়, কলকাতা: নব চলন্তিকা, জানুয়ারী ১৯৯৯।

....................: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুরাকথা, বারুইপুর: নভেম্বর, ২০১৩।

....................: দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা আঞ্চলিক ইতিহাসের উপকরণ, কলকাতা: নবচলন্তিকা, জানুয়ারি ২০০১।

মণ্ডল জগদীশচন্দ্র, মরিচঝাঁপি নিঃশব্দের অন্তরালে, কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০২।

........................: মরিচঝাঁপি উদ্বাস্তুঃ কারা এবং কেন?, কলকাতা: পিপলস বুক সোসাইটি, ২০০৫।

মন্ডল শশাঙ্ক, ব্রিটিশ রাজত্বে সুন্দরবন, কলকাতা: পুনশ্চ প্রকাশন, জানুয়ারি ২০১৭।

মণ্ডল স্বপন কুমার, আঠারোভাটির ইতিকথা, কলকাতা: অনন্যা, ২০২০।

মান্না অসীম কুমার, দক্ষিণবঙ্গের লোকায়ত সংস্কৃতি, কলকাতা: লোকসখা প্রকাশন, মাঘ ১৪১৭।

মিত্র শিবশঙ্কর, সুন্দরবনে আর্জান সর্দার, কলকাতা: দীপায়ন, চৈত্র ১৩৬৩।

...................: সুন্দরবন সমগ্র, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ডিসেম্বর ১৯৮৮।

মিত্র সুকুমার, সুন্দরবনের ভাঙ্গাগড়া, কলকাতা: জনসংহতি কেন্দ্র, নভেম্বর ১৯৯৬।

মিত্র সতীশচন্দ্র, যশোহর খুলনার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা: চক্রবর্তী চ্যাটার্জি এন্ড কোং, ১৩২১।

....................: যশোহর খুলনার ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা: গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, ১৩২৯।

মিস্ত্রী সুভাষ, লোকায়ত সুন্দরবন, সোনারপুর: লোক প্রকাশন, ২০১৩।

...............: দক্ষিণবঙ্গের লোক সমাজে মন্ত্র, কলকাতা: লোক প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ২০১৩।

...............: সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ, কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৪২৪।

রায় অতুল চন্দ্র এবং প্রনবকুমার চট্টোপাধ্যায়, ভারতের ইতিহাস, কলকাতা: মৌলিক লাইব্রেরী, ২০০৭।

রায় মনোরঞ্জন, পরায়ত্ত পরগনা কথা চব্বিশ পরগনা জেলার ইতিহাস (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: ইউনিভারসাল গ্রাফিক্স, আগস্ট ১৯৯৩।

রায় মোহিত, পরিবেশ চর্চাঃ ইতিহাস ও বিবর্তন, পরিবেশ বিষয়ক প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা: অনুস্টুপ, ২০১৫।

রায়চৌধুরী বিশ্বজিৎ, সুন্দরবন, কলকাতা: নান্দনিক প্রকাশন, জুন ২০১৪।

রুদ্র কল্যাণ, বাংলার নদীকথা, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, জানুয়ারি ২০১০।

রুদ্র কল্যাণ এবং জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী, ভারতীয় সুন্দরবনের একটি ভৌগোলিক রূপরেখা, কলকাতা: আনন্দ, ২০২১।

রায় নীহাররঞ্জন, বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৪০২।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ, সুন্দরবন অনধিকার চর্চা, কলকাতা: রংরুট হলিডেইয়ার প্রকাশনা, জানুয়ারি ২০১৫।

সরকার কানাইলাল, সুন্দরবনের ইতিহাস, কলকাতা: পাণ্ডুলিপি, ২০১৭।

সরকার প্রণব (সম্পাদনা), চব্বিশ পরগনা ও সুন্দরবন পুরনো ও দুষ্প্রাপ্য রচনা, সোনারপুর: লোক প্রকাশন, ২০১৩।

সাহা বিকাশকান্তি, সুন্দরবন কথা, কলকাতা: দে পাবলিকেশনস, জানুয়ারি ২০১৬।

সেনগুপ্ত অভিজিৎ, সুন্দরবনের ডায়েরি, কলকাতা: চর্চাপদ, ডিসেম্বর ২০১০।

সেনগুপ্ত সুধীন, সুন্দরবন জীব-পরিমন্ডল, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, জুলাই ২০১২।

সিং সুকুমার ও আশিস কান্তি ভট্টাচার্য, সুন্দরবনঃ দারিদ্র্য ও বঞ্চনার সমীক্ষা, গড়িয়া, কলকাতা: মালাট বুক এজেন্সী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯২।

সিং সুকুমার, দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস (একখন্ডে), গড়িয়া, কলকাতা: মাস এন্টার্‌টেন্‌মেন্ট্‌ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০।

..............: সুন্দরবনের ইতিকথা ও অ-সরকারি উন্নয়ন সংখ্যা, গড়িয়া, কলকাতা: মাস এডুকেশন প্রকাশনা, জানুয়ারি ২০০২।

...............: দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ইতিহাস জীবন-জীবিকার কাহিনী (দ্বিতীয় খন্ড), কলকাতা: মাল্টি বুক এজেন্সী, এপ্রিল ১৯৯৬।

হালদার বিমলেন্দু, দক্ষিণবঙ্গ জনসংস্কৃতি ভাষা ও ইতিহাস বিচিত্রা (প্রথম খণ্ড), কলকাতা: চতুর্থ দুনিয়া, জানুয়ারি ২০০১।

হালদার নরোত্তম, গঙ্গারিডিঃ ইতিহাস ও সংস্কৃতির উপকরণ, কাকদ্বীপ: গঙ্গারিডি গবেষণা কেন্দ্র, ২০০০।

.......................: গঙ্গারিডিঃ আলোচনা ও পর্যালোচনা, কলকাতা: দে বুক স্টোর, ১৯৮৮।

হোসেন মোঃ মোশারফ, সুন্দরবন বৈচিত্র্যের অপর নাম, ঢাকা: দিব্যপ্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৯।

পত্র-পত্রিকা

মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম (সম্পাদক), সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা-২, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই –ডিসেম্বর, ২০১৬।

মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম (সম্পাদক), সুন্দরবনঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা–১, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১৫।

নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদনা), সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, দ্বিতীয় খণ্ড, সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১২.

মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম (সম্পদক), সুন্দরবন কথাসাহিত্য বিশেষ সংখ্যা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সমকালের জিয়নকাঠি, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০১১।

নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল (সম্পাদনা), সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা, প্রথম খণ্ড, সমকালের জিয়নকাঠি, একাদশ বর্ষ, জুন ২০১০।

মণ্ডল নাজিবুল ইসলাম (সম্পাদক), সুন্দরবন বিশেষ সংখ্যা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, সমকালের জিয়নকাঠি, দ্বিতীয় খণ্ড, নবম বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৮।

কেমন আছে সুন্দরবনের মানুষ, আয়লা পরবর্তী একটি সমীক্ষা, কলকাতা: মন্থন সাময়িকী, নভেম্বর ২০১০।

পশ্চিমবঙ্গ, পর্যটন সংখ্যা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, ২০০১।

পশ্চিমবঙ্গ, জেলা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৬।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, “সুন্দরবনের পান চাষ” হুগলী, জানুয়ারি, ২০২২।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, “ভূখন্ড সুন্দরবন শতাব্দীর বিবর্তন” হুগলী, জুলাই-অক্টোবর, ২০২১।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, “বিধ্বংসী বুলবুল”, হুগলী, জানুয়ারি, ২০২০।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, “বাদাবনের বিপন্ন কামট”, হুগলী, জুলাই-অক্টোবর, ২০২০।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, হুগলী, জানুয়ারী, ২০১৯।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, “সুন্দরবনের নদীবাঁধ”, ষষ্ঠ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, হুগলী, ১৫ অক্টোবর ২০১৭ ও ১৫ জানুয়ারী, ২০১৮।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, হুগলী, ষষ্ট বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৫ এপ্রিল, ২০১৮।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, পঞ্চম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, হুগলী, ১৫ জানুয়ারী, ২০১৭।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, “সুন্দরবনের বাঘ”, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, হুগলী, ১৫ জুলাই, ২০১৭।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, চতুর্থ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, হুগলী, ১৫ জুলাই, ২০১৬।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, পঞ্চম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, হুগলী, ১৫ অক্টোবর, ২০১৬।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, চতুর্থ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, হুগলী, ১৫ জানুয়ারী, ২০১৬।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, হুগলী, ১৫ এপ্রিল, ২০১৫।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, তৃতীয় বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, হুগলী, ১৫ জুলাই, ২০১৫।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, হুগলী, ১৫ অক্টোবর, ২০১৫।

লাহিড়ী জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ (সম্পাদক), শুধু সুন্দরবন চর্চা, দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, হুগলী, ১৫ জানুয়ারী, ২০১৪।

সরকার প্রনব (সম্পাদনা), স্বদেশচর্চা, অরণ্য ও আরণ্যক, সোনারপুর: লোক, ২০১৫।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, চতুর্থ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জুন ২০০৪।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, ষষ্ঠ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০০৫।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, তৃতীয় সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জুলাই ২০০৮।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ১, ষষ্ঠ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১০।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ২, অষ্টম সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ৩, নবম সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জুলাই ২০১১।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ৪, দশম সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১২।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ৬, ত্রয়োদশ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জুলাই ২০১৩।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ৭, চতুর্দশ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৪।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ৮, ষোড়শ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৫।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ৯, সপ্তদশ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জুলাই ২০১৫।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ১০, সপ্তদশ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৬।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ১১, ঊনবিংশ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ১২, বিংশ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জুলাই ২০১৭।

হালদার বিমলেন্দু সম্পাদিত, নিম্নগাঙ্গেয় সুন্দরবন সংস্কৃতিপত্র, জীবন-জীবিকা-সংস্কৃতি ১৩, দ্বাবিংশ সংখ্যা, সোনারপুর, কলকাতা, জুলাই ২০১৮।

সাক্ষাৎকার

ননীভূষণ পাল, পিতা- জগন্নাথ পাল, বয়স- ৭৪, প্রাক্তন শিক্ষক, দক্ষিণ কাশিয়াবাদ, ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৯-০৬-২০২১, সময়- সকাল ১০ টা।

বিপুল গায়েন, আধিকারিক, মৎস্য দপ্তর, পাথরপ্রতিমা, বি ডি ও অফিস, তারিখ- ০৯-০৩-২০২২, সময়- ১২ টা।

কৃষ্ণকালি মণ্ডল, নৃতত্ত্ববিদ, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৭-১১-২০২১, সময়- বিকাল ৪ টা।

শঙ্কর কুমার প্রামাণিক, নৃতত্ত্ববিদ, শকুন্তলা পার্ক, বেহালা, তারিখ- ১৯-১১-২০২১, সময়- সকাল ১১ টা।

বিভূতি ভূষণ মাইতি, পিতা- গুনধর মাইতি, বয়স- ৭৪, প্রাক্তন শিক্ষক, হরেন্দ্রনগর, ঢোলাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৩-০২-২০২২।

পঙ্কজ কুমার বেরা, পিতা- পল্লব বেরা, বয়স ৬৭, প্রাক্তন শিক্ষক, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৫-০৭-২০২১, সময়- সকাল ১০ টা ২০ মিনিট।

গৌরহরি মণ্ডল, পিতা- শুভাশিস মণ্ডল, বয়স- ৭৩, প্রাক্তন শিক্ষক, অক্ষয়নগর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৯-০৬-২০২১, সময়- সকাল ৯ টা।

মিলন দাস, সম্পাদক- দক্ষিণবঙ্গ মৎস্যজীবী ফোরাম, তারিখ- ২৮-০৭-২০২২।

ভোলানাথ চেড়, পিতা- ভক্তি চেড়, বয়স- ৩৮, পেশা কাঁকড়া শিকারি, গ্রাম- ফটিকপুর, থানা- কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২১-০৩-২০২২, সময়- দুপুর ২ টা।

শম্ভু চেড়, পিতা- শক্তি চেড়, বয়স- ৩৮, ফটিকপুর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২১-০৩-২০২২, সময়- দুপুর ৩ টা।

লালুপদ চেড়, পিতা- ভক্তি চেড়, বয়স- ৪০, ফটিকপুর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২১-০৩-২০২২, সময়- দুপুর ৩ টা ৩৫ মিনিট।

কালিপদ চেড়, পিতা- ভক্তি চেড়, বয়স- ৩৫, ফটিকপুর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২১-০৩-২০২২, সময়- দুপুর ৪ টা।

রেবা বেরা, স্বামী- শক্তি বেরা, বয়স- ৫৫, পেশা- মীন সংগ্রাহক, ফটিকপুর, কাকদ্বীপ, তারিখ- ০৬-০৮-২০২১, সময়- সকাল ১০ টা।

অসীম কুমার কোরা, পিতা- শ্রীধর চন্দ্র কোরা, বয়স- ৪২, পেশা- সমাজসেবক, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৩-১০-২০২১, সময়- সকাল ১০ টা ২০ মিনিট।

নূপুর হাজরা, বয়স-৫০ বছর, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, থানা- গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পেশা- একশো দিনের শ্রমিক, তারিখ-২২-০৩-২০১৯, সময়- সকাল ১০ টা ২০ মিনিট।

বেনুপদ ভক্তা, পিতা- সুবল ভক্তা, বয়স- ৩৭, পেশা- মৎস্যজীবী (কাঁকড়া শিকারি), দাসপুর, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৫-০২-২০২২, সময়- সকাল ১০ টা।

শেফালী ভূঁঞ্যা, স্বামী- বাপী ভূঁঞ্যা, বয়স- ৩৯, পেশা- মীন সংগ্রাহক, মাধবনগর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৭-০৬-২০২১, সময়- সকাল ৯ টা।

গীতা দোলুই, স্বামী- পুন্য দোলুই, বয়স- ৫৩, পেশা- মীন ও মাছ ধরা, ভগবতপুর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৭-০৪-২০১৯, সময়- বিকাল ৪ টা।

স্নেহলতা গারু, স্বামী- বিশ্বজিৎ গারু, বয়স- ৩৯, পেশা- মৎস্যজীবী, বনশ্যামনগর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৭-০৬-২০২১, সময়- ১২ টা।

রেবতী করণ, স্বামী- কালিপদ করণ, বয়স- ৩৩, পেশা- মীন সংগ্রাহক, কে-প্লট, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৮-০৭-২০২১, সময়- ৩ টা।

শান্তবালা মাইতি, স্বামী- ধীরেন মাইতি, বয়স- ৭৫, পেশা- মীন-কাঁকড়া ধরা, মহেষপুর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১১-০৭-২০২২, সময়-দুপুর ২টা।

মিনতি বেরা, স্বামী- হীরালাল বেরা, বয়স- ৪১, পেশা- মীন সংগ্রাহক, শিবরামপুর, নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৫-০৮-২০২১, সময়- ৩ টা।

অনু গিরি, স্বামী- শ্যামল গিরি, বয়স- ৫০, পেশা- মীন সংগ্রাহক, শিবরামপুর, নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৫-০৮-২০২১, সময়- ৪ টা।

অমিতা মান্না, বয়স- ৫১, পেশা- মীন ও মাছ ধরা, দ্বারিকনগর, নামখানা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৫-০৮-২০২১, সময়- ১ টা।

মানসী মণ্ডল, বয়স- ৪৩, পেশা- মীন ও মাছ ধরা, কচুবেড়িয়া, সাগর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২০-০১-২০২২, সময়- সকাল ৯ টা।

তপন মাইতি, বয়স- ৩৭ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবর্ধনপুর, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২২-০৩-২০১৯, সময়- বিকেল ৩ টা।

পুণ্য দাস, পিতা- গৌর দাস, বয়স- ৫১, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবর্ধনপুর, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৩-০১-২০২২, সময়- বিকেল ৪ টা।

আশিষ কুমার বর্মণ, বয়স- ৬৮ বছর, পেশা- শিক্ষকতা, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৩-০৩-২০১৯, সময়- রাত্রি ৭ টা।

গণেশ মণ্ডল, পিতা- সুশান্ত মণ্ডল, বয়স- ৩৮, পেশা- মৎস্যজীবী (দোন শিকারি), উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৬-০২-২০২২, সময়- রাত্রি ৭ টা ৩০ মিনিট।

দীনেশ মণ্ডল, পিতা- সুশান্ত মণ্ডল, বয়স- ২৯, পেশা- মৎস্যজীবী (দোন শিকারি), উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৬-০২-২০২২, সময়- রাত্রি ৭ টা ৩০ মিনিট।

ঝন্টু দাস, পিতা- নিতাই দাস, বয়স- ৪১, পেশা- সামুদ্রিক মৎস্যজীবী, উত্তর সুরেন্দ্র গঞ্জ, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৬-০২-২০২২, সময়- রাত্রি ৭ টা ৩০ মিনিট।

গণেশ বাড়ুই, পিতা- নারায়ণ বাড়ুই, বয়স- ৪২, পেশা- সামুদ্রিক মৎস্যজীবী, দাসপুর, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৬-০২-২০২২, সময়- রাত্রি ৭ টা ৩০ মিনিট।

ভুবন কুমার পাত্র, পিতা- মহিতোষ পাত্র, বয়স-৯৩, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবর্ধনপুর, গোবর্ধনপুর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২০-১০-২০২১, সময়- রাত্রি ৮ টা।

মনোরঞ্জন শাসমল, পিতা- নিরঞ্জন শাসমল, বয়স- ৫০, পেশা- মৎস্যজীবী, কামদেবনগর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৫-০৪-২০২২, সময়- সকাল ১০ টা।

কানুপদ দাস, পিতা- হরেন দাস, বয়স- ৪৬, পেশা- মৎস্যজীবী, কামদেবনগর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৯-০৫-২০২১, সময়- সকাল ৮ টা।

কাকলি গিরি, স্বামী- আশিস গিরি, বয়স- ৩৯, পেশা- মীন সংগ্রাহক, বনশ্যামনগর, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৭-০৬-২০২১, সময়- সকাল ১১ টা।

শুকদেব দোলুই, বয়স- ৭০ বছর, পেশা- শ্রমজীবী, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- ৯ টা ৫২ মিনিট.

মহাদেব দোলুই, বয়স-৫৫ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- ১২ টা ৩৫ মিনিট.

নমিতা দোলুই, স্বামী- মহাদেব দোলুই, বয়স-৪৭, পেশা- মাছ ও কাঁকড়া শিকারি, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- ১ টা ৫০ মিনিট.

সহদেব দোলুই, পিতা- শুকদেব দোলুই, বয়স- ৩৩, পেশা- সামুদ্রিক মৎস্য শিকারি, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- ২ টা ৫০ মিনিট।

দীপক দাস, পিতা- চিত্ত দাস, বয়স- ৫০, পেশা- মৎস্যজীবী (নৌকার মাঝি), ব্রজবল্লভপুর, রাক্ষসখালি, পাথরপ্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৭-০২- ২০২২, সময়- সকাল ৯ টা।

গীতা দোলুই, বয়স- ৫৩ বছর, পেশা- নদীতে মীন ধরা, ছয় মাইল, নামখানা, বকখালি, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৮-০৪-২০১৯, সময়- ১১ টা ৪৫ মিনিট.

নারায়ণ ভুঁইয়া, বয়স- ৬১ বছর, পেশা- শ্রমিক, ভগবতপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৭-০৪-২০১৯, সকাল- ৯ টা ১০ মিনিট.

শ্রীমন্ত দিন্ডা, বয়স- ৫০ বছর, পেশা- ব্যবসায়ী, সত্যদাসপুর, কৃষ্ণদাসপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ-০৯-০৪-২০১৯, সময়- ২ টা ৪০ মিনিট.

শ্রী প্রভাত মাজী, বয়স- ৬৬ বছর, পেশা- কৃষিকাজ, কামদেবনগর, দূর্বাচটি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৭-০৩-২০১৯, সময়- সকাল ১১ টা ২৫ মিনিট.

বিশ্বজিৎ প্রধান, বয়স- ৪৭ বছর, পেশা- কৃষিজীবী, কামদেবনগর, দূর্বাচটি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৭-০৩-২০১৯, সময়- ১ টা ১০ মিনিট.

বাদল দাস, বয়স- ৫০ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, গোবিন্দপুর, রাক্ষসখালি, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২৪-০৩-২০১৯, সময়- বিকেল ৪ টা ৪০ মিনিট.

গৌরি দাস, বয়স- ৫৫ বছর, পেশা- নদীতে মীন ধরা, দুর্গাগোবিন্দপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ১৩-০৪-২০১৯, সময়- বিকাল ৩ টা ২০ মিনিট.

মানস দাস, বয়স- ৪০ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, দুর্গাগোবিন্দপুর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ-১৩-০৪-২০১৯, সময়- বিকাল ৫ টা ১৭ মিনিট.

হরিপদ দাস, বয়স- ৭০ বছর, পেশা- মৎস্যজীবী, বনশ্যামনগর, পাথর প্রতিমা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ০৯-০২-২০১৯, সময়- ১০ টা ২৫ মিনিট.

বাপি আদক, পিতা- সন্তোষ আদক, বয়স- ৪৭, আড়ৎদার ক্যানিং বাজার, তারিখ- ১৫-০৫-২০২২, সময়- সকাল ১০ টা।

মিলন বিশ্বাস, বয়স- ৪০, পেশা- মৎস্যজীবী, ঝড়খালি, বাসন্তী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, তারিখ- ২১-০৭-২০২৩, সময়- ১২ টা ৪০ মিনিট।

Online Archive:

GOI, Indian Culture Archive (https://indianculture.gov.in/)

Internet Archive (https://archive.org/)

The West Bengal Secretariat Library (http://wbsl.gov.in/)

www.sundarbanaffairswb.in